সূতানুটি সমাচার

সুতানুটি সমাচার

উইলিয়াম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ও ভিক্‌তর জ্যাকমোর
স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত
॥ ১৭৭৫-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ ॥
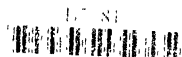
বিনয় ঘোষ

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

বিনয় ঘোষ

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৬১

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীবিমলেন্দু সেন

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

বারো টাকা

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই:

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

(রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত)

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

বিদ্রোহী ডিরোজিও

টাউন কলিকাতার কড়চা

কলকাতা কালচার

জনসভার সাহিত্য

কালপেঁচার বৈঠকে

কালপেঁচার দু'কলম

কালপেঁচার নক্‌শা

বাদশাহী আমল

বিষয়সূচী

চি ত্র সূ চী

ভূ মি কা

কলকাতা শহরের ইতিহাস নিয়ে অনেকদিন ধরে নানারকমের দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সনে ‘কালপেঁচার নক্‌শা’ থেকে শুরু। তারপর ‘কলকাতা কালচার’, ‘টাউন কলিকাতার কড়চা’ ইত্যাদি বইতে কলকাতা শহরেরই নানাদিকের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তবু মনে হয় যেন কলকাতার কথা কিছুই জানা হয়নি, কিছুই বলা হয়নি। একটা গ্রামকে যত সহজে বোঝা যায়, জানা যায়, একটা বড় শহরকে তত সহজে চেনাজানা যায় না। যত জানা যায় তত আরও জানবার কৌতূহল বাড়ে। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে অনেক ঘুরেছি, এই ইতিহাসের নেশায়। কিন্তু গ্রামকে এত দুর্জ্ঞেয় মনে হয়নি। আর কলকাতা শহরে জন্মে এবং সারাজীবন এই শহরে কাটিয়ে আজও তার বাড়িঘর, পথঘাট সব চিনতে পারিনি। কলকাতার এক-একটা অঞ্চল ও পাড়ার ইতিহাস, এক-একটা রাস্তার ইতিহাস নিয়ে রোমান্টিক উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করা যায়। যেমন বড়বাজার, লালবাজার, কসাইতলা, চাঁদনি, চৌরঙ্গী ইত্যাদি অঞ্চল, অথবা পার্ক স্ট্রীট, সার্কুলার রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোড, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, চিৎপুর রোড ইত্যাদি রাস্তার ইতিহাস যে-কোন কাহিনীর নায়কের চরিত্রের তুলনায় কম জটিল ও আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু সজাগ ইতিহাসবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পবোধ ও রুচির সংমিশ্রণ না হলে এই সব ইতিবৃত্ত রচনা করা যায় না।

কিছুদিন আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রিসার্চ ফেলো’ হিসেবে কলকাতা শহরের একটা বিশেষ দিক নিয়ে ঐতিহাসিক

অনুসন্ধানের কাজে বছর তিনেক নিযুক্ত ছিলাম (১৯৫৮-৬১)। তখন অনেক সরকারী নথিপত্র ঘাঁটতে হয়েছে। ইতিহাসের বহু উপকরণ এই সব নথিপত্র থেকে বাছাই করা যায়, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি সামাজিক ইতিহাসের (Social History) উপকরণ তার মধ্যে খুব কম। একেবারে নেই যে তা নয়, যা আছে তা অর্থনীতি-ব্যবসাবাণিজ্য-নগরনির্মাণ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক জীবনযাত্রা বলতে যা বোঝায়, ইংরেজদের ও আমাদের, তার উপাদান সরকারী নথিপত্রে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এই সামাজিক জীবনযাত্রার পরিচয় জানবার আগ্রহ আমার বেশি। কারণ তাতে যে-কোন দেশের, যে-কোন স্থানের ও কালের ইতিহাসের মর্মস্থল পর্যন্ত জানা যায়। কালের পটভূমিতে মানুষের জীবনের স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব করা যায়। তা যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষণ ইতিহাসের অনেকখানিই অজানা থাকে। এই দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজ করার সময় যে সব ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা-শ্রেণীর বইপত্র দেখতে হয়েছিল, মনে হল সেগুলি সরকারী নথিপত্রের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান, অন্তত সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে। এই শ্রেণীর সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মধ্যে কলকাতা শহর প্রসঙ্গে আমার কাছে অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা, এলিজা ফে'র চিঠিপত্র এবং ফ্যানি পার্কস-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত উপাদানের দিক দিয়ে মূল্যবান ও উপাদেয় মনে হয়েছে। অবশ্য এছাড়াও আরও বিবরণ আছে, যেমন বিশপ হেবারের, তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট জনসনের, এম্‌মা রবার্টস্‌-এর এবং আরও অনেকের। জনসন ও এম্‌মার পর্যবেক্ষণশক্তি প্রশংসনীয়, উপাদানও তাঁদের বৃত্তান্তে যথেষ্ট আছে। কিন্তু একই কালের উপাদানের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভেবে এঁদের বাদ দিয়েছি।

হিকি, ফে ও ফ্যানি কলকাতা শহর ও প্রধানত বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন, 'সূতানুটি সমাচার' বইতে কেবল সেইটুকুই সংকলিত হয়েছে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশ ও কলকাতা শহরই তখন ইংরেজদের সর্বপ্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল, কাজেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা এই সব বিবরণের মধ্যে বিশেষ স্থান পায়নি। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা—*Memoirs of William Hickey, 1749-1809*—বড় বড় চারটি খণ্ডে সম্পূর্ণ—১৭৪৯ সন থেকে ১৮০৯ সন পর্যন্ত তার সময় বিস্তৃত। লণ্ডন থেকে আরম্ভ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবরণ ও অভিজ্ঞতার কথাও হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন, কেবল ভারত বা বাংলাদেশের কথা বলেননি। মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থান করে, তদানীন্তন কলকাতার সুপ্রীমকোর্টে অ্যাটর্নি হিসেবে প্র্যাকটিস করার জন্য তিনি বাংলাদেশে আসেন। ১৭৭৭ সন থেকে ১৮০৯ সন পর্যন্ত, মধ্যে দু'একবার ইংলণ্ডে যাওয়া ছাড়া, হিকি প্রায় একটানা কলকাতা শহরে বাস করেন। অ্যাটর্নির পেশার জন্য তো বটেই, তা ছাড়া উচ্চবংশজাত বলেও, সেকালের কলকাতার ইংরেজসমাজের সর্বোচ্চ স্তর শাসক-বণিকগোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে, সাধারণ স্তরের ইংরেজ ও এদেশের লোকের সঙ্গে হিকির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। লোকচরিত্র বুঝবারও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে তাঁর মতো সুদক্ষ ব্যক্তি সেকালের সমাজে অল্পই ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, ফিলিপ ফ্র্যান্সিস, কর্নওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি, জাস্টিস ইম্পে, জাস্টিস হাইড, জাস্টিস চেম্বার্স, উইলিয়াম জোন্স থেকে আরম্ভ করে খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর গোকুল ঘোষাল, মল্লিকবংশের নিমাইচরণ মল্লিক পর্যন্ত সকলের সান্নিধ্যে তিনি

আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এদেশের বেনিয়ান কেরানী প্রভৃতি বাঙালী বাবুদের চরিত্র জানবার ও বুঝবার যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক বহু ইংরেজের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিখ্যাত হেয়ারড্রেসার থেকে আরম্ভ করে ড্যানিয়েলদের মতো শিল্পী, চাঁদ ও মন্নুর মতো এদেশী ভৃত্য এবং জমাদারনীর মতো হিন্দুস্থানী মেয়ে, বহু বিচিত্র লোকের সাহচর্যলাভ করেছিলেন হিকি। তার উপর হিকি জীবন উপভোগ করতে জানতেন, বুঝতেন যে 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা', এবং জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকে তিনি উপেক্ষণীয় মনে করতেন না। লাটের বাড়ির ভোজসভা, জজের বাড়ির খানাপিনা থেকে শুরু করে ট্যাভার্নের হৈহল্লা, বাগানবাড়ির সুরা-নারী-বিলাস, সবরকমের অভিজ্ঞতাকেই তিনি জীবনে উপভোগ্য ও অভিনন্দনীয় মনে করতেন। জীবন দিয়ে জীবন দেখার এই ইচ্ছা ও আগ্রহের জন্য তাঁর জীবনস্মৃতির তথ্যগুলি আজও তপ্ত রয়েছে, কালের শীতল হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। তাঁর বিবৃত লোকচরিত্রগুলি আজও এত জীবন্ত যে তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাই হিকির স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন : "Its characters might have stepped out of Smollet and Fielding"—এবং 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' মন্তব্য করেছেন : "For colour and zest these memoirs would be hard to beat ; were they fiction they would be called 'unmatchable pictures of the time."

ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ সামাজিক ইতিহাসের অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা বলেন যে অতীতকালের পশ্চাদ্‌ভূমির উপর যদি সেকালের লোকজন জীবন্ত মানুষের মতো চলেফিরে না বেড়ায়, যদি একালের মানুষ কালের ব্যবধান ভুলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা

না করতে পারেন, তাহলে সামাজিক ইতিহাস রচনার কোন সার্থকতা থাকে না। হিকি সামাজিক ইতিহাস লেখেননি, স্মৃতিকথা লিখেছেন। কিন্তু তিনি সর্বকালের মানুষের কাছে তাঁর স্মৃতিচিত্রে বর্ণিত লোকচরিত্র ও ঘটনাবলী এত জীবন্ত করতে পেরেছেন যে তাঁর রচনা ঐতিহাসিকের বিচারেও সার্থক হয়েছে।

এলিজা ফে'র চিঠিপত্র ও ফ্যানি পার্ক্স-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, এগুলির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, মেয়েদের রচনা বলে এর আস্বাদ অন্যরকম, বিবরণও অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। তবে বিস্তার ও বৈচিত্র্য হিকির মতো নয়, হতেও পারে না। হিকির মতো জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ফে বা ফ্যানি কারও ছিল না। কিন্তু দু'জনেরই এমন একটা সহজাত পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল যার জন্য সমাজের ও জীবনের বহুদিক তাঁরা দেখতে ও জানতে পেরেছেন। ঘরের ও ঘরকন্নার খবর পর্যন্ত ফে'র চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। বর্ণনার ভঙ্গিও দু'জনের উপভোগ্য। ফে-লিখিত চিঠিপত্রের একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক ই. এম ফর্স্টার (E. M. Forster) সম্পাদিত একটি সংকলন লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে—*Original Letters from India*, 1779-1815, Mrs. Eliza Fay—এই সংকলন থেকে চিঠিগুলি অনূদিত হয়েছে। কেবল কলকাতা শহর থেকে লেখা চিঠি ছাড়া অন্যান্য চিঠি বাদ দিয়েছি। শ্রীমতী ফে'র রচনার প্রশংসা করেছেন ফর্স্টার তাঁর অনাড়ম্বর, সরল পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা-ভঙ্গির জন্য। হিকির স্মৃতিকথা একই কালের রচনা বলে ফর্স্টার তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন: "The delightful *Memoirs of William Hickey*···form a perfect social pendant to our authoress. If she is a lady, Hickey is a gentlemen."

হিকির অপূর্ব স্মৃতিকথার সঙ্গে কেন শ্রীমতী এলিজা ফে'র চিঠিপত্রও যোগ করেছি, ফস্টারের এই মন্তব্য থেকে পাঠকরা তা বুঝতে পারবেন। ফ্যানি পার্কস ও ভিক্তর জ্যাকমোঁর রচনা থেকেও কয়েকটি বিষয় সংযোজন করেছি সমস্ত যুগচিত্রটিকে যথাসম্ভব সুসম্পূর্ণ করার জন্য।

শ্রীমতী ফে ১৭৮০ সনে তাঁর অ্যাডভোকেট স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। ১৭৮০ থেকে ১৮১৬ সনের মধ্যে দু'বার তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান, এবং মোট ৩৬ বছরের মধ্যে প্রায় ২৪ বছর এদেশে বাস করেন। ১৮১৬ সনে কলকাতা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্যানি পার্কস-এর *Wanderings of a Pilgrim etc*, দুই খণ্ড, লণ্ডন থেকে ১৮৫০ সনে প্রকাশিত হয়। ফ্যানির সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতা শহরে রামমোহন রায়কে দেখার এবং তাঁর বাড়িতে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার। তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। রামমোহনের কালের অন্যান্য সামাজিক অবস্থার বিবরণও তাঁর বৃত্তান্ত থেকে সংকলন করে দিয়েছি। ভিকতর জ্যাকমোঁও (Victor Jacquemont) রামমোহনের সময় কলকাতা শহরে আসেন। তখন তিনি একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য তিনি এদেশে আসেন আটাশ বছর বয়সে। ফ্রান্সের 'মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি'র পক্ষ থেকে তাঁকে ভারতবর্ষে প্রকৃতিবিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। ১৮২৯ সনের মে মাসে জ্যাকমোঁ কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর চিঠি এখানে যেটি প্রকাশ করা হল তা আকারে ছোট হলেও অন্যদিক থেকে আকর্ষণীয়।

হিকি, ফে ফ্যানি ও জ্যাকমোঁ মিলিয়ে হেস্টিংস-ফ্রান্সিসের কাল থেকে রামমোহনের কাল পর্যন্ত (১৭৭৫—১৮৩০) কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। স্মৃতিকথা না হয়ে

এগুলি যদি উপন্যাস হত, তাহলে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর ভাষায় বলা যায় যে সকলে নিঃসংশয়ে এই রচনাগুলিকে 'unmatchable pictures of the time' বলতে কুণ্ঠিত হতেন না।

'সরসিজ'
৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৩২ বিনয় ঘোষ
৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৮। ১৪ মার্চ, ১৯৬২

উইলিয়াম হিকি, তাঁহার ভৃত্য ও কুকুর

উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা

বাংলাদেশ ও কলিকাতা

১৭৭৭-১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ

১

সাগরদ্বীপ থেকে কলকাতা॥ ১ নভেম্বর, ১৭৭৭ সন। ভোর চারটে থেকে সাগরপাড়ি দিয়ে বেলা প্রায় ছুপুর আন্দাজ সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরে একখানি পানসি নৌকা এল, কর্নেল ওয়াটসন আগেই সেটি ভাড়া করে রেখেছিলেন কলকাতায় যাবার জন্য। বেলা ছুটোর সময় আমরা সকলে মিলে পানসিতে করে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। পানসিতে যেতে আমার আপত্তি ছিল, কারণ বাংলাদেশের এই বিচিত্র নৌকাটি এমনভাবে তৈরি যে তার মধ্যে সোজা হয়ে বসা যায় না, অথবা রোদবৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করাও যায় না। এমন কি পা ঝুলিয়ে একটু আরাম করে বসাও সম্ভব নয়। তবু পানসির অভিনবত্বের জন্য এই অসুবিধাটুকু আমাদের সয়ে গেল। ছ'জন 'কালা আদমী' (মাঝি) খুব জোরে জোরে দাঁড় বাইছিল, পানসিও চলছিল তর্‌তর্‌ করে ছুরন্ত বেগে। সন্ধে ছটার সময় আমরা কুলপিতে এসে পৌঁছলাম। আবার জোয়ার আসা পর্যন্ত সেইখানেই বিশ্রাম নেওয়া হবে স্থির হল।

পাশের খালের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর একটা ট্যাভার্ন (সরাইখানা) নজরে পড়ল। যেমন নোংরা তেমনি কুৎসিত ও জরাজীর্ণ সরাইয়ের ঘর। বাংলাদেশের 'house of entertainment'-এর এই ছুরবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ওয়াটসনের ইচ্ছা হল এইখানেই রাত্রিযাপন করা, কিন্তু

বিছানাপত্তর কিছুই পাওয়া গেল না। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের জন্য তোফা খানা তৈরি করে দিলেন সরাইখানার মালিক—চমৎকার মাছ, চলনসই মুরগি, প্রচুর ডিম ও বেকন (কোথায় পেলেন?), এবং আমার কাছে যা চরম বিলাসিতার ব্যাপার, সেইরকম উৎকৃষ্ট রুটি। ক্ল্যারেট ও মদিরা (মদ্যবিশেষ) আমাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সুতরাং খানা আমাদের বেশ ভালই জমল।

ভোজনান্তে শয়নের ব্যবস্থা করা হল একটি বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর। কর্নেল ওয়াটসন, মেজর মেস্টেয়ার ও আমি—তিনজনে লম্বা সটান হয়ে তার উপর শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম এল না, কারণ হাজার হাজার মশা সশব্দে গুনগুন করে আমাদের আক্রমণ করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক মশার কামড়ে টেবিলের উপর ছটফট করে আমি উঠে পড়লাম, এবং ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলাম। এমন সময় বাইরে থেকে বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম—'ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া হুক্কাহুয়া হুক্কাহুয়া'। শেয়ালের ডাক। ধীরে ধীরে রাত ভোর হয়ে গেল, দিনের আলো-হাওয়ায় মশার দলও পালাল। তিনখানি চেয়ার জুড়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম, এবং ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে বোধ করলাম।

সকাল আটটায় গরম গরম চা-কফির সঙ্গে প্রাতরাশ খাওয়া শেষ করে, প্রচুর সিদ্ধ মুরগি ও অন্যান্য খাদ্য নিয়ে আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। বেলা দশটার সময় জোয়ার আসতে পানসি ছাড়ল। আমরা ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই গার্ডেনরীচে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়িতে পৌঁছতে পারব। কিন্তু হঠাৎ উত্তুরে-হাওয়া বইতে তা সম্ভব হল না, মাঝিরা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে আমরা উলুবেড়িয়া (Woolburreah) নামে একটি ছোট্ট গ্রামে রাত্রিবাস করলাম। কর্নেল আমাদের গরম গরম

ভাত ও মাংসের ঝোল খাওয়াবেন আশ্বাস দিলেন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তিনি এদেশী ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছেন দেখে আমরা সকলেই চমৎকৃত হলাম। তাঁর কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে 'নেটিব'দের ভিড় জমে গেল। আমরাও হাসাহাসি করছিলাম দেখে কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, "আমি চেষ্টা করছি আপনাদের জন্যে গরম ভাত-মাংস যোগাড় করতে, বোঝাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর আপনারা হাসছেন?" আমরা অবশ্য তাঁকে বোঝালাম যে তাঁকে দেখে আমরা হাসি নি, 'নেটিব'দের হাবভাব দেখে আমাদের হাসি পাচ্ছে, কারণ এ দৃশ্য আমরা আগে কোনদিন দেখি নি। কর্নেল ঠাণ্ডা হলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়েছে, গরম ভাত-মাংস দেখে তা বোঝা গেল। প্রচুর পরিমাণে তাই আহার করে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করলাম। সুরা সংযোগে খাদ্য খুব তাড়াতাড়ি গলা দিয়ে পেটে তলিয়ে গেল।

শেষ রাতে জোয়ার এল, পানসি ছাড়ল। ভোর হল, পানসির মাথার উপর আমরা উঠে বসলাম। নদীর পূর্বতীরে গার্ডেনরীচের দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চমৎকার সব বাগানঘেরা বড় বড় বাড়ি, দেখতে অতি মনোরম—এ রকম সুন্দর দৃশ্য দেখলে কার না আনন্দ হয়! কোম্পানির বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা এখানকার সুন্দর পরিবেশে বাস করেন। কেউ কেউ কেবল গ্রীষ্মকালে কয়েকমাসের জন্য এখানে থাকেন, কেউ বা সব সময় এখানেই বাস করেন, শহরে কেবল কাজকর্ম করতে যান। চারিদিকের গাছপালায় যেন সবুজের বন্যা নেমেছে মনে হয়। নিসর্গে কেবল সবুজের ঢেউ, যেন রঙের তুফান উঠেছে। এ রকম অপূর্ব দৃশ্য দেখব, বিশেষ করে বাংলার মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কল্পনা করি নি কখনও।

গার্ডেনরীচ॥ রীচের কোলে পানসি ভিড়ল। তীর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়ি। কী সুন্দর বাড়ি যে তা ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য নেই আমার। ভিতের উচ্চতা প্রায় তিরিশ ফুট। তার উপরে বাড়ি, বিশাল তার আয়তন, স্থাপত্যেরও মনোমুগ্ধকর নিদর্শন। সমস্ত গার্ডেনরীচটাকে বাড়িটা যেন দাবিয়ে রেখেছে। উঁচু ভিতের জন্য অন্যান্য বাড়িগুলোকে মনে হয় যেন তলায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। বহু দূরে—প্রায় নয় মাইল লম্বা ও দু'মাইল চওড়া জলের একটা আস্তরের উপর দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম ও কলকাতা শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। আগাগোড়া নদীর জলের উপর ছোট বড় শত শত জাহাজ ও নৌকা নোঙর বেঁধে রয়েছে। তারই ভিতর থেকে যেন কলকাতা শহর নদীস্নান করে গাত্রোত্থান করেছে তার বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রায় ৪০০ বিঘা জমির মধ্যে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়ি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে এই জমি গ্রাণ্ট দিয়েছিলেন, জাহাজঘাট ও জাহাজ তৈরির ডক নির্মাণের জন্য। তার মধ্যে তিনি অনেক ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলেছিলেন, কামার ছুতোর ও অন্যান্য কারিগরদের কাজের জন্য। এ ছাড়া আর-একদিকে তিনি বড় বড় গুদামঘরও তৈরি করেছিলেন, জাহাজ তৈরির যাবতীয় মালপত্তর ও যন্ত্রপাতি মজুত করার জন্য। তাঁর জমির চারিদিকে কাঠও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ানো। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর আর কোন জায়গায় এ রকম বৃহৎ আকারে এত অর্থব্যয় করে এই ধরনের একটি বিরাট নির্মাণযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বকর্মার এক বিরাট কারখানা যেন ওয়াটসন সাহেব ফেঁদে বসেছিলেন। তাঁর বিপুল প্রচেষ্টা নিশ্চয় সার্থক হত, যদি না তাঁর বিরোধী কয়েকজন হীনচরিত্রের লোক তাঁর পরিকল্পনাকে বানচাল করার চেষ্টা

করতেন। এমন জাহাজঘাট ও কারখানা তিনি তৈরি করতে পারতেন গার্ডেনরীচে, যার জন্য সারা এশিয়াতে ব্রিটিশ জাতির সম্মান ও গৌরব বাড়ত।

খি দি র পু র ড ক নি র্মা ণ॥ ডক-নির্মাণের পরিকল্পনার ব্যাপারে কর্নেল ওয়াটসনের সঙ্গে আর একজন ব্যক্তি ছিলেন—তাঁর নাম মেজর আর্কিবল্ড ক্যাম্পবেল। তিনি বাংলাদেশে কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পরে মাদ্রাজের গবর্নর হন। এঁরা দুজন রাদারপুরে (Raderpore, খিদিরপুর) ডক-নির্মাণের পরিকল্পনা করে কোম্পানির অনুমতিলাভের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কোম্পানির ডিরেক্টররা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জমিও দান করার ব্যবস্থা করেন। জমি ছাড়া জাহাজ নির্মাণের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বাংলাদেশে নিয়ে যাবার বিশেষ সুব্যবস্থাও তাঁরা করে দেন। তার সঙ্গে তাঁরা বাংলার গবর্নরকে লিখে দেন যেন যথাসাধ্য তাঁরা ওয়াটসনের পরিকল্পনা কার্যকর করতে সাহায্য করেন।

১৭৭৭ সনের গোড়ার দিকে ওয়াটসন মেজর ক্যাম্পবেলের অংশ সম্পূর্ণ কিনে নেন, এবং নিজে তার একমাত্র মালিক হন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে যাত্রা করি, তখন তিনি এই জাহাজঘাট ও কারখানা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রায় একলক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড খরচ করে ফেলেছিলেন,—"an incredible amount for a private person to risk upon any speculation." বিলেতে যখন ওয়াটসনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন। সমুদ্রপথে একসঙ্গে আসার সময় তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর হয়, এবং আমার অ্যাটর্নির ব্যবসায়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকজনের কাছে

আমাকে চিঠিপত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। শুধু তাই নয়, আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতেও তিনি অনুরোধ করেন।

গার্ডেনরীচে পৌঁছে ওয়াটসনের জাহাজের কলকারখানা দেখে আমার খুব আনন্দ হল। আমরা যখন কারখানা দেখছিলাম, তখন তাঁর একজন ইয়োরোপীয় ম্যানেজারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতার খবর কি?" "কিছু জানি না" বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "ওহো, বলতে ভুলে গেছি, দু'জন বিরাট লোকের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে। একজন আমাদের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ক্লেভারিং, আর একজন বিচারপতি লা মেত্র। আজই সকালে বিচারপতির স্মৃতির সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কামান দাগা হয়েছে, হয়ত শুনে থাকবেন।" জাস্টিস মেত্রের মৃত্যুতে মিস্টার মর্স ও আমার একটু ক্ষতি হল, কারণ আমরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বিলেত থেকে চিঠিপত্র এনেছিলাম। বিলেতে মর্স ও আমি ঠিক করেছিলাম যে আমরা একসঙ্গে একবাড়িতে থাকব। সেইজন্য মর্স একটি ভাল বাড়ি সন্ধান করতেও আরম্ভ করেছিলেন।

বেলা এগারোটার সময় আমার বন্ধু রবার্ট পট ফিটনে করে এসে হাজির হল। দু'জনেই দেখা হতে খুব খুশি হলাম। পট বলল যে সে আমার জন্য চমৎকার একটি বাড়ির একাংশ সাজিয়ে-গুজিয়ে একেবারে ফিটফাট করে রেখেছে। এখনই সেটি আমার দখল করা দরকার, এবং তার জন্য তার সঙ্গে ফিটনে চড়ে সেখানে যাওয়াও দরকার। ওয়াটসন পাশে থেকে আমাদের কথাবার্তা হয়ত শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন যে তা হবে না, হিকি আমার এখানেই থাকবেন, এবং পট যখন ইচ্ছা ডক এলাকায় তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও গল্পগুজব করতে আসতে পারেন। তাতে তিনি আরও বেশি খুশি হবেন। এই কথা বলে তিনি পটকে

সেইদিনই ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন, এবং পট তা গ্রহণও করল। আমাকে বারবার কলকাতায় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমি রাজী হলাম, এবং প্রায় চার মাইল পথ ফিটনে করে যেতে বেশ ভালই লাগল।

শীতকাল হলেও তখন সূর্যের তেজ বেশ কড়া ছিল। পট সোজা আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঠেলে তুলল। বাড়িটি হল সুপ্রিম কৌন্সিলের বিখ্যাত সদস্য রিচার্ড বারওয়েলের (Richard Barwell)। তিনি তাঁর ছোট ভাই ড্যানিয়েল বারওয়েল ও তার তিন বন্ধু পট, কেটর ও গসলিঙকে বাড়িটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পট আমাকে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, এবং বাড়ির যে-অংশ আমার জন্য ঠিক করা ছিল সেখানে আমাকে নিয়ে গেল। বিশাল বড় বড় ঘর, যেমন লম্বা চওড়া তেমনি উঁচু, অত্যন্ত মূল্যবান সুদৃশ্য সব আসবাবপত্তরে সাজানো। শোবার ঘরে একদিকে বিছানাপাতা খাট, আর একদিকে একটি রাইটিংডেস্ক। ডেস্কের উপর দেখলাম কতকগুলি চিঠি রয়েছে। পট বলল, এগুলি সে আমার জন্য লিখে রেখেছিল। যদি সে কোন কারণে আমার আসার সময় কলকাতায় উপস্থিত থাকতে না পারে এবং তার জন্য আমাকে যাতে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়, সেইজন্য এই চিঠিগুলি লিখে রাখা সে প্রয়োজন মনে করেছিল। সব চিঠিতে একটি কথাই লেখা ছিল এই যে দুনিয়ায় আমার চেয়ে অভিন্নহৃদয় বড় বন্ধু পটের আর কেউ নেই, এবং সেই কারণে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য। যাঁদের কাছে চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল, তাঁদের নাম উইলিয়ম পামার, জন শোর (এখন Lord Teignmouth), মণ্টগোমেরি, নেলার, পার্লিং, ডুকারেল, বার্ড, ব্রিস্টো, গ্রাহাম, হ্যাচ, অ্যাডেয়ার, এভেলিন ও জাস্টিস হাইড।

পালকির গল্প॥ বেলা একটার সময় সাধারণত সাহেবরা মধ্যাহ্নভোজন করেন। আর বেশি দেরি নেই দেখে আমি ওয়াটসনের ডিনারের কথা পটকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। পটের ঘোড়া দুটি খুব ভাল ছুটতে পারত। আমরা খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে দেখি ওয়াটসন সাহেব আমাদের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। ডিনারে মিস্টার ক্লিভল্যাণ্ডও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সেইদিনই সকালবেলা তিনি কলকাতা পৌঁছেছেন, এবং কর্নেলের কাছে তিনি তাঁর পালকি চড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে এরকম অদ্ভুত যান আগে কখনও তিনি দেখেন নি, এবং এরকম অভিজ্ঞতাও তাঁর কখনও হয় নি। পালকিতে তিনি চড়ে বসলেন, বেয়ারাদের কাঁধে পালকিও চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু চলার পথে বেয়ারা-দের কণ্ঠের ধ্বনি শুনে ক্লিভল্যাণ্ড উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ধ্বনি যত বিলম্বিত টানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, তাঁর উৎকণ্ঠাও তত বাড়তে লাগল। তিনি ভাবলেন, হতভাগ্য পালকি-বেয়ারারা তাঁকে কাঁধে করে বহন করার জন্যই হয়তো চরম ক্লান্তিতে গোঙাতে আরম্ভ করেছে। অবিলম্বে তাদের রেহাই না দিলে তিনি নরহত্যার দায়ে পড়তে পারেন। সুতরাং তিনি থামাতে বললেন। কিন্তু পালকি কাঁধ থেকে নামিয়ে তিনি দেখলেন, বেয়ারারা বেশ মহানন্দে রঙ্গরসিকতা করছে। দেখে তিনি একটু অবাকই হলেন, কারণ তাদের গোঙানির মতন শব্দ শুনে তিনি ভেবেছিলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাবে। কিন্তু কোথাও তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, এমন কি তারা যে ক্লান্ত তাও তাদের কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় না। আবার তিনি তাই পালকিতে চড়ে বসলেন। পালকি চলতে লাগল এবং আবার সেই শব্দ শোনা গেল—হে আরে হোঃ, হৈ

আরে হোঃ। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব এবারে আরও বেশি বিচলিত হয়ে পালকি থামাতে বললেন, এবং বেয়ারাদের হাতে একটি টাকা গুঁজে দিয়ে কোন কথাবার্তা না বলে হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর ভরসা হল না পালকি চড়তে।

আমরা সকলে ক্লিভল্যাণ্ডের পালকির গল্প খুব উপভোগ করলাম। কর্নেল ওয়াটসন বুঝিয়ে দিলেন যে এদেশের পালকি-বেয়ারারা এইভাবে সুর করে গান গাইতে গাইতে পালকি বয়ে নিয়ে যায়। সামনে যে সর্দারবেয়ারা থাকে সে পথের বিবরণ দেয়, অন্যেরা চলার মন্ত্রের মতন ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন—"সামনে মাঠ, হৈ আরে; মাঠ রে ভাই, হৈ আরে; ওই যে গ্রাম, হৈ আরে; পুকুর ঘাট, হৈ আরে; খাল পেরুবি, হৈ আরে" ইত্যাদি। ওয়াটসন এত সুন্দর করে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা যারা পালকি চড়ি নি তারাও এদেশের পালকিমাহাত্ম্য বুঝে ফেললাম।

হে স্টিং স ও ফি লি প ফ্রা ন্সি স॥ পরদিন ওয়াটসন আমাকে গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য গবর্নমেণ্ট হাউসে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রধান সেনাপতি স্টিবার্ট ও বারওয়েলের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। বারওয়েলের প্রতি ওয়াটসন কোন কারণে বিরূপ ছিলেন বলে মনে হল। বারওয়েল ছিলেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের একজন সদস্য, এবং তাঁর সমর্থক। কাউন্সিলের আর একজন বিখ্যাত সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সেই সময় চুঁচুড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি কিভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন, সে সম্বন্ধে ওয়াটসনের মনে সন্দেহ ছিল। সন্দেহের কারণ—তাঁরা দু'জনেই যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটে যায়। ঘটনাটি এই :

কর্নেল ওয়াটসন ব্রিটিশ সেনাবিভাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ইঞ্জিনিয়ারবাহিনীর সাবঅল্টার্ন হয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে হাভানা অবরোধের সময় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তারপর তাঁকে ইংলণ্ডে জরুরী তলব করে আনা হয়, এবং তিনি লণ্ডনে এসে দেখেন, লর্ড ক্লাইব তাঁকে একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করার জন্য। ক্লাইব তাঁকে সঙ্গে করে বাংলাদেশে নিয়ে যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং ওয়ার-সেক্রেটারি ওয়েলবোর এলিসের কাছে এই মর্মে ওয়াটসনের জন্য আর একখানি চিঠিও তাঁর চিঠির সঙ্গে লিখে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠি নিয়ে ওয়াটসন যথাসময়ে এলিসের সঙ্গে দেখা করেন। এলিস তাঁকে যুদ্ধবিভাগের বড় কেরানীর কাছে তাঁর চাকুরি-সংক্রান্ত কাগজপত্র বুঝে নেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ওয়াটসন তাঁর নির্দেশপত্র নিয়ে কেরানীর সঙ্গে দেখা করতে যান। এই কেরানী হলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। সেক্রেটারির চেয়ে কেরানী অনেক বেশি উদ্ধতচরিত্র ছিলেন। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে শিষ্টতার লেশ ছিল না, এবং তিনি তা ওয়াটসনের প্রতি প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন নি। বড়বড় কয়েকটি বাঁধানো ভল্যুম উল্‌টেপালটে তিনি ওয়াটসনের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। ওয়ার-সেক্রেটারির কাছে না এসে আপনার যাওয়া উচিত ছিল অর্ডন্যান্স-বিভাগের মাস্টার-জেনারেলের কাছে।" উত্তরে ওয়াটসন বলেন, "কার কাছে আমার যাওয়া উচিত বা উচিত নয়, আশা করি সেক্রেটারি এলিস তা বিলক্ষণ জানেন। অতএব তা নিয়ে তর্ক করার মতন সময় আমার নেই। কাগজপত্র দেবার থাকে দিন, না হয় এলিসের নোটটি ফেরত দিন, আমি চলে যাই।" এই কথা বলে ফ্রান্সিসের টেবিলের উপর থেকে এলিসের 'নোট'টি তুলে নিয়ে ওয়াটসন

চলে যান। যাবার সময় তিনি শুনতে পান, ফ্রান্সিস পেছন থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বলছেন, "শুনে যান মশাই, শুনে যান, অত ব্যস্ত হবেন না।"

ওয়াটসন সোজা এলিসের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলেন। ফ্রান্সিসকে এলিস ডেকে পাঠান, এবং তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁকে বেশ ধমকানি দেন। ফ্রান্সিস তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি ভুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, ওয়াটসন বললেন। এখন তিনি বিলেতের কেরানী থেকে বাংলাদেশে গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন। কলকাতার ইংরেজ-সমাজে হেস্টিংস-বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তাঁর প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে। অতীতের কথা মনে করে তিনি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে নাও পারেন বলে ওয়াটসনের সন্দেহ হয়েছিল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা হবার পর অবশ্য সন্দেহ তাঁর দূর হয়ে গেল। ফ্রান্সিস তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করেছিলেন; আগেকার কথা মনে করে কোন বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নি। অল্পদিনের মধ্যে ওয়াটসনের জাহাজঘাট নির্মাণের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস।

অ্যাটর্নিত্ব গ্রহণ॥ বন্ধু পটকে আমি 'বব' বলে ডাকতাম, এবং তা না ডাকলে সে রাগ করত। বব আমাকে একটা বগি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল, তার পিঠে চড়ে রোজ আমি ব্রেকফাস্ট খাবার পর কলকাতায় বেড়াতে আসতাম। জাস্টিস হাইড ও তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে বব আমাকে আলাপ করিয়ে দিল। সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস সার্ এলিজা ইম্পে, ও সার্ রবার্ট চেম্বার্সের সঙ্গেও যথাসময়ে আলাপ-পরিচয় হল। উভয়েই আমার প্রতি খুবই সহৃদয় ব্যবহার করতেন। চেম্বার্স-পরিবারের সঙ্গে

আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল। মিস্টার ও মিসেস চেম্বার্স আমাকে তাঁদের বাড়িতে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতেন। লেডি চেম্বার্স যেমন রূপসী তেমনি গুণবতী মহিলা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর আঠার, দুটো সুন্দর সন্তানের জননী তিনি; একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সার রবার্টের মা-ও তখন বেঁচে ছিলেন; বৃদ্ধা হলেও সঙ্গী হিসেবে চমৎকার। এঁরা ছাড়া, উইলিয়ম জনসন ও উইলিয়ম স্মোল্ট নামে দু'জন ক্লার্ক তাঁদের পরিবারে থাকতেন। আমি যখন কলকাতায় এলাম তখন এঁরা দু'জনই মারা গেছেন।

কথা ছিল, মর্স ও আমি কলকাতায় এসে একসঙ্গে একবাড়িতে থাকব এবং কোর্টে প্র্যাকটিশ করব। কিন্তু মর্স বললেন, আমাদের পেশার দিক থেকে দু'জনের একবাড়িতে থাকা ঠিক হবে না, কারণ আমরা বন্ধু বলে মক্কেলদের মনে সন্দেহ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমরা অলাদা বাড়িতে থেকেই কাজকর্ম করব, এবং তাতে আমাদের বন্ধুত্বের হানি হবে না।

১২ নভেম্বর (১৭৭৭) সার্ এলিজা ইম্পে জানালেন যে পরদিন আমাকে কোর্টে হাজির হতে হবে অ্যাটর্নির শপথ গ্রহণের জন্য। যথাসময়ে আমি কোর্টে হাজির হলাম, এবং বিচারকের সামনে যথারীতি শপথ করে সুপ্রিমকোর্টের সলিসিটর, অ্যাটর্নি ও প্রোক্টর হলাম। প্রোক্টর হওয়াতে আমার রোজগারের খুব সুবিধা হয়েছিল, কারণ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা দ্বিগুণ 'ফী' পেতাম। আমার সহযাত্রী বন্ধু দু'জনও (টিল্‌ঘম্যান ও মর্স) সেদিন অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে আমি শহুরে সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, চেনা-পরিচিতের সংখ্যাও বেড়ে গেল অনেক। ঘন ঘন চারিদিকে নেমন্তন্ন হতে লাগল। আগে থেকেই মদ্যপানের অভ্যাস

করে ফেলেছিলাম, জাহাজে আসার পথে অভ্যাসটি বেশ পোক্তও হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে এসে ভোজের আমন্ত্রণে তা দিন দিন আরও বেড়ে যেতে থাকল। শ্যাম্পেন ও ক্ল্যারেট খুব বেশি মাত্রায় চালাতে আরম্ভ করলাম। স্বদেশে যা সহ্য হত, বিদেশে বাংলা-দেশের পরিবেশে তা সহ্য হবে কেন? কিছুদিনের মধ্যেই অত্যধিক মদ্যপানের কুফল দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড মাথাধরায় ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকতাম।

হা র ম নি ক ট্যা ভা র্ন॥ ১৩ নভেম্বর আমাকে শহরে যেতে হয়েছিল কোর্টের কাজে। বেলা প্রায় একটার সময় বগিতে চড়ে ওয়াটসনের গৃহে ফিরছিলাম, এমন সময় পথে জাস্টিস হাইডের সঙ্গে দেখা হল—পালকিতে করে কোথায় যাচ্ছেন। আমাকে দেখে পালকির ভিতর থেকে ইশারা করে থামতে বললেন, এবং খালি মাথায় এইভাবে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে বেশ বকুনি দিলেন। বললেন যে, এদেশে এইভাবে রোদ্দুরে ঘুরলে শীঘ্রই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। আমার চেহারা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে বললেন, এখনই ডাক্তার দেখাতে। নিশ্চয়ই দেখাব বলে তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পেলাম। কিন্তু পরদিনই আমার একটি বেশ বড় ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল কলকাতার এক বিখ্যাত ট্যাভার্নে। ভোজ দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়ম পামার। ট্যাভার্ন 'হারমনিক' (Harmonic Tavern)। এত বড় একটা লোভনীয় ভোজ হাইডের পরামর্শে ছেড়ে দিতে একেবারেই ইচ্ছা হল না। নির্দিষ্ট দিনে ভোজ্য ও পানীয়ের প্রবল টানে হারমনিকে গিয়ে হাজির হলাম। তখনও আমার মাজায় ও মাথায় রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছিল। যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল যে ভোজ অর্ধেক শেষ হতে না হতে আমি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্যাভার্ন ছেড়ে আমাকে চলে

যেতে হল। কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমারও সেই দশা হল। বব আমার এই অবস্থা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে সঙ্গে করে তার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইল। আমিও রাজী হলাম, কারণ তখন আমার পেটে এমন সাংঘাতিক যন্ত্রণা হচ্ছিল যে ওয়াটসন সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত যাবার আমার ক্ষমতাই ছিল না।

পটের বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পট তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে চলে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জেম্‌স লেয়ার্ড ও তাঁর বড় ভাই জন লেয়ার্ড, দু'জন ডাক্তারকে সঙ্গে করে ফিরে এল। জেম্‌স ও জন দু'জনেই তখন এদেশে জন কোম্পানির সেরা ডাক্তার ছিলেন। জনের কথাবার্তা থেকে আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে তাঁরা আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তা হলেও ওষুধপত্রের যথাসম্ভব ব্যবস্থা হল, কিন্তু দ্রুত কোন ফল পাওয়া গেল না। সারারাত ধরে বমি করলাম। ভোরের দিকে ভুল বকতে আরম্ভ করলাম এবং চারদিন পর্যন্ত অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম পটের ঘরে।

চারদিন পরে আমার চেতনা হল। মনে হল, কে যেন আমাকে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কবল থেকে এইমাত্র জাগিয়ে তুলেছে। জেগে উঠে দেখলাম, আমার বিছানার পাশে প্রিয়বন্ধু পট ভৃত্যদের নিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখেমুখে বেদনার এমন গভীর ছাপ পড়েছে যে দেখলেই মনে হয় দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। দুশ্চিন্তার কারণ তখন বুঝি নি, পরে বুঝলাম। আমার সম্বন্ধে ডাক্তাররা নাকি সাফ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আমার বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, বমি থামলেও থামতে পারে, কিন্তু বিকার থামবে না। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে হয়তো বিকার থামতে পারে। আমার বিকারের ঘোর কেটে গেছে

এলিজা ফে

ভিক্তর জ্যাকমোঁ

দেখে পটের তাই মনে হল যে হয়ত আমার শেষ মুহূর্তও ঘনিয়ে এসেছে। আমার বুকের উপর একখানি চাদর ঢাকা ছিল বলে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তার একটা দিক আলগা ঝুলছিল বলে আমি পটের কাছে একখানা কাঁচি চাইলাম। পট মনে ভাবল, আমার বোধ হয় আবার বিকার দেখা দিচ্ছে। সুতরাং সে হন্তদন্ত হয়ে বলল, "না না, কাঁচিটাচি হবে না, চুপ করে শুয়ে থাক।" আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সে বুঝল না। আবার ডাক্তার ডাকা হল। এবারে দু'জন নয় সাতজন এলেন—ডঃ ক্যাম্পবেল, ডঃ স্টার্ক, ডঃ রবার্টসন, দুই লেয়ার্ড ভাই, এবং আমার দু'জন জাহাজের সহযাত্রী ক্লিবল্যাণ্ড ও হোয়ার্থ। ডাক্তারদের গুরুগম্ভীর বিষণ্ণবদন দেখে আমার মতন সাহসী রোগীরও প্রাণ উড়ে গেল। আমার মনোবল তখনও অবশ্য কিছুমাত্র কমে নি, এবং আমি যে মরব না সে বিশ্বাস আমার অটুট ছিল। কিন্তু সাতজন ডাক্তারকে দেখে মনে হল তাঁরা প্রত্যেকে যেন আমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

এই হতাশার মধ্যে আমায় দশদিন কাটাতে হল। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাকি ডাক্তারদের মতে আমার 'যায় যায়' অবস্থা হত, এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্তও ভবনদীর পার থেকে ফিরে আসার আশা দেখা দিত না। এ রকম পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাকে তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ল্যারেট পান করতে দিতেন এবং তার সঙ্গে বেশ তাজা কমলালেবুও প্রচুর পাওয়া যেত।

মধ্যে মধ্যে যখন প্রচণ্ড জ্বর উঠত, তখন বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটি গরম বাথটবের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হত। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এইভাবে কাটল, কোন উপকার হল না। অবশেষে গরম বাথটব থেকে একদিন ঘরে আসছি, এমন সময় আমার সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়ে গেল, এবং অফুরন্ত ধারায় ঘাম ঝরতে

লাগল গা দিয়ে। ডাক্তার ক্যাম্পবেল তখন উপস্থিত ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ভৃত্যদের ডেকে বললেন, পশমী শাল দিয়ে আমার গা ঢেকে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জানাতেও তিনি ভুললেন না যে এইবারই চরম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, এবং খুব বেশি দেরী হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার মানবলীলা শেষ হয়ে যাবে। তারপর বোধ হয় শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আমার বিছানার পাশে তিনি বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার কয়েক মিনিট পরেই তিনি আমার বন্ধু পটকে আশা দিলেন যে আমি হয়তো বেঁচে উঠতেও পারি। একটা নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, তাতে ভাল কাজ হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তাররা পরামর্শ করে বললেন, আমার পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে।

পরদিন পয়লা ডিসেম্বর আমার অল্প একটু জ্বর হল বটে, কিন্তু ওষুধ খেয়ে সহজেই তা সেরে গেল। ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘদিন আমার দুর্বলতা কাটল না এবং খাবার রুচিও একেবারে চলে গেল। সাত আট দিন পরে একখানি কড়া টোস্ট খাবার উগ্র বাসনা হল। টোস্টের কামড় শেষ হতে না হতে ডঃ স্টার্ক এসে হাজির হলেন। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু খেয়েছেন কি?" আমি বললাম, "দু-একখানা কড়া টোস্ট খেয়েছি।" "যাই হোক, খাবার যে রুচি হয়েছে সেটাই ভাল লক্ষণ, তবে কড়া টোস্ট খাবেন না, অপকার হবে।" এই কথা বলে স্টার্ক চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডঃ ক্যাম্পবেল এলেন, এবং ঠিক ঐ ভাবেই খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আমি যখন টোস্টের কথা বললাম, তখন তিনি বললেন যে রোগীর পক্ষে এর চেয়ে ভাল খাবার আর হয় না। সামান্য টোস্ট নিয়ে দুই ডাক্তারের এই মতভেদে আমি বেশ মজা উপভোগ করলাম।

টোস্ট খেয়ে অবশ্য আমার উপকারই হয়েছিল, কোন ক্ষতি হয় নি।

ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম, কিন্তু এত ধীরে ধীরে যে ১৭ ডিসেম্বরের আগে আমি কারও কাঁধে ভর না দিয়ে একা হাঁটতেই পারতাম না। ডঃ ক্যাম্পবেল বললেন যে জীবনে তিনি এই ধরনের অসুখ থেকে কাউকে আরোগ্যলাভ করতে দেখেন নি। এতগুলি ডাক্তার আমার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য সত্যিই আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পট ও তার ভৃত্যদের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশি। সে ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। পটের ভৃত্যদের মধ্যে একজন ছিল যে আগে লর্ড ক্লাইবের কাছেও কাজ করেছে। ক্লাইবের এই পুরাতন ভৃত্যটি অসুখের সময় সারাক্ষণ আমার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকত। কোনদিন তাকে দেখে মনে হয় নি যে সে ক্লান্তি বোধ করছে। তার এই রোগীসেবা দেখে সকলেই খুব অবাক হয়ে গেছে।

অসুখের পর আমার যখন খুব অরুচি হল তখন এই ভৃত্যটি এটা-ওটা নানারকমের খাবার নিয়ে আমাকে প্রায়ই সাধাসাধি করত, এবং বলত, "এটা খেয়ে নিন, অসুখ হলে লর্ড ক্লাইব এটা খেতে খুব ভালবাসতেন, এবং খেয়ে খুব উপকারও পেতেন।" মধ্যে মধ্যে যখন আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত তখন সে আমাকে নানাভাবে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্পগুজব করে চাঙ্গা করার চেষ্টা করত। কখনও কোন কারণে সে আমাকে দমে যেতে দিত না।

২৪ ডিসেম্বর ডঃ ক্যাম্পবেল অনুমতি দিলেন বাইরে বেরুবার। আমার জন্য একটি পালকি এল, এবং তার মধ্যে শালমুড়ি দিয়ে আমি উঠে বসলাম। অনেকদিন পরে জাহাজঘাটে কর্নেল

ওয়াটসনের বাড়ি ফিরে গেলাম। গঙ্গার ধারে ডক, সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কাজেই অল্পদিনের মধ্যে আমি দেহে ও মনে বল ফিরে পেলাম। তিনদিনের মধ্যে আমার খিদে এত বেড়ে গেল যে খেয়ে আর তৃপ্তি হয় না। ১৭৭৭ সনের বাকী কয়েকটা দিনও এইভাবে কেটে গেল।

পয়লা জানুয়ারি ১৭৭৮ আমি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠলাম। অসুখের চিহ্ন অবশ্য চেহারা থেকে তখনও যায় নি। শীর্ণ ও ফ্যাকাশে মুখচোখ দেখে বোঝা যেত যে দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে উঠেছি। বাড়িতে ফিরে আসতে ওয়াটসন বললেন যে ক্লিভল্যাণ্ড একটি বড় বাড়ি দেখেছেন আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন বলে। বাড়িটি কোর্ট হাউসের কাছে। আমার কাজকর্মের খুব সুবিধা হবে বলে আমি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজী হলাম। কয়েকদিন পরে আরও একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি দেখতে গেলাম কলকাতায়। চমৎকার বাড়ি। যেমন জায়গা তেমনই বাড়ি, খোলামেলা এসপ্লানেডের উপর। দক্ষিণ ও পুব একেবারে খোলা। বাড়ি থেকে ভাগীরথীর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। বাড়ির একমাত্র আপত্তিকর ব্যাপার হল, কাঁচা গাঁথনি। আগেকার দিনে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাড়িরই গাঁথনি ছিল কাঁচা। এখন কলকাতা শহরে অন্তত এরকম কাঁচা গাঁথনির বাড়ি নেই। সবই চুনসুরকির পাকা গাঁথনির বাড়ি। এই বাড়ির ভাড়া ঠিক হল মাসিক তিনশো টাকা। কোন আসবাবপত্র নেই দেখে পট রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল, এবং বলল যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ফার্নিচার দিয়ে সে নিজে বাড়ি সাজিয়ে দেবে। তার জন্য আমাদের প্রায় বারো-তেরো হাজার টাকা খরচ হল।

৬ জানুয়ারি ১৭৭৮ আমি ও ক্লিভল্যাণ্ড নতুন বাড়িতে উঠে গিয়ে একত্রে বাস করতে আরম্ভ করলাম।

সু প্রি ম কো র্টে র বা র্ষি ক উ ৎ স ব॥ পরদিন ৭ জানুয়ারি সুপ্রিমকোর্টের বার্ষিক উৎসবের দিন। ঐদিন সার্ এলিজা ইম্পে, রবার্ট চেম্বার্স, কোর্টের অন্যান্য অফিসার ব্যারিস্টার ও অ্যাটর্নিরা সকলে প্রতি বছরে জাষ্টিস হাইডের গৃহে ব্রেকফাস্টে আমন্ত্রিত হন। ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হলে তাঁরা সোজা লাইন করে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কোর্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই শোভাযাত্রায় শেরিফ, আণ্ডার-শেরিফ থাকেন, তাঁদের কনেস্টবলরাও যোগদান করে। আদালতগৃহের সামনে এলে সুপ্রিম কাউন্সিলের একজন সদস্য শোভাযাত্রায় যোগ দেন এবং বিচারকদের বেঞ্চে গিয়ে বসেন। এইভাবে তখন বিচারকদের সম্মান প্রদর্শন করতেন কোম্পানির শাসকরা। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য এই প্রথা উঠে যায়। পরে আর কোনদিন তা পালন করা হয়েছে বলে আমি জানি না।

কোর্টে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করার পর আমার মক্কেলের অভাব হয় নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বারোটি 'অ্যাকশন' ও তিনটি 'ইকুইটি'র মামলা পেলাম। গোড়ার দিকে আমার একটু অসুবিধা হত, কারণ এদেশের আদালতের হালচাল সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। তা হলেও আমার বিশেষ ক্ষতি হয় নি তাতে, কারণ অ্যাটর্নি ও অ্যাডভোকেট বন্ধুরা আমাকে এ ব্যাপারে বেশ তৎপর হয়েই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐদিন ৭ জানুয়ারি সার্ এলিজা ইম্পের বাড়িতে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। কোর্ট ভাঙার পর বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে আমি তাঁর বাড়ি গেলাম। ভোজসভায় শহরের অনেক গণ্যমান্য সাহেবসুবোর সঙ্গে পরিচয় হল, এবং সময়টা বেশ ভালই কাটল।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে পরিচয়॥ পরদিন ৮ জানুয়ারি মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাড়িতে 'পাবলিক ব্রেকফাস্টে'র নেমন্তন্নে যেতে হল। তখনকার দিনে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাহেব-সমাজে এটাই ছিল আলাপ-পরিচয়ের রীতি। গবর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে এইজন্য সপ্তাহে একদিন করে 'পাবলিক ব্রেকফাস্ট' দিতেন। আমার জাহাজের সহযাত্রী টিল্‌ঘম্যান ছিলেন ফ্র্যান্সিসের আত্মীয়, তাঁর বাড়িতেই তিনি থাকতেন। আমাকে দূর থেকে দেখে তিনি টেবিলের পাশে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় তিরিশজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি টেবিল ঘিরে বসেছিলেন, ফ্রান্সিস ছিলেন মাঝখানে। উঠে এসে টিল্‌ঘম্যান আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার কাছে যে পরিচয়-পত্রগুলি ছিল সেগুলি তাঁকে দিলাম। আঙুল দেখিয়ে পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে ফ্রান্সিস চিঠিগুলি সাগ্রহে পড়লেন। প্রথম চিঠিখানা পড়ে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনি অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে মাফ চাইলেন বটে, কিন্তু তারপর যা বললেন তাতে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। চিঠিখানা উল্‌টেপালটে তিনি বললেন, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, মিঃ বার্ক কি করে ভাবলেন যে একজন অ্যাটর্নির কাজকর্মে সাহায্য করার মতন আমার সময় আছে!" এমন ভঙ্গিতে তিনি 'অ্যাটর্নি' কথাটা উচ্চারণ করলেন যেন তাঁদের মতন অবজ্ঞার পাত্র আর কেউ নেই।

এতগুলি বিশিষ্ট লোকের সামনে তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহারে আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ হঠাৎ দেখি তিনি বেশ ভদ্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। আমাকে তিনি ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করলেন এবং শরীর কী করে সুস্থ রাখতে হবে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। যেমন পিত্ত

ও পেটের ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি আমাকে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে একগ্লাস এবং রাত্রে শোবার আগে আর একগ্লাস জল খেতে বললেন। লণ্ডনের কোন বিচক্ষণ ডাক্তার তাঁকে নাকি এই উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তা মেনে চলে তিনি খুব ভাল ফল পেয়েছেন।

ডিনারে অনেকের সঙ্গে আলাপ হল, পরে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে গেল। ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কবে ইয়োরোপ রওনা হচ্ছেন। "মাসখানেকের মধ্যে," তিনি উত্তর দিলেন। তারপর পটের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কবে যাচ্ছেন?' পট আমার পাশে বসেই খাচ্ছিল। সে বলল, "তোড়জোড় কিছুই এখনও করি নি, সপ্তাহখানেকের মধ্যে করব।" পট যে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে এ কথা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। আমি একটু অবাকই হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করতে পট বলল যে কথাটা শুনলে আমি দুঃখিত হব বলে সে এতদিন বলতে গিয়েও বলে নি।

ডি না রে হুঁ কো খা ও য়া ও 'পে লে টিং'॥ ফ্রান্সিসের পর গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে আরম্ভ করে হুইলার, জেনারেল স্টিবার্ট, বারওয়েল প্রভৃতি প্রত্যেক বড়সাহেবের বাড়িতে একে একে ডিনারের নেমন্তন্ন হল। কলকাতা শহরের বড়সাহেবদের সমাজ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা কম হল না। অসুখের পর যতগুলি ডিনার খেয়েছি তার মধ্যে ড্যানিয়েল বারওয়েলের ডিনারের কথা আমার মনে আছে। ড্যানিয়েল আমার বন্ধু পটের সঙ্গে একবাড়িতে থাকতেন। তাঁর ভোজসভায় হুঁকো-খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আমার বহুদিন মনে থাকবে। সভায় পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে একটি সুন্দর সুসজ্জিত হুঁকো (গড়গড়া) তাঁরা আমার সামনে

জ্বলন্ত কল্‌কেসহ উপস্থিত করলেন। আমি কয়েকটা টান দিয়ে ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কৃতকার্য হলাম না। বারংবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হলাম, তখন আমন্ত্রিতদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই পদ্ধতিতে ধূমপান না করলে কি কোন ক্ষতি হবে, মর্যাদার হানি হবে? একজন বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। কলকাতার সাহেব-সমাজের এইটাই হল ফ্যাশান; হুঁকো না খেলে বড়সাহেবদের সমাজে আপনি কল্‌কেই পাবেন না।" আর একজন, অপেক্ষাকৃত একটু গম্ভীর প্রকৃতির, আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ওসব চালবাজ ছোকরাদের কথায় মোটেই কান দেবেন না। আপনি যদি না পছন্দ করেন, তা হলে হুঁকো খেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। হুঁকো-খাওয়া আমাদের ইংরেজসমাজে একটা ফ্যাশান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে তাল দেবার কোন অর্থ হয় না। আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকেই হুঁকো খান না, অতএব আপনিও স্বচ্ছন্দে না খেতে পারেন।" এই কথা শোনার পর আমি সেই যে হুঁকো ছাড়লাম, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তা স্পর্শও করি নি। তাতে আমার উপকারই হয়েছে, কারণ হুঁকো যে কত অনর্থের মূল তা আমি বহু বন্ধুবান্ধবের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। হুঁকোর আসল সমস্যা হল, অনির্বাণ অগ্নি-সহযোগে কল্‌কেতে তামাক যোগানো। তার জন্য হুঁকোবরদার ভৃত্যের গভীর মনোযোগ চাই। কিন্তু যে-কোন ভৃত্যের কাছ থেকে তা পাওয়া যে কত কঠিন সকলেই জানেন। কাজেই হুঁকোখোরদের জন্য ভৃত্যদের সব সময় তটস্থ থাকতে হয় এবং তাই নিয়ে গৃহে অশান্তির কারণ ঘটে।

ড্যানিয়েল বারওয়েলের এই ভোজসভাতেই আমি কলকাতার সাহেব-সমাজে প্রচলিত আর একটি অসভ্য প্রথা দেখে রীতিমত স্তম্ভিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। প্রথাটি হল, খাবার সময় রুটির

টুকরোগুলি পাকিয়ে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারা (pelleting)। আরও আশ্চর্য হলাম দেখে যে প্রথাটি কেবল পুরুষদের মধ্যে চলিত নয়, মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত। কেউ কেউ গুলিটি এমন-ভাবে পাকিয়ে এত জোরে ছুঁড়তে পারেন যে, কারও চোখেমুখে লাগলে তিনি বেশ আঘাত পান। গুলিগুলো তীরের মতন গিয়ে গায়ে লাগে। ড্যানিয়েল নিজে এই ব্যাপারে এত দক্ষ ছিলেন যে তিন-চার গজ দূর থেকে তিনি গুলি মেরে বাতি নিবিয়ে দিতে পারতেন, এবং দু'একবার নয়, বার বার অনেক বার।

এই রুটি-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার যে কোন ভদ্রসমাজের প্রথা হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় এই ব্যাপার নিয়ে খাবার টেবিলে ঝগড়াঝাঁটি হত। অবশেষে একবার এক ভোজসভায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা নিয়ে তুমুলকাণ্ড হয়ে যায়। জনৈক ক্যাপ্টেন মরিসন খাবার টেবিলে এই 'পেলেটিং' একেবারেই পছন্দ করতেন না। কোন ডিনারে গেলে তিনি গোড়াতেই সকলকে তা জানিয়ে দিতেন। তাঁর মিলিটারি মেজাজ দেখে সহজে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে রুটি ছুঁড়তেন না। একদিন কোন ভোজসভায় তাঁর এই সতর্কতা সত্ত্বেও একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন একটি রুটির টুকরোর বেশ কড়া গুলি পাকিয়ে ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। লাগবি তো লাগ গুলিটি গিয়ে ক্যাপ্টেনের প্রায় রগের কাছাকাছি লাগে। ক্যাপ্টেন রীতিমত আঘাত পান, এবং যিনি ছুঁড়েছিলেন তাঁকে হাতে-নাতে ধরতে পারেন। তারপর তাঁর মাটনের ঠ্যাং-সহ কাঁচের ডিসটি তুলে ধরে, তিনি ঠিক একজন সুদক্ষ জাগলারের মতন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন। অব্যর্থ লক্ষ্য—ডিসটি ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে তাঁর কপালে লাগে এবং অনেকটা কেটে যায়। কপাল দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে থাকে। তারপরেই

দু'জনে প্রচণ্ড 'ডুয়েল' আরম্ভ হয়ে যায়। এও ইংরেজ-সমাজে প্রচলিত আর একটি অসভ্য প্রথা। ডুয়েলের মধ্যে ভোজসভা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মিলিটারি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ভদ্রলোক পারলেন না। পিস্তলের গুলির আঘাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। এর জন্য দীর্ঘদিন তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। স্বভাবতঃই ঘটনাটি অতি দ্রুত শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। বিশেষ করে সাহেব-সমাজে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং আমি যতদূর জানি, এই ঘটনার পর থেকে পেলেটিং-প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন সাটন ও কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে ট্যাভার্নে নেমন্তন্ন করে বেশ বড় একটি ভোজ দিয়েছিলেন। লৌকিকতার খাতিরে আমাকেও একটি পালটা ভোজ দিতে হল 'হারমনিক ট্যাভার্নে'। ভোজের দিন প্রায় উনচল্লিশ জন খেতে এলেন, এবং সকলেই গণ্ডেপিণ্ডে গিললেন। মদ্যপানও পর্যাপ্ত পরিমাণে চলল। অনেকে রাত্রি প্রায় তিনটে পর্যন্ত ট্যাভার্নে বসে অবিরাম পান করলেন, এবং ভোরবেলা আমাকে দু'হাত তুলে ধন্যবাদ দিয়ে টলতে টলতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

২

'জে ণ্ট ল ম্যা ন অ্যা ট র্নি'॥ আমি যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছলাম, তখন এখানকার ইংরেজরা নানারকমের লেস-ঝালর দেওয়া খুব জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বাইরের সমাজে চলাফেরা করতেন। আমার নিজের বরাবরই একটা ঝোঁক ছিল বাবুগিরির দিকে। সহজেই তাই চলতি ফ্যাশানের স্রোতে আমি গা ভাসিয়ে দিলাম। আমার দামী দামী লেস-ভেলভেটের সাজগোজ দেখে সকলে রীতিমত অবাক হয়ে যেতেন। এ ছাড়া একজোড়া ঘোড়ার সুন্দর একটি ফিটনগাড়ি, এবং পিঠে চড়ার জন্য চমৎকার একজোড়া আরবী ঘোড়াও আমার ছিল। আমার পোশাক ও চালচলনের সঙ্গে কেউ টেক্কা দিয়ে চলার সাহস পেতেন না। কলকাতা শহরে আমার তাই নাম হয়ে গেল 'জেণ্টলম্যান অ্যাটর্নি'। অ্যাটর্নিদের মধ্যেও আমি একটা ফারাক রেখে চলতাম, দু'চারজন সেরা অ্যাটর্নি ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করতাম না। সপ্তাহে একটা করে ডিনারপার্টি দিতাম বাড়িতে, এবং তাতে বেশ হৈ-হল্লা করে খানিকটা সময় কাটত। আমার সঙ্গী ক্লিভল্যাণ্ড এসব ব্যাপারে বিশেষ যোগ দিতেন না, তাড়াতাড়ি দু'টো কোন-রকমে খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। তাঁর ধারণা ছিল এসব করলে তিনি একেবারে বয়ে যাবেন।

মদ্যপান ও রাত্রিযাপনের ব্যাপারে ক্রমেই আমি বেশ বাড়াবাড়ি করতে লাগলাম। ঠিক আমার মতন এতটা উচ্ছৃঙ্খল হতে আর

কাউকে দেখি নি। সকাল সাতটার আগে কাজের জন্য আমি আমার ডেস্কে বসতাম, এবং আধঘণ্টা ব্রেকফাস্টের জন্য কাটিয়ে একটানা ডিনারের সময় পর্যন্ত কাজ করতাম। তারপর খুব জরুরী কোন কাজ না থাকলে আর আমি সহজে কাগজকলম নিয়ে বসতাম না। আমার মক্কেলের অভাব হয় নি কোনদিন, বরং দিনদিন তার সংখ্যা বেড়েই গেছে। টাকাপয়সাও যথেষ্ট রোজগার করেছি, কোনদিন কিছুর অভাব বোধ করি নি। জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্বন্ধে আমার সেইজন্য কোন চেতনাই ছিল না। যা প্রাণে চাইত, তাই কিনতাম। যে-কোন দোকান থেকে নয়, সেই জিনিসের সবচেয়ে বড় দোকানে অর্ডার দিতাম। মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই বাজারের ধার-দেনা সব শোধ করে দিতাম। কাজকর্মের প্রবল চাপের জন্য তিনজন 'নেটিব' ক্লার্কও আমাকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল।

যত কাজই থাক্, সপ্তাহে অন্তত একবার করে কর্নেল ওয়াটসনের ডকইয়ার্ডে আমাকে যেতেই হত। একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেখলাম, মজুররা মাটি পরীক্ষার জন্য জমির নানা স্থানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। মাটির তলা থেকে প্রায় তিন ফুট পুরু সব কাঠের বড় বড় টুকরো পাওয়া গেল। এগুলি কিসের কাঠ, কোথা থেকে এল, আমরা কেউ তা বুঝতে পারলাম না। ফেব্রুয়ারি মাসে (১৭৭৮) আমার বন্ধু বব (পট) ইংলণ্ডে চলে গেল। মাসের শেষদিকে ড্যানিয়েল বারওয়েলও যাত্রা করলেন, কিন্তু পথে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের ফলে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর এক আধপাগলী কুমারী বোন তাই নিয়ে যথেষ্ট হেস্তনেস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কোম্পানির ডিরেক্টরদের পর্যন্ত চিঠিপত্র লিখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলেন না। যে-কোন কারণেই হোক, মিস্ বারওয়েলের ধারণা হয়েছিল যে তাঁর ভাইকে

ডাচরা সম্পত্তির লোভে খুন করেছে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু ডাচদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয় নি। বারওয়েলের পর কোম্পানির অ্যাটর্নি জ্যারেটও ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং তাঁর স্থানে ইম্পের প্রস্তাবে নেলর কোম্পানির অ্যাটর্নি নিযুক্ত হন।

কর্নেলের উইণ্ডমিল নির্মাণ॥ আমার বন্ধু কর্নেল ওয়াটসন খুব মনোযোগ দিয়ে ডক নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর ডকের কাজের জন্য দুটি বড় বড় বায়ুযন্ত্র (Windmill) স্থাপন করেন। আমার মনে হয় এ দেশে ওয়াটসনই প্রথম এই যন্ত্র আমদানি করেন। যন্ত্র দেখে নেটিবদের মনে বিপুল বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল। যন্ত্র দুটি দেখতে একরকম, প্রায় ১১৪ ফুট উঁচু, পাঁচটি তলাবিশিষ্ট (floors)। উপরের তলা শস্য-পেষাইয়ের জন্য, এবং নীচের তলা কাঠ-চেরাইয়ের জন্য। বায়ুচালিত বড় বড় জাঁতায় ও করাতে পেষাই-চেরাই করা হয়। এরকম আশ্চর্য যন্ত্র এদেশের লোক আগে কখনও চোখে দেখে নি। তখন ইয়োরোপের লোকের কাছেও এর যথেষ্ট নতুনত্ব ছিল।

আমার কাছেও ওয়াটসনের 'উইণ্ডমিল' কম বিস্ময়কর মনে হয় নি। প্রতিদিন আমি ডকে যেতাম, এবং যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম তার বিচিত্র কর্মশক্তি ও কর্মপদ্ধতি। এদেশের নেটিবরা কিছুতেই যন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারত না। যখন তাদের বলা হত যে উপরের পালে বাতাস লাগলে যন্ত্র চলতে আরম্ভ করবে, এবং বড় বড় জাঁতাগুলি গুমগুম করে শস্য পিষতে থাকবে, তখন তারা তা আজগুবী গল্প মনে করে মুখের দিকে চেয়ে হাসত। একদিন তাদের এই অবিশ্বাস দূর করার জন্য সকলের সামনেই যন্ত্র চালানো হবে ঠিক হল। সেইদিন যখন

যন্ত্র চলতে আরম্ভ করল, এবং তার প্রতিশব্দে পাঁচটি তলা কাঁপতে থাকল, তখন উপরতলায় প্রায় একশ' মজুর কাজ করছিল। বড় বড় চাকা জাঁতা পাটাতন ইত্যাদি ঠকঠক করে কাঁপছে নড়ছে ও ঘুরছে দেখে ভয় পেয়ে তারা হুড়মুড় করে দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল। ভাবল, কোন যাদুকর কিছু তুকতাক করে এই কাণ্ড করেছে। একটা ভয়ংকর ভূত যেন ভর করেছে বাড়িটাকে, তাই সব এমনভাবে কাঁপছে আর ঘুরছে। সেই ভূত যদি তাদের ঘাড়েও চেপে বসে, তা হলে তাদেরও এই দশা হবে, অর্থাৎ ঘুরতে হবে ও কাঁপতে হবে। এই চিন্তাতেই তারা কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়, পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করে ও আছাড় খেয়ে প্রায় অর্ধেক জখম হয়ে গেল। চারিদিকে কেবল 'ওরে বাবা, ওরে বাবা' শব্দে একটা চিৎকার শোনা যেতে লাগল। এরকম বিচিত্র দৃশ্য ও অসহায় করুণ আর্তনাদ আমি দেখি নি বা শুনি নি কখনও।

ওয়াটসন সাহেব প্রথম শ্রেণীর একখানি জাহাজ তৈরি করবেন বলে বিরাট একটি কাঠাম তৈরি করেছিলেন। অর্ধেক তৈরি হবার পর তাঁর সেগুনকাঠে ঘাটতি পড়ল, উপরের 'ফ্ল্যাট টেরাস' তৈরি করা সম্ভব হল না। তখন তিনি স্থির করলেন, এদেশের ঘরের চালের মতন ঢালু চাল দিয়ে ছেয়ে দেবেন। কিন্তু কাঠামটি এত চওড়া হয়ে গিয়েছিল যে তার উপর ঢালু চাল দেওয়া (pitched roof) সম্ভব হল না। উপরের অংশ বেশ খানিকটা সংকুচিত করতে হল। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্রেসি ইঁট গেঁথে তা করতে রাজী হলেন না, গড়ন টিকবে না বলে। ওয়াটসন কিন্তু নাছোড়বান্দা, করবেনই প্রতিজ্ঞা করলেন। আমাকেও একদিন সে কথা তিনি বললেন। পরদিনই তিনি বিখ্যাত স্থপতি টমাস লায়নকে (Thomos Lyon) ডেকে পাঠালেন। লায়ন সবকিছু দেখেশুনে

বললেন যে ঐভাবে ছাদ করা সম্ভব হবে না, যে-কোন একদিকের দেয়াল তার ভারে ফেটে ফাঁক হয়ে যাবে। লায়ন 'bulge' কথাটি ব্যবহার করলেন, এবং কর্নেল তার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "Give way and fall"। দেয়ালগুলি যদি আগাগোড়া সমান চওড়া হত, এবং উপরের টানাগুলি যদি আরও ঢালু হত, তা হলে এরকম ছাদ করার অসুবিধা হত না।

ডিনারে ক্রেসির সঙ্গে দেখা হল। মিঃ লায়নের মতন একজন খ্যাতনামা 'আর্কিটেক্ট' তাঁর মত সমর্থন করেছেন শুনে তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন, "আমি জানতাম হবে না, আমার কথাই ঠিক হল তো ?" কর্নেল ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আপনারা একেবারে অজ্ঞ, কিছুই জানেন না। হয় কি না হয় দেখবেন, আমি ঐ ছাদ করব, তবে ছাড়ব।" ক্রেসি বললেন, "আপনার ছাদ আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু তা আপনার নাকের সামনে ধসে পড়বে।" "যদি পড়ে তা হলে আবার নাকের সামনে তাকে গড়ে তুলব," কর্নেল উত্তর দিলেন।

এই কথাবার্তার কিছুদিন পরে আমি ওয়াটসনের বাড়ি গেলাম একদিন, খাবার নেমন্তন্ন ছিল। উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, "বুঝলেন হিকি সাহেব, ইঞ্জিনিয়ারদের বুদ্ধি ধরা পড়ে গেছে। তাঁদের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও আমি ছাদ গড়তে আরম্ভ করেছি, এবং অর্ধেক প্রায় হয়েও গেছে। দেয়ালের তো কিছুই হয় নি।" ক্রেসি বললেন, "আর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেয়াল ধসে পড়বে।" কর্নেল বললেন, "কখ্খনও না। একশতে একহাজার গিনি বাজি রইল।" "রইল বাজি, ঠিক আছে," ক্রেসি জবাব দিলেন। তখন কর্নেল কথা ঘুরিয়ে বললেন, "বাজিটাজি আমি যে ফেলি না তা তো জানেনই।" ক্রেসি বললেন, "খুব ভাল, কারণ এক্ষেত্রে যদি বাজি ফেলতেন তা হলে আপনার একহাজার গিনি ও বাড়ি দুই-ই যেত।"

দু'দিন পরে ওয়াটসন এসে আমাকে তাঁর বগিগাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন ডিনার খাবার জন্য। ডকের দিকে যেতে যেতে তিনি আমাকে বললেন যে সকালে তিনি দেখে এসেছেন, প্রায় সমস্ত ছাদটা তৈরি হয়ে গেছে। তাঁর বিশ্বাস, ছাদ ধসে পড়বে না। কথা বলতে বলতে বগিতে চড়ে আমরা তাঁর বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে এসেছি, এমন সময় প্রচণ্ড জোরে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হল। "হে হে হে হিকি, আওয়াজটা কিসের বলুন তো?" কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "শুনে তো মনে হল, বজ্রপাতের আওয়াজ।" "হে হে হে বজ্র হে, তা নয়, বোধ হয় ছাদটাই ধসে পড়ল হিকি সাহেব। ক্রেসি ঠিক কথাই বলেছিলেন। যাই হোক, তর্কের পয়েণ্ট কিন্তু আমার ঠিক ছিল।"

দূর থেকে দেখলাম, ধুলোয় ভরে গেছে বাতাস, ধোঁয়ার মতন ধুলো উড়ছে আকাশের দিকে। গেটের ভিতর দিয়ে কর্নেলের বাড়ি ঢুকতেই দেখা গেল, সামনে তাঁর সেই বিরাট ছাদখানি ধরণীতলে ভেঙে পড়ে রয়েছে। খুব ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মজুররা নিরাপদে আছে কি না। কিছুক্ষণ আগে জলযোগ ও বিশ্রামের জন্য মজুররা সকলেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তা না হলে প্রায় দুশো মজুর, যারা ছাদ পিটছিল, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না। ছাদসুদ্ধু তারাও তলায় পড়ত।

ড কে র জ মি দ খ ল॥ আগেই বলেছি, বারওয়েলের সঙ্গে ওয়াটসনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কর্নেল ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে লোক। তিনি ভেবেছিলেন, বারওয়েলের সাহায্য ছাড়াই তিনি ডক তৈরি করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু বারওয়েলও ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক, তাঁর প্রতি ওয়াটসনের
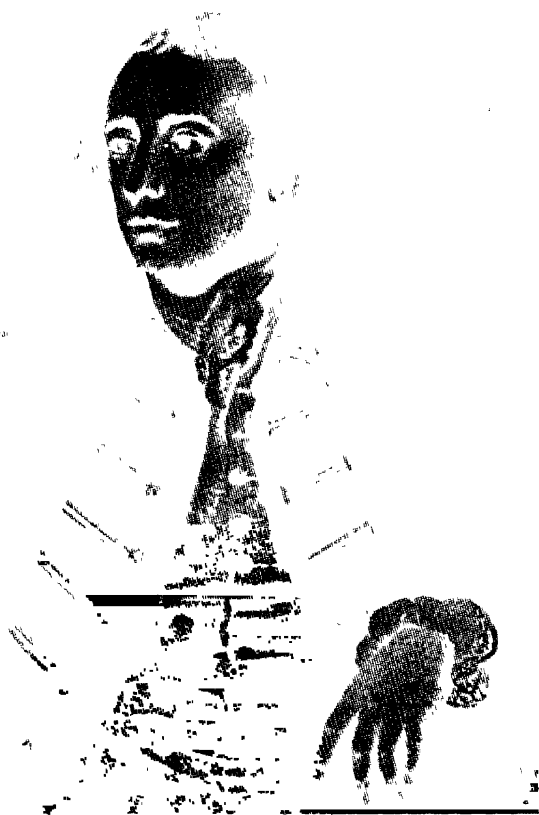
ওয়ারেন হেস্টিংস

(জোসুয়া রেনল্ডস অঙ্কিত)

হেস্টিংস-পত্নী ইমহফ — জোফানি অঙ্কিত

বিরূপ মনোভাবের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনিও বদ্ধপরিকর হলেন। কর্নেলের কাজে তিনি পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন।

ডক তৈরি করার জন্য গবর্নমেণ্ট যখন প্রথম ক্যাম্বেল সাহেবকে জমি দান করেছিলেন তখন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, স্থানীয় নেটিব বাসিন্দাদের টাকাপয়সা বা অন্য কোন বাসের জমি ন্যায্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়ে জমি দখল করতে। কিন্তু জমির প্রতি ভারতীয়দের মমতা এত বেশি যে কেউ বসবাসের ভিটে প্রাণ থাকতে ছাড়তে চায় না, কোন লোভ দেখিয়েই তাদের বশ করা যায় না। এ ব্যাপারে উঁচু-নীচু ভেদ নেই বিশেষ। ক্যাম্বেল সাহেব কিছুতেই তাদের ভিটে ছাড়ার জন্য রাজী করাতে পারেন নি। ঘরবাড়ি বলতে কতকগুলি ভাঙাচোরা পর্ণকুটীর ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তার প্রতি কী প্রচণ্ড আসক্তিই না ছিল! ক্ষতিপূরণের কোন লোভ দেখিয়েই তাদের তোলা গেল না। অবশেষে ওয়াটসন সাহেব একদিন একদল সেপাই পাঠিয়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তারপর রাতারাতি সেই জায়গা চষে একেবারে মাটির সঙ্গে এমনভাবে সমান করে দিলেন যে দেখে সেখানে কোনদিন লোকের বসবাস ছিল বলে চেনাই যেত না।

উদ্বাস্তু লোকেরা কয়েকদিন পরে দল বেঁধে কাউন্সিল হাউসে গেল, এবং সেখানে চিৎকার করে তাদের দাবি জানাতে লাগল। ক্যাম্বেলকে উৎখাত করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে ঘরবাড়ির ন্যায্য দামের পাঁচগুণ এবং অন্য ভাল জমিজমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের স্বেচ্ছায় স্থান থেকে সরানো সম্ভব হয় নি। তাতে জনকল্যাণকর কাজে নিশ্চয় বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই অবস্থায় বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ না করে উপায় ছিল না। এই কথা শুনে গবর্নমেণ্ট চারজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিয়ে একটি কমিটি

গঠন করলেন, ক্ষতিপূরণের দাবিদাওয়া বিচারের জন্য। দশ মাস ধরে কমিটির বৈঠক বসল অন্তত বিশবার, আলোচনা হল অনেক, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হল না। চারজনের চাররকম মত হল, এবং শেষ পর্যন্ত মতের মিল হল না। যারা উৎখাত হয়েছিল, তারা আর পৈতৃক ভিটেতে ফিরে আসতে পারে নি, এই পর্যন্ত জানি। ক্ষতিপূরণ কি তারা পেয়েছিল, অথবা আদৌ পেয়েছিল কি না, তা জানি না।

ক্যাম্বেলের সঙ্গে ওয়াটসন পরে এই ডক নির্মাণ পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছিলেন। বড় বড় ইমারত অনেক তৈরি করা হয়েছিল ডকের কাজের জন্য, এবং তার সঙ্গে বেশ লম্বা লম্বা ব্যারাকবাড়িও মজুরদের জন্য। ওয়াটসন ঠিক করেছিলেন, ডক এলাকায় মজুরের কাজের জন্য মোজাম্বিক ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস আমদানি করবেন। ডকের জন্য তাঁরা এত টাকা খরচ করেছিলেন যে কোম্পানির কাছ থেকে কোন পাকাপোক্ত পাট্টা না পেলে তাঁরা আর কাজে এগুতে সাহস করছিলেন না।

খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল॥ গোকুল ঘোষাল নামে খিদিরপুর অঞ্চলে একজন ধনী ব্যক্তি ডকের কাজের জন্য তাঁর নিজের অনেকখানি জায়গা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ওয়াটসন আসার পর তাঁর সঙ্গে তিনি কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং জমির ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তাও হয়। দু'একবার কথাবার্তার সময় আমি নিজে উপস্থিতও ছিলাম। কর্নেলকে তিনি সাদর অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে তাঁর ডক নির্মাণের পরিকল্পনা সফল হলে তিনি খুব খুশি হবেন। দেখা-সাক্ষাতের সময় গোকুল ঘোষাল নিজের জমি সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করলেন না, বরং এ ব্যাপারে তাঁকে তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েও দিলেন যে, প্রয়োজন হলে যে-কোন সময় তিনি কর্নেলকে তিন-চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধারও দিতে পারেন। কর্নেলের সঙ্গে যাঁর এতদূর কথাবার্তা হল, সেই গোকুল ঘোষাল শেষে তাঁর সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধাচারী হয়ে দাঁড়ালেন। বারওয়েল সাহেবই যে তাঁকে এ কাজে প্ররোচিত করেছিলেন, তা আমাদের বুঝতে দেরি হয় নি।

গোকুল ঘোষালের একখণ্ড জমি ওয়াটসন তাঁর ডকের জন্য অধিকার করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বারওয়েলের পরামর্শে ঘোষাল তাঁর জমির দখল দাবি করে কর্নেলকে একখানি চিঠি লিখলেন। ওয়াটসন তার জবাবে জানালেন, বিষয়টি গবর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের কাছে পেশ করলে ভাল হয়। গোকুল ঘোষাল লিখলেন যে গবর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর জমির কোন সম্পর্ক নেই। জমির মালিক তিনি এবং কর্নেল ওয়াটসন সেই জমি জবরদস্তি দখল করেছেন। অতএব নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমির দখল যদি তিনি ফিরে না পান, তা হলে তার জন্য সুপ্রিমকোর্টে তাঁকে মামলা রুজু করতে হবে। ঘোষালের মনোভাবে কর্নেল একটু চিন্তিত হলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে একখানি চিঠি লিখলেন। গোকুলবাবু বারবার কথা দিয়েও দেখা করতে এলেন না। অবশেষে কর্নেল নিজেই তাঁর বাড়িতে যাবেন ঠিক করলেন, এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। গোকুলবাবু সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করে বললেন যে তাঁর অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেন নি। সেইজন্য তিনি সত্যিই দুঃখিত ও লজ্জিত। কর্নেল বললেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আপনি যা করেছেন তা নিশ্চয় অসুস্থ বলে করেন নি। বারওয়েল সাহেবের পরামর্শেই তো আপনি এই জমি দাবি করেছেন?" কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে এবং মুখটা অত্যন্ত কাঁচুমাচু করে ঘোষাল বললেন,

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, বারওয়েল সাহেব মস্তবড় লোক, আমার একজন রক্ষকও বলা চলে। তাঁর কথা আমি কি অমান্য করতে পারি?" কর্নেল খানিকটা উত্তেজিত হয়েই তাঁকে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। যেমন আপনি, তেমনি আপনার রক্ষক বারওয়েল, দু'জনেই রাস্কেল।" এই কথা বলে কর্নেল তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন।

মামলা আরম্ভ হবার দিন তিনেক পরে কর্নেল ওয়াটসন গবর্নর-জেনারেল হেস্টিংস, ফ্রান্সিস ও হুইলার, এই তিনজনের সঙ্গে দেখা করে জমির ব্যাপার তাঁদের জানালেন। সকলেই একবাক্যে বারওয়েলের নিন্দা করলেন, এবং হেস্টিংস নিজে কথা দিলেন যে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলার জন্য তিনি বারওয়েলকে অনুরোধ করবেন। গোকুল ঘোষালকে যে তিনি কোন পরামর্শ দিয়েছেন, এ কথা অবশ্য হেস্টিংসের কাছে বারওয়েল একেবারে অস্বীকার করেন। আপসে মামলা নিষ্পত্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই দেখে ওয়াটসন মামলা লড়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

যে জমির জন্য গোকুল ঘোষাল মামলা করেছিলেন, ওয়াটসনের পরিকল্পনার দিক থেকে তার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। গঙ্গাতীরের লম্বা একখণ্ড জমি, তার উপর দিয়ে ঘোষাল-পরিবারের লোকজন স্নানাদি নিত্যকর্মের জন্য যাতায়াত করতেন। এই জমির উপরেই কর্নেল তাঁর বায়ুকল (Windmill) বসিয়েছিলেন, এবং এ জমি বাদ দিয়ে তাঁর 'wet' বা 'dry' কোন ডকই নির্মাণ করা চলে না। সুতরাং গোকুল ঘোষাল মামলায় জিতলে কর্নেলের ডকের পরিকল্পনা ত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

গোকুল ঘোষাল তখনকার কলকাতার একজন বিখ্যাত ও প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি। কোম্পানির সলিসিটার নর্থ নেলারকেই (North Nailor) তিনি অ্যাটর্নি নিযুক্ত করলেন। এ কাজেও

যে বারওয়েল সাহেব তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কর্নেল আমাকেই অনুরোধ করলেন তাঁর মামলা চালাবার জন্য। আমি রাজী হলাম, এবং প্রথমেই কোম্পানি যে জমির দানপত্র কর্নেলকে দিয়েছিলেন তা ভাল করে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম দানপত্রের মধ্যে কোন গলদ নেই, এবং জমির কোন গণ্ডগোলের জন্য তিনি দায়ী নন, গবর্নমেণ্টই দায়ী। অতএব মামলা চালাবার সমস্ত দায়িত্ব গবর্নমেণ্টের, কর্নেলের নয়। এ কথা গবর্নমেণ্টকে জানাবার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম। অ্যাডভোকেট-জেনারেল জন ডে আমার যুক্তি মেনে নিলেন। কোম্পানির সেক্রেটারি অবশেষে নেলারকে জানালেন যে ওয়াটসনের মামলার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। তার আগেই ঘোষালের পক্ষে নেলার মামলার ভার নিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর পার্টনার আর-একজন অ্যাটর্নি স্যামুয়েল টলফ্রের উপর মামলার ভার দেন। সেক্রেটারি শেষে আমাকেই অনুরোধ করেন মামলা চালাতে, এবং জানিয়ে দেন যে নতুন ল-কমিশনার সর্বব্যাপারে আমাকে যখনই প্রয়োজন হবে সাহায্য করবেন। সুতরাং কর্নেলের মামলা নিয়ে আমি বেশ জড়িয়ে পড়লাম।

কর্নেলের পক্ষে মামলার দায়িত্ব গবর্নমেণ্টই নিচ্ছেন দেখে গোকুল ঘোষাল রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গবর্নমেণ্টের সুনজরে থাকা এদেশের অবস্থাপন্ন লোকদের বিশেষ কাম্য ছিল। তাই গবর্নমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হতে পারেন মনে করে ঘোষাল বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, সরকারের বিপক্ষে মামলা তিনি জিতবেন কি না সে-বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু বারওয়েল তাঁকে মামলা চালাতে ক্রমাগত উস্কানি দিতেন বলে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপসে মিটমাট করেন নি।

মামলার শুনানি আরম্ভ হল একদিন সকাল নটায়, এবং শেষ হল রাত আটটায়। গোকুল ঘোষালই মামলায় জয়ী হলেন। সার্ এলিজা ইম্পে ঘোষালের পক্ষে দীর্ঘ রায় দিয়ে বললেন যে এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে এরকম বিবাদের সৃষ্টি হওয়া উচিত হয় নি। গবর্নমেণ্টের উচিত ছিল আপসে এর মীমাংসা করে নেওয়া।

এই ঘটনার পর ওয়াটসন তাঁর ডক নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। যদি তা তাঁকে না করতে হত, এবং যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ডক তৈরি করতে পারতেন, তা হলে তা নিঃসন্দেহে এদেশের একটি স্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকত।

গোকুল ঘোষালের জমি দখলের ব্যাপারে ওয়াটসনের কোন দোষ ছিল না, অথচ তিনি সেই জমির জন্য রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। ভবিষ্যতে আরও এরকম জমিদখলের মামলা হতে পারে মনে করে তিনি তাঁর ডকের পরিকল্পনা একরকম বাতিল করারই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু যে আর্থিক ক্ষতি তাঁকে এর জন্য স্বীকার করতে হল তা পূরণ করার জন্য তিনি গবর্নমেণ্টকে নোটিশ জারি করলেন। বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানকেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য নোটিশ জারি করা হল। ওয়াটসন হয়ত চাকরিও ছেড়ে দিতেন, কিন্তু কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি তখন এত বেশি ছিল যে হঠাৎ তিনি তা ছাড়তে চাইলেন না। তিনি স্থির করলেন, বাংলাদেশে কিছুদিন থাকবেন, এবং ডক ও জাহাজ নির্মাণের জন্য যে প্রচুর জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আমদানি করেছেন, তা অন্তত কিছু বিক্রি করে দেবেন বা কাজে লাগাবেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি জাহাজ তৈরির জন্য কারিগর ও যন্ত্রপাতিও এনেছিলেন অনেক। তাই দিয়ে দু'একটি জাহাজ না তৈরি করে তিনি কাজে ইস্তফা দেবেন না ঠিক করলেন। দু'বছরের মধ্যে তিনখানি জাহাজও

তিনি তৈরি করে ফেললেন, সব দিক দিয়েই বিলেতের তৈরি জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রথমটির নাম Surprise, দ্বিতীয়টির নাম Nonsuch, তৃতীয়টির নাম Laurel। প্রায় ৩০০ টনের জাহাজ 'সারপ্রাইজ', ইয়োরোপে মালপত্র চালান দেবার জন্য গবর্নমেণ্টই কিনে নিলেন। 'ননসাচ' ও 'লরেল' প্রথমে চীনের বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, পরে ইয়োরোপেও পাঠানো হয়। কলকাতায় তৈরি এই জাহাজ তিনখানি দেখে ইয়োরোপের ব্যবসায়ীরা সকলেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি॥ ফেব্রুয়ারি মাসে (১৭৭৮) ক্যাপ্টেন সাটন ইয়োরোপ যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন ব্যারিস্টার ফ্যারোর। আমাদের এই ব্যারিস্টার বন্ধুটি মাত্র বছর তিনেক প্র্যাকটিশ করে প্রায় আশী হাজার পাউণ্ড সঞ্চয় করেছিলেন। এই বিপুল অর্থের অধিকাংশই তিনি রোজগার করেছিলেন মহারাজ নন্দকুমারের বিচারের সময় তাঁর কাউন্সেল নিযুক্ত হয়ে। নন্দকুমারকে জালিয়াতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজাকে এই অপরাধের জন্য ফাঁসি দেওয়া, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের মতন হয়ে আছে।

গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে জেনারেল ক্লেভারিঙের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। ক্লেভারিং ছিলেন কাউন্সিলের প্রথম সদস্য এবং প্রধান সেনাপতি। একবার হঠাৎ গুজব রটে গেল যে হেস্টিংস গবর্নর-জেনারেলের পদ ত্যাগ করছেন। সেই সময় ক্লেভারিং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে গবর্নমেণ্ট ও ফোর্ট উইলিয়ম দখল করে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। হেস্টিংসের বন্ধুবান্ধবরা সতর্ক থাকার জন্য তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। হেস্টিংসের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন বারওয়েল, এবং ক্লেভারিঙের পক্ষে ছিলেন কর্নেল মনসন ও

ফ্রান্সিস। দুই দলের বিবাদ যখন চরমে পৌঁছয়, ঠিক সেই সময় মনসন হঠাৎ অসুখে মারা যান। তার ফলে হেস্টিংস তাঁর অতিরিক্ত ভোট দিয়ে কাউন্সিলে নিজের দল ভারি করে ফেলেন।

দুই দলে বিবাদ যখন আরম্ভ হত তখন সারা শহরময় রীতিমত সাড়া পড়ে যেত। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা সশস্ত্র সামরিক বিদ্রোহের আতঙ্কে সকলে শঙ্কিত হয়ে থাকত। থাকারই কথা, কারণ বিরোধটা যখন গবর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষের, তখন বিদ্রোহ প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। অবশেষে নিরপেক্ষরা প্রস্তাব করলেন যে দুই দলের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের উপর দেওয়া হোক। হেস্টিংস ও ক্লেভারিং উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। দু'জনেই লিখিত বিবৃতি দাখিল করলেন বিচারকদের কাছে। বিচারকরা দুই পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে অবশেষে রায় দিলেন এই মর্মে যে হেস্টিংসের গবর্নমেণ্টই থাকা উচিত। ক্লেভারিং বিচারকদের রায় মেনে নিলেন। এইভাবে একটা ভয়াবহ বিরোধের মীমাংসা হল, যা না হলে এ দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশকিল হত।

দুই দলের যখন বিচার চলতে থাকে তখন উভয়ের অ্যাড-ভোকেট ও, সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল ঝগড়াবিবাদ হয়। এই হেস্টিংস-ক্লেভারিং বিবাদ উপলক্ষ করে কলকাতা শহরে তখন কত যে 'ডুয়েল' লড়া হয় তার ঠিক নেই। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ডুয়েল হয় হেস্টিংসের সঙ্গে ফ্রান্সিসের। আর-একটি ডুয়েল হয় আমার বন্ধু রবার্ট পটের সঙ্গে জেমস গ্রাণ্টের। পট ছিল গোঁড়া হেস্টিংসপন্থী, গ্রাণ্ট ছিলেন ক্লেভারিংপন্থী। দুই পন্থী শেষে সম্মুখ-সমরে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করলেন। পটের সঙ্গে গ্রাণ্টের বেশ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু গবর্নমেণ্টের মধ্যে দুই দলের যখন প্রকাশ্য বিবাদ আরম্ভ হল, তখন পট হঠাৎ একদিন গ্রাণ্টকে বিশ্বাসঘাতক ও

ক্লেভারিঙের গুপ্তচর বলে বসল। পটের অভিযোগ হল, গ্রাণ্ট তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সমস্ত গোপন খবর বার করে নিয়ে হেস্টিংস-বিরোধীদের জানিয়েছেন। গ্রাণ্ট এই অভিযোগ অস্বীকার করেন, এবং চ্যালেঞ্জ করে বসেন পটকে। তখন চ্যালেঞ্জ বলতে ডুয়েলই বোঝাত। ডুয়েলের সময় দু'জনের মধ্যে বহু গুলি-বিনিময় হল এবং শেষে গ্রাণ্টকে জখম করে পটই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হল। ব্যাপারটা ঐখানেই মিটে গেল বটে, কিন্তু গ্রাণ্টের 'গুপ্তচর' বদনাম সহজে দূর হল না।

মহারাজ নন্দকুমার জেনারেল ক্লেভারিঙের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। অনেকে মনে করেন সেই কারণেই নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কথাটা একেবারে মিথ্যা বলে মনে হয় না; কারণ চীফ জাস্টিস এলিজা ইম্পে জুরিদের কাছে মামলাটি পেশ করার সময় পরিষ্কার নন্দকুমারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে-ছিলেন। জুরিরা কয়েক ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করার পর অবশেষে নন্দকুমারকে অপরাধী বলে রায় দেন। পরে জুরিদের কয়েকজনের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলোচনা হয়। তাঁরা অনেকেই নন্দকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে রাজী ছিলেন না। কেউ কেউ বলেন যে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হবে জানলে তাঁরা কখনই এই রায় দিতেন না। ফাঁসির হুকুমে অনেকেই বেশ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। যেদিন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, সেদিন কলকাতা শহরের অধিকাংশ হিন্দু ভোরবেলা উঠে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে শহর ছেড়ে চলে যান। বিচারকদের মধ্যে সার্ রবার্ট চেম্বার্স নন্দকুমার সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে নন্দকুমার এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেন নি, যার জন্য তাঁকে কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু চেম্বার্স এত ভালমানুষ ছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে বিশেষ কিছু ছিল না।

সার্ ইম্পে সহজেই তাঁকে কাবু করে ফেললেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে চেম্বার্স নন্দকুমারের মৃত্যু-পরওয়ানাতে সই করতেও বাধ্য হলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ক্লেভারিঙের মৃত্যু হল। তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রীর তিনটি কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কেরোলিন দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। এমনিতে বেশ চৌকস মেয়ে হলেও, কেরোলিন বিবাহিত জীবনে সুগৃহিণী হয়েছিলেন শুনেছি। তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে এক অ্যাডমিরালকে বিবাহ করেন।

বাংলার কালবৈশাখী॥ ক্লিভল্যাণ্ড ও আমি এপ্রিল ১৭৭৮ পর্যন্ত বেশ একত্রে ঘরসংসার পাতিয়ে ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে একত্রে থাকতে আমারই সংকোচ হল। কারণ আমাদের যা খরচ হত তা আমরা দু'জনেই সমান ভাগে দিতাম, অথচ ক্লিভল্যাণ্ড দিনে দু'গ্লাসের বেশি মদ্যপান করতেন না, এবং বন্ধুবান্ধবদেরও বিশেষ খাওয়াদাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতেন না। এদিকে মদ্যপান ও ভোজসভা দুই-ই আমি পুরোদমে চালাতাম, এবং তার ফলে স্বভাবতঃই আমার জন্য খরচ হত অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করবেন এবং আমি তা গ্রহণ করব এটা আমার শোভন বা সঙ্গত বলে মনে হল না। আমি তাই আলাদা বাসা করে থাকার সিদ্ধান্ত করলাম। একটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, পয়লা মে থেকে সেটি নেব স্থির করলাম। আমরা দু'জনে যে বাড়িটিতে ছিলাম, আগেই বলেছি, সেটি কাঁচা-গাঁথনির বাড়ি, চুনসুরকির গাঁথনি নয়। দক্ষিণদিকে সূর্যের তাপ লাগত বেশি, এবং তাতে বাড়ি খুব গরম হয়ে যেত। আমি তাই এদেশী একজন মিস্ত্রি ডেকে একটি বারান্দা করে নেব ঠিক করলাম। আমার মতলব শুনে বাড়ীওয়ালী মিসেস

ওগডেন ছুটে এলেন একদিন, এবং বললেন যে দেয়ালের গা দিয়ে বারান্দা ঠেলে বার করলে বাড়িটা ধসে পড়ে যাবে। আমি তখন মালপত্তর কিনে ফেলেছি, কাজেই এ বিষয়ে মিঃ লায়নের (আর্কিটেক্ট) সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটা সেরে ফেলব ঠিক করলাম। লায়নের নির্দেশ অনুযায়ী বারান্দা তৈরি হয়ে গেল।

মার্চ, এপ্রিল, মে—বাংলাদেশে এই তিনমাস হল চৈতালি ঘূর্ণি ও কালবৈশাখী ঝড়ের সময়। কিন্তু ঝড়জল খুব প্রবল ও ভয়ংকর হলেও, ঝড়ের পর বাইরের আবহাওয়া বেশ শান্ত শীতল ও উপভোগ্য হত। সপ্তাহে শনি রবিবার আমি স্যার রবার্ট চেম্বার্সের বাড়িতে না গিয়ে, কলকাতার চারমাইল উত্তরে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে ক্যাপ্টেন থর্নহিলের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। ক্যাপ্টেনের এই বিশাল বাগানবাড়িতে অনেকেই তখন স্ফূর্তি করার জন্য যেতেন। ক্যাপ্টেনও ছিলেন দিলদরিয়া লোক, সকলকে আদর-আপ্যায়নের জন্য দু'হাতে অর্থব্যয় করতেন। একবার এপ্রিল মাসের শেষে বোধ হয় কাশীপুরে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গেছি, সন্ধ্যায় সময় কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। এরকম প্রচণ্ড ঝড় অনেকদিন দেখি নি। ঈশানকোণ থেকে ঝড় উত্তর-পূর্ব কোণে সরে গেল এবং আরও প্রচণ্ডতর বেগে বইতে থাকল। আমার নিজের বাড়িটি উত্তর-পূর্ব দিকে খোলা বলে আমি রীতিমত চিন্তিত হলাম। বার বার আমার তৈরি নতুন বারান্দাটির কথা মনে হতে লাগল। ভাবলাম, ঝড়ের দাপটে হয়ত ফিরে গিয়ে দেখব বারান্দাটি ভেঙে পড়েছে, এবং তার সঙ্গে বাড়ির দেয়ালটিও।

ক্যাপ্টেনের বাড়ি থেকে বেরোতে রাত প্রায় বারটা হয়ে গেল। ফিটনে করে স্বগৃহাভিমুখে উর্ধ্বশ্বাসে যাত্রা করলাম। বাড়ির কাছে রাস্তায় এসে মধ্যরাতের আবছায়ায় মনে হল যেন আমার জীর্ণ বাড়ির কঙ্কালটা সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে আছে,

ভেঙে পড়ে নি। আরও একটু এগিয়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখলাম, আমার সাধের বারান্দা ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, উঠোনের উপর তার ভগ্নস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। যাই হোক, তবু আমার অদৃষ্ট ভালই বলতে হবে, কারণ গোটা বাড়িটা অন্তত ঝড়ে ধসে পড়ে নি।

তরুণী ইহুদী শিল্পী ইসাক॥ আমি ও ক্লিভল্যাণ্ড যখন একসঙ্গে থাকতাম তখন কলকাতায় একজন তরুণী চিত্রশিল্পী এসে হাজির হলেন। ক্লিভল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডেই তাঁর আলাপ হয়েছিল। সেইজন্য তিনি তাঁর চিত্রাঙ্কনের ব্যবসার সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। আমাকে একদিন অনুরোধ করলেন আমার প্রতিকৃতির জন্য শিল্পীর কাছে 'সিটিং' দিতে হবে। আমি রাজী হলাম, কারণ আম্মার একখানি ছবি আমার বোনকে পাঠাবার জন্য দরকার ছিল। প্রথম দিন যখন শিল্পীর স্টুডিওতে হাজরে দিলাম, তখন ক্লিভল্যাণ্ডও আমার সঙ্গে ছিলেন। ইহুদিনী শিল্পীর সামনে আমি বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ তিনি বললেন যে কুশ্রী চেহারা যাদের তারা যে কি করে শিল্পীর কাছে নিজের ছবি আঁকাতে আসে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। তাঁর অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে রীতিমত চমকে গিয়ে আমি বললাম, "এখানে অবশ্য আমি নিজে ইচ্ছে করে আসি নি, আপনার অনুরোধেই এসেছি। তা ছাড়া, আপনার এই মন্তব্যের অর্থ কি তাও আমি জানি না।" শিল্পী ইসাক তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ভঙ্গিতে বললেন, "বন্ধু ক্লিভল্যাণ্ডের পক্ষে এই ধরনের উক্তি করা খুবই অশোভন হয়েছে। আর আমাকে যদি কলকাতা শহরে কেবল সুন্দর লোকদের ছবি আঁকতে হয়, তা হলে তো আমাকে এখনই পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে, ব্যবসা করা আর

চলবে না।" বছর দুই পরে এই ইহুদিনী শিল্পী মহিলা হিগিনসন নামে কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ ধনিক কর্মচারীকে বিবাহ করেন।

ফ্রা ন্সি সে র প্রে মে র কা হি নী॥ মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় যে বিশেষ প্রীতিকর হয় নি, তা আগেই বলেছি। আমি যখন বার্কের পরিচয়পত্র তাঁকে দিয়েছিলাম তখন অ্যাটর্নিদের সম্বন্ধে তিনি যে দম্ভোক্তি করেছিলেন, তা কখনও ভোলবার নয়। তিনি নিজেকে এত উচ্চস্তরের জীব মনে করতেন যে সেখান থেকে অ্যাটর্নিদের তাঁর অতিনগণ্য জীব বলে মনে হত। কিন্তু অদৃষ্টচক্রে এমনই ঘটনা ঘটল যে তাঁকে সাংঘাতিকভাবে শেষ পর্যন্ত সেই অ্যাটর্নিদেরই শরণাপন্ন হতে হল। যে জন্য তাঁকে অ্যাটর্নির দ্বারস্থ হতে হল, সেই ঘটনাটি এই :

জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড নামে কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী একটি সুন্দরী ফরাসী তরুণীকে বিবাহ করেছিলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস ঘটনাচক্রে প্রায় উন্মাদের মতন তাঁর প্রেমে পড়লেন। এরকম উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রেম সচরাচর দেখা যায় না। প্রেমের তাড়নায় তিনি একদিন একটি বেআইনি কাজ করে একেবারে ফেঁসে গেলেন। আমি বাংলাদেশে আসার কয়েকমাস পরেই ঘটনাটি ঘটল। পাকেচক্রে এমনই হল যে মিঃ গ্রাণ্ড আমাকেই তাঁর অ্যাটর্নি মনোনীত করবেন স্থির করলেন। প্রস্তাব নিয়ে যখন তিনি আমার কাছে এলেন তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার পক্ষে তাঁর মামলা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফ্রান্সিসের প্রতি যে কোন বিশেষ অনুরাগবশত আমি এ কথা বলেছিলাম, তা নয়। ব্যাপারটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত লজ্জাকর বলে, এবং ফ্রান্সিস মিঃ বার্কের বন্ধু বলে আমি সংকোচবোধ করলাম। মিঃ গ্রাণ্ড আমার যুক্তি আদৌ সঙ্গত নয় বলে আমাকে

খুবই অনুরোধ করতে লাগলেন। প্রতিদিন তিনি আমার অফিসে আসতেন, এবং মামলার দায়িত্ব নেবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো সম্ভব নয় দেখে আমি অবশেষে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

যেদিন আমি পালালাম, সেইদিন সকালেই গ্রাণ্ড অফিসে এসে আমার ক্লার্ক টলফ্রেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মামলার ভার চাপিয়ে গিয়েছিলেন। টলফ্রের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কিন্তু তার উপর রাগ করতে পারলাম না। খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে এলাম, এবং আদালতে গিয়ে আমার মামলার দায়িত্ব নাকচ করে দিলাম। গ্রাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমার অনুপস্থিতিতে আমার ক্লার্ককে মামলা রুজু করতে বলে তিনি অন্যায় করেছেন। গ্রাণ্ড খুবই লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন, অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু তবু আবার আমাকে অনুরোধ করলেন মামলার ভার নেবার জন্য। আমি তা প্রত্যাখ্যান করে চলে এলাম। তিনি বাধ্য হয়ে শেষে অন্য একজন অ্যাটর্নি নিযুক্ত করলেন।

এদিকে ফিলিপ ফ্রান্সিস আমার নোটিশ পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনিও আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর মামলার দায়িত্ব নেবার জন্য। তাঁকেও আমি 'না' বলে দিলাম, এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে এ ব্যাপারে কারও পক্ষ সমর্থন করতে আমি রাজী নই।

যথাসময়ে মামলার বিচার আরম্ভ হল আদালতে। সাক্ষীসাবুদ ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে ফ্রান্সিসের একটি আচরণই অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হল। তিনি নাকি গ্রাণ্ডের অনুপস্থিতিকালে প্রায়ই লুকিয়ে ছদ্মবেশে শ্রীমতী গ্রাণ্ডের কাছে যেতেন। যদি সাধারণভাবে যেতেন, তা হলেও হয়ত বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু

প্রাচীরঘেরা বাড়ির ফটকও বন্ধ থাকত বলে, তিনি রাত্রিবেলা একখানি মই কাঁধে করে, কালো পোশাক পরে, চুপিসাড়ে যেতেন, এবং প্রাচীর টপ্‌কে বাড়িতে ঢুকে শ্রীমতী গ্রাণ্ডের ঘর পর্যন্ত হাজির হতেন। গ্রাণ্ডের ভৃত্যরা তাঁকে একাধিক রাত্রে শ্রীমতী গ্রাণ্ডের শয়নকক্ষ থেকে বেরুতে দেখেছে। ফ্রান্সিসের পক্ষে তাঁর আত্মীয় টিল্‌ঘম্যান আদালতে বিচারকদের সামনে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ তর্ক করলেন, এবং এই ধরনের অন্যান্য মামলার নজীর দেখিয়ে ফ্রান্সিসের অপরাধ লঘু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হল না।

বিচারের দিন দেখা গেল যে বিচারকদের মধ্যে ফ্রান্সিসের অবৈধ প্রেমের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জুনিয়র জজ হিসেবে জাস্টিস হাইড প্রথমে রায় দেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি বাইরে থেকে যত লঘুই মনে হোক, তিনি মনে করেন ফ্রান্সিস অপরাধ করেছেন, সেজন্য তাঁকে দণ্ড দেওয়া উচিত। হাইডের পরে বলেন স্যার রবার্ট চেম্বার্স। তিনি আইনের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বলেন যে ফ্রান্সিস-মিসেস গ্রাণ্ডের অবৈধ প্রেম আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ নয়। অবশেষে চীফ জাস্টিস স্যার এলিজা ইম্পে রায় দেন। চেম্বার্সের আইনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তার অধিকাংশই বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এই অপরাধ বিচারের জন্য স্যার রবার্টের মতন আইনবিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। জাস্টিস হাইডের সঙ্গে তিনিও একমত, এবং ফ্রান্সিসের দণ্ড পাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর দণ্ড হল, পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা। হাইড সেই সময় ইম্পের কানে-কানে বলে দিলেন, "বলুন, সিক্কা টাকা।" "হ্যাঁ হ্যাঁ' সিক্কা টাকা," ইম্পে বললেন। আদালতকক্ষের শ্রোতারা সকলে হেসে উঠলেন।

বিচারের সাতদিনের মধ্যে টিল্‌ঘম্যান ইংলণ্ডে আপীল করার জন্য আদালতে এসে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। স্যার রবার্ট যে-সব আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, টিল্‌ঘম্যানও তাই করলেন। চীফ জাস্টিস মন্তব্য করলেন, "এ যুক্তি তো আগেই স্যার রবার্টের কাছ থেকে শুনেছি।" এই সময় ফ্রান্সিসের কাছ থেকে তিন লাইন লেখা এক-টুকরো কাগজ এল টিল্‌ঘম্যানের কাছে। আমি আদালতে তাঁর পাশে বসে থাকলেও, তাতে কি লেখা ছিল দেখতে পেলাম না। দেখলাম, আপীলের আবেদন আর পেশ করা হল না। পরেও আর কোনদিন হয় নি। জানা গেল, গ্রাণ্ড সাহেব জরিমানাটা আধাআধিতে রফা করে ব্যাপারটা ফ্রান্সিসের সঙ্গে আপসে মিটিয়ে ফেলেছেন। কারণ এদেশে যা হবার তা হল, আবার ইংলণ্ডে যদি এই নিয়ে হৈ-চৈ হয়, তা হলে গ্রাণ্ড সাহেবই আর স্বদেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না। যা ঘটেছে তাতে কলঙ্ক ও লজ্জা তাঁর, প্রেমিক ফ্রান্সিসের নয়। সেইজন্যই তিনি ব্যাপারটা ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলবেন। ফ্রান্সিসও দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ, অতএব গররাজি হলেন না।

ফিলিপ ফ্রান্সিসের এই রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপার নিয়ে কলকাতার সাহেব-সমাজে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। ব্রেকফাস্টে ডিনারে, ট্যাভার্নে কফিহাউসে, হোটেলে বাড়িতে, পাল্কিতে ফিটনে, পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে বেড়াতে, সর্বত্র সর্বদা ফ্রান্সিসের দুঃসাহসিক রোমান্স সকলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। ফুটন্ত ও আধফোটা কবিরা ঘটনাটি থেকে কাব্যিক প্রেরণা সঞ্চয় করে বেশ কিছু কবিতাও লিখে ফেললেন। তার মধ্যে একটি কবিতা এই :

Psha ! What a Fuss, 'twixt SHEE, and 'twixt her !
What abuse of a dear little creature,

A GRAND and a mighty affair to be sure,
Just to give a light PHILIP (fillip) to nature.
How can you, ye prudes, blame a luscious young
wench,
Who so fond is of Love and romances,
Whose customs and manners are tout a fait French,
For admiring whatever from FRANCE-IS.

ফ্রান্স, ফ্রান্সিস ও গ্রাণ্ডের তরুণী ফরাসী পত্নীকে নিয়ে কবিরা এ রকম অনেক কৌতুককাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স-বাসিনীর রোমান্সের নটেগাছটি কলকাতা শহরে ফ্রান্স-ইসের কেলেঙ্কারিতে শুকিয়ে গেল না। ফরাসী প্রেমের বীজ আবার ফরাসী দেশের মাটিতে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠল। মনের দুঃখে শ্রীমতী গ্রাণ্ড কলকাতা শহর ছেড়ে প্যারিসে চলে গেলেন। সেখানে প্রসিদ্ধ তালিরান্দ তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়লেন, এবং বিবাহও করে ফেললেন। ফিলিপ ফ্রান্সিসের রোমান্টিক প্রেমকথার শেষ হল ফ্রান্সে।

৩

চন্দননগর চুঁচুড়া॥ গ্রীষ্মকালে মার্চ মাসের পর আদালতের ছুটি মিলল কিছুদিন। এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে বেড়াতে বেরুলাম। একটি ফিটনে করে প্রথমে গেলাম ব্যারাকপুর— কলকাতা থেকে মাত্র মাইল পনের দূরে। ব্যারাকপুরে সিপাইরা থাকে, এবং প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে সিপাইদের একটি ব্যাটেলিয়ান সেখান থেকে ফোর্ট উইলিয়মে যায় 'ডিউটি' দেবার জন্য। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ব্যারাকপুরে থেকে আমরা পলতায় গেলাম জন প্রিন্সেপের কাছে, তাঁর কাপড় ছাপানোর কারখানা দেখতে। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করলেন, এবং আমরা দু'দিন বেশ আরামে সেখানে কাটিয়ে দিলাম। পলতা থেকে আমরা চন্দননগর গেলাম ফরাসী গবর্নরের বাড়ি। তাঁর বাড়িতে অবশ্য তিনি তখন থাকতেন না, মঁশিয়ে শেভিলার্ড নামে একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসী ভদ্রলোক থাকতেন। তিনিও আমাদের বেশ রাজকীয় স্টাইলে আপ্যায়ন করলেন। চন্দননগর থেকে গেলাম চুঁচুড়ায়, বাংলাদেশের ডাচ উপনিবেশে। তখন গবর্নর ছিলেন মিঃ রোজ। হল্যাণ্ডে জন্ম হলেও, তাঁর পিতা ছিলেন স্কচম্যান। ডাচ গবর্নরও ঠিক নবাবের মতন বাস করতেন চুঁচুড়ায়। মধ্যে মধ্যে তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সভা বসত তাঁর বাড়িতে এবং সভার শেষে কেউ তাঁর দিকে পিছন ফিরে যেতে পারত না। অর্থাৎ ফিরে যাবার সময় তাঁদের এক-পা এক-পা

করে পিছিয়ে যেতে হত। যাবার সময় তাঁরা মাথা হেঁট করে হাত তুলে সেলাম করতে করতে যেতেন। আমরা যেদিন তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম, সেদিন দেখলাম তাঁর বাড়ির বিশাল একটি হলঘরে প্রকাণ্ড একটি টেবিল পাতা, এবং তার উপর প্রায় পঞ্চাশটি কভার বিছানো। বুঝলাম এটি ভোজের আয়োজন ছাড়া কিছু নয়। ভোজের সময় হল যখন, তখন হলঘরের পিছনের একটি দরজা হঠাৎ খুলে গেল, এবং সকলের সামনে আবির্ভাব হল গবর্নর রোজের। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কায়দায় ব্যাণ্ড বেজে উঠল, এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজনা চলতে থাকল, থামল না। সন্ধ্যার সময় আমরা ফোর্ট ও পাবলিক বিল্ডিং সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তিনদিন মহানন্দে চুঁচুড়ায় কাটিয়ে আমরা আবার পলতায় গেলাম প্রিন্সেপের কাছে, এবং সেখানে আরও তিনদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

'ক্যাচ ক্লাবের' কথা॥ কলকাতায় ফিরে এসে আমি একটি ক্লাবের সভ্য হলাম, তার নাম 'ক্যাচ ক্লাব' (Catch Club)। এরকম একটি চমৎকার ক্লাবের সভ্য আর কখনও আমি হয়েছি বলে মনে পড়ে না। ক্লাবটি মহিলাদের কাছে মোটেই পছন্দসই ছিল না, এবং তাঁদের ঢুকতেও দেওয়া হত না ক্লাবে। অর্থাৎ ক্লাবের সভ্য হবার অধিকার ছিল না মহিলাদের। কয়েকজন সুরশিল্পী ও সংগীতরসিক মিলে এই ক্লাবটি গড়ে তোলেন। 'হারমনিক' নামে সুরজ্ঞদের একটি সভায় এই ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। দেখা যায়, সেই সভায় যখন কোন সংগীত বা বাজনা হত, তখন কাঁচা-বয়সের ছেলেমেয়েরা অনবরত বক্‌বক্ করে কথা বলে তার রসভঙ্গ করে দিত। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিশুদ্ধ রসিকরা মনস্থ করলেন যে তাঁরা একটি আলাদা সুরসভা করবেন, এবং তাতে বেরসিকদের প্রবেশা-

ধিকার থাকবে না। এই সভারই আমি সভ্য হলাম। আমি অবশ্য পুরনো হারমনিকেরও সভ্য ছিলাম, কিন্তু নতুন সভা স্থাপিত হবার পর হারমনিক ক্রমে একটি নাচসভায় পরিণত হল, এবং তার খ্যাতি কমে গেল অনেক। তরুণী মেয়েরা বিদ্রূপ করে নতুন ক্লাবকে বলত 'He Harmonic,' অর্থাৎ 'পুরুষ হারমনিক'। নতুন ক্লাবের উদ্বোধন হল বিখ্যাত একটি কনসার্টের মহড়া দিয়ে। কলকাতা শহরের খ্যাতনামা শিল্পীরা সকলে প্রায় এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা সাতটায় আরম্ভ হয়ে কনসার্ট শেষ হল রাত সাড়ে নটায়। দশটায় আমরা 'সাপার' খেতে বসলাম। তারপর আরম্ভ হল ভাল ভাল 'catch,' 'glee' ও একক-সংগীত। লর্ড স্যাণ্ডউইচের বিখ্যাত 'ক্যাচ ক্লাবের' সভ্য মিঃ প্ল্যাটেল থেকে আরম্ভ করে গোল্ডিং, হেইনস, প্লেডেল প্রমুখ নামজাদা গায়করা একে একে গাইলেন, এবং ক্লাবের সভ্যরা পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করলেন। অবশেষে আমারও ডাক পড়ল, এবং আমি সভাপতির চেয়ারে বসেই কয়েক কেতলি শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলাম। সভাস্থ সকলে আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাহবা দিতে লাগলেন। প্ল্যাটেল নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে এই অমূল্য প্রস্তাবের জন্য স্বর্ণাক্ষরে আমার নাম খোদাই করে রাখা উচিত।

গানবাজনার মজলিসে রাতভোর হয়ে গিয়ে সূর্য উঠে গেল। মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেল বলে সেইদিনই ঠিক করা হল যে দু'টো বাজলেই এবার থেকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দেওয়া হবে। ক্লাবের সভ্যসংখ্যা পঁচিশ জনের বেশি হবে না বলে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু 'ক্যাচ ক্লাব' শেষ পর্যন্ত এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে একটি সভ্যপদ খালি হলে তার জন্য অন্তত পঞ্চাশজন আবেদন করতেন।

পথের দুর্ঘটনা॥ বাংলাদেশে তখন যাঁরা থাকতেন তাঁরা প্রায় জলের মতন মদ্যপান করতেন, এবং নানারকমের ভোজসভায় কেবল নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতেন। সামাজিকতার ব্যাপারে আমি বিশেষ অনুরাগী ছিলাম, এবং সেইজন্য কলকাতা শহরে অল্পদিনের মধ্যে 'best host' বলে আমি সকলের কাছে পরিচিত হলাম। বেলা একটায় সাধারণত তখন ডিনার খাওয়া হত, এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যার আগে গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরুনো হত ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দিকে। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে বেড়াতে বেড়াতে সকলে কিছুক্ষণ গল্পগুজবও করতেন।

একবার আমি একটি বেশ বড় ডিনার-পার্টি দিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন হেফারম্যান নামে একজন আইরিশ ভদ্রলোক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন এমনিতে খুব চমৎকার লোক, তবে একটু ল্যাদ্‌লেদে স্বভাবের। অতিথিদের সকলকে আমি আকণ্ঠ মদ্যপান করালাম। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সকলেই চিৎ হয়ে পড়লেন, হেফারম্যান ছাড়া। কিন্তু তিনিও আর একফোঁটাও পান করতে চাইলেন না। আমি তাঁকে বললাম, "চলুন একটু বাইরে থেকে হাওয়া খেয়ে ঘুরে আসি, তা হলেই শরীর ও মেজাজ দুই-ই ঠিক হয়ে যাবে।" আমার প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন, এবং আমরা দু'জনে ফিটনে করে বেরিয়ে পড়লাম।

যত জোরে একজোড়া ঘোড়া দৌড়তে পারে, তত জোরে আমার ফিটনও ছুটতে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। কি বা অন্ধকার, কি বা আলো, কোন কিছুরই চেতনা তখন আমার ছিল না। কণ্ঠ তো বটেই, মাথা পর্যন্ত তখন আমার ক্ল্যারেটে আচ্ছন্ন, রীতিমত ভোঁ ভোঁ করছে। ঘোড়া কোন্‌দিকে ছুটছে, তার দিকনির্ণয় করাও তখন দুঃসাধ্য। সঙ্গী হেফারম্যান গাড়ির মধ্যে দু-চারবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি

খেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি ঠিক রাস্তায় চলেছি? আমার তো তা মনে হয় না।" আমি তাঁর কাছে স্বীকার করলাম যে সঠিক রাস্তার খবর আমি জানি না। এ কথা বলতে না বলতেই ঘোড়া ছ'টি ফিটনসহ আমাদের নিয়ে বিরাট একটি গর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে পড়ল। গর্তটি প্রায় বারো-চোদ্দ ফুট গভীর এবং বারোমাসের মধ্যে আটমাস জলে ভর্তি থাকে। কিন্তু আমাদের পতনকালে, ভাগ্য ভাল বলেই গর্তটি শুকনো ছিল। স্বর্গ থেকে নরকে পড়লেও বোধ হয় মানুষ এরকম হতভম্ব হয়ে যায় না। আমরা অবাক না হতে হতে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গেলাম, এবং সম্বিৎ-হারা হয়ে যেন একটা অন্ধকার কবরের মধ্যে হাঁটুমুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখলাম, আমার আইরিশ বন্ধুটি পুঁটলি পাকিয়ে পাশে পড়ে রয়েছেন, এবং হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে কি যেন হাতড়াচ্ছেন। আমার মাথায় হাত ঠেকতেই বললেন, "এই যে পেয়েছি, নিশ্চয় ঘোড়া নয়, হিকি সাহেবের মাথা।" আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" তিনি বললেন, "এমন গাড্ডাতে ফেলেছেন যে আর উঠতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না। কোথায় ধরণী আর কোথায় আমি, কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। দয়া করে আমাকে গাড্ডা থেকে নির্গমনের পথ দেখিয়ে দিন।"

"পথ তো নিশ্চয় দেখানো উচিত, কিন্তু উভয়েরই যে অবস্থা তাতে কে কাকে পথ দেখাবে বলুন!" এই কথা বলে আমি কোনরকমে মাটি হাঁচড়ে উপরে ঠেলে উঠলাম, এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার বন্ধুটিকেও উঠতে সাহায্য করলাম। দূরে দেখলাম একটি আলো জ্বলছে। বন্ধুটিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলে আমি সেই আলো লক্ষ্য করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ঘোড়া ছ'টি সম্বন্ধে খোঁজ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। উর্ধ্বশ্বাসে হনহন

করে চলতে চলতে আবার ফের একটি গর্তের মধ্যে পড়লাম। পা মুচকে বেকায়দায় পড়াতে এবারে রীতিমত আঘাত পেলাম—মনে হল যেন হাড়গোড় ভেঙে গেল। চোখের সামনে থেকে আলো নিভে গেল, অন্ধকারে চেতনাও ক্রমে ডুবে যেতে লাগল। এরকম ঘোর সংকটে কখনও পড়ি নি। এমন সময় কয়েকজন এদেশী গ্রাম্যলোক ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা আমায় দেখতে পেয়ে দাঁড়াল, এবং গর্ত থেকে টেনে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল। হাসপাতাল কাছেই ছিল, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যে পালকিতে করে সেখানে পৌঁছতে কোন অসুবিধা হল না। লোকজনেরাই আমার জন্য পালকি ডেকে এনেছিল।

হাসপাতালে হেড-সার্জেনের ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমি তাঁকে আদ্যোপান্ত ঘটনার বিবরণ দিলাম, এবং আমার সঙ্গীটিকে কি অবস্থায় রেখে এসেছি তাও তাঁকে জানালাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি লোকজন পাঠিয়ে আমার ঘোড়া দু'টি, গাড়ি ও বন্ধুটিকে খুঁজে নিয়ে এলেন। ঘোড়া দু'টি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে রয়েছে দেখে আমার খুবই আনন্দ হল। হেফারম্যানও দেখলাম বিশেষ আঘাত পান নি, হাঁটুতে সামান্য চোট লেগেছে মাত্র। আমারই অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে কাহিল, বিশেষ করে দ্বিতীয়বার গর্তে পড়ার পর। আমাদের অবস্থা সব দেখেশুনে আইরিশ বন্ধুটি গম্ভীরভাবে বললেন যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন তিনি মাতাল গাড়োয়ানের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরুবেন না।

লে ডি ই ম্পে র না চ স ভা॥ কয়েকদিনের মধ্যে চীফ জাস্টিসের বাড়িতে একটি নাচসভায় নেমন্তন্ন হল। লেডি ইম্পেই এই সভার আয়োজন করেছিলেন। নাচসভায় কলকাতা শহরের গণ্যমান্য সাহেবসুবোদের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। খাবার

সময় আমি জাস্টিস হাইডের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলাম। আমাদের পাশে একদল তরুণ ছোকরা খেতে বসেছিল। জাস্টিস হাইড যেমন খেতে ভালবাসতেন, তেমনি খেতেও পারতেন। তাঁর খাওয়া দেখে একজন তরুণ ছোকরা মন্তব্য করল, "জজসাহেব যে রকম গোগ্রাসে মুরগি খাচ্ছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর স্ত্রীর চেয়ে টার্কি মুরগি ভালবাসেন বেশি।" কথাটা বেশ স্পষ্টই হাইডের কানে গেল। তিনি মুরগির ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে ছোকরার দিকে মুখ তুলে বললেন, "তা ঠিক নয় হে ছোকরা, তা ঠিক নয়!" হাইড শুনতে পেয়েছেন দেখে ছেলেটি লজ্জায় চেয়ার ছেড়ে দূরে চলে গেল।

সপ্তাহে প্রায় একদিন করে আমি জাস্টিস হাইডের বাড়ি যেতাম সংগীতসভায় যোগ দিতে। লেডি হাইড সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, এবং সুগায়িকা বলে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অ হ ঙ্কা রী ক মো ডো র ॥ আমি যখন বাংলাদেশে এলাম তখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই চলেছে পণ্ডিচেরীতে, এবং একটি ব্রিটিশ নৌবহর ফরাসী উপনিবেশে অভিযান করবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের অধীনে যে নৌবহর ছিল তা ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্য নয়। বাংলাদেশে তাই খবর এল কিছু সাহায্য পাঠাবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস দু'খানি বাণিজ্যপোত সামরিক কায়দায় সাজিয়ে মাদ্রাজে পাঠাবেন স্থির করলেন। জাহাজ দু'খানির ভার দেওয়া হল জোসেফ প্রাইস নামে এক ভদ্রলোকের উপর। ভদ্রলোক একসময় নৌবিভাগে ছিলেন বটে, কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়ে হেস্টিংসের কৃপাশ্রয়ে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর উপর জাহাজের ভার দিয়ে 'কমোডোর' উপাধি দেওয়া হল, এবং 'রেজলিউশন' নামে একটি জাহাজে একজন ক্যাপ্টেনও দেওয়া হল তাঁর অধীনে।

অনেকদিন থেকে হেস্টিংসের ইচ্ছা ছিল বোম্বাইয়ের মতন কলকাতাতেও নৌবিভাগের একটি ঘাঁটি স্থাপন করা। এই সুযোগে তিনি তাঁর কাউন্সিলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। কোম্পানির নিজের জাহাজ 'ব্রিটানিয়া' ও 'ন্যান্সি' রণপোতে পরিণত করে কলকাতার শেরিফ রিচার্ডসনের উপর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল, এবং তাঁকেও করা হল 'কমোডোর'। রিচার্ডসন সগৌরবে তাঁর জাহাজে মর্যাদার নিশান উড়িয়ে দিলেন। ওদিকে প্রাইসও তাঁর জাহাজে 'কমোডোর' হয়ে একই নিশান উড়িয়েছিলেন। কার এই নিশান ওড়াবার অধিকার আছে তাই নিয়ে দুই দৈবাৎ-কমোডোরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হল। ব্যাপারটা হেস্টিংসের কানে পৌঁছল, এবং তিনি রীতিমত বিরক্ত হয়ে দু'জনকেই ডেকে পাঠালেন। দু'জনে কাছে আসতে তাঁদের তিনি বেশ ধমক দিয়ে বললেন, "ছেলেপিলেরা যেমন খেলনা নিয়ে ঝগড়া করে, আপনারা দু'জনেও তেমনই নিশান নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন। যদি এখনই এই ঝগড়ার শেষ না হয়, তা হলে আপনাদের খেলনা কেড়ে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হব। ভবিষ্যতে আর কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনাদের দেওয়া হবে না।"

হেস্টিংসের কথায় কাজ হল। দুই কমোডোরের নিশানই সমান মর্যাদায় হাওয়ায় উড়তে লাগল। রিচার্ডসন অবশ্য খুব বেশি মাথা হেঁট করেন নি। 'ন্যান্সি' জাহাজখানির ভার দেওয়া হল আমার আইরিশ বন্ধু হেফারম্যানের উপর। ১৭৭৮, এপ্রিলের মাঝামাঝি কমোডোর প্রাইস মাদ্রাজ যাত্রা করলেন তাঁর জাহাজ নিয়ে। রিচার্ডসন যাত্রা করার আগে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করলেন তাঁর জাহাজে। এ রকম ভোজ কলকাতা শহরে উঁচু মহলেও সাধারণত হয় না। শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ব্রিটানিয়া জাহাজখানিকে অনেক টাকা খরচ করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল। কোনদিক থেকে আয়োজনের ত্রুটি হয় নি কিছু। কেবল একটি মাত্র ত্রুটি ছিল এই যে ডক থেকে জাহাজে উঠবার কোন নির্দিষ্ট ল্যাডার কিছু তখন ছিল না। নিমন্ত্রিত মহিলাদের তাই বাধ্য হয়ে চেয়ারে বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে হত। কলকাতায় মিসেস উড নামে কোম্পানির এক বিশিষ্ট কর্মচারীর বিখ্যাত স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রী হিসেবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন তাঁর বিরাট বপুর জন্য। তাঁর মত স্থূলকায় মহিলা তখন কলকাতায় আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। ভোজের দিন মুশকিল হল, তাঁকে ডক থেকে জাহাজ পর্যন্ত পার করা নিয়ে। চারজন লোক যখন তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে পার করবার চেষ্টা করল, তখন দেখা গেল যে দড়ি আর সরছে না। একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে দেখে উপরের কেবিন থেকে নাবিকেরা নিচের দিকে লক্ষ্য করে দেখল মিসেস উডের অবস্থা। তাঁর চেহারা দেখে সকলে একসঙ্গে হৈ-চৈ করে উঠে বলল, "এ মাল জাহাজে তোলা যাবে না, সকলে মিলে চেষ্টা করলেও না।" অবশেষে অবশ্য মিসেস উডকে জাহাজে তোলা হল বটে, কিন্তু এমন হল্লা করে তোলা হল যে, ব্যাপারটা অনেকের কাছে খুব শোভন মনে হল না। গোড়াতেই শ্রীমতী উডকে নিয়ে একটা করুণ ও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল। তাঁর স্বামী বেচারী অসম্ভব চেঁচামেচি করলেন, এবং বোঝা গেল বিরক্তও হলেন যথেষ্ট। কিন্তু শ্রীমতী একেবারে নির্বিকার রইলেন, এবং অপরাধীদের ক্ষমা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না।

ভদ্রলোক ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় দেড়শ' জন সেদিন ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন। খানাপিনার বেশ এলাহী ব্যবস্থা করেছিলেন কমোডোর সাহেব। খাবার সময় সামরিক বিভাগের বাদকেরা চমৎকার বাজনাও বাজিয়েছিল। সমস্ত জাহাজ ও ডক

নানারঙের রঙিন বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর নর্তকীদের নাচ শুরু হল নৃত্যমঞ্চে। একদিকে নাচ চলতে লাগল, আর একদিকে চলতে লাগল মদ্যপান। উর্বশীদের সভায় যাঁরা গেলেন না, তাঁরা সুরাদেবতা ব্যাকাসের সাধনায় মশগুল হয়ে রইলেন। অনর্গল ধারায় তাঁদের কণ্ঠনালী দিয়ে শ্যাম্পেন ও ক্ল্যারেট বয়ে যেতে লাগল। বরফে ঠাণ্ডা করা পানীয়ের আস্বাদই আলাদা বলে সকলে আকণ্ঠ সুরাপান করলেন। রাত্রি একটার সময় যথারীতি 'সাপার' খেতে দেওয়া হল এবং সকলেই তা বেশ সাগ্রহেই খেলেন। তারপর গায়ক-গায়িকারা আরম্ভ করলেন সুললিত কণ্ঠে গান। গানের রেশ শেষ হতে না হতে সুন্দরী নর্তকীরা আবার উঠলেন নাচের জন্য। সকাল ছ'টা পর্যন্ত তাঁদের নাচ চলল। ক্লান্তিতে সকলে তখন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। এবারে যে যার উঠে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

সাং বা দি ক হি কি ॥ কলকাতায় কয়েকদিন থাকার পর আমি একদিন সাংবাদিক হিকির কাছ থেকে একখানি অপ্রত্যাশিত চিঠি পেলাম। তখন তিনি ঋণের দায়ে জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন। চিঠি লিখে আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, এবং সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর তাঁকে রীতিমত মাথাপাগলা লোক বলে মনে হল। তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হল না। আচারে-ব্যবহারে তাঁকে বদ্ধ পাগল বললে ভুল হয় না। তাঁর পাগলামির জন্য তাঁকে আমি 'ক্ষ্যাপা আইরিশম্যান' বলে ডাকতাম। যেদিন তাঁর সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ হল সেদিন তিনি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কারাজীবনের চরম দুর্দশার কথা আমাকে বললেন। তাঁর এই দুর্ভোগের জন্য কয়েকজন

কুচক্রী বাঙালীই যে দায়ী, সেকথাও তিনি আমাকে জানাতে ভুললেন না। বুঝলাম, বাঙালী মহাজন বা বেনিয়ানদের কাছে ঋণের দায়ে তিনি প্রায় দু'বছরের উপর জেল খাটছেন। হিকি অবশ্য ঋণের কথা অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আমি জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম, এবং তিনি আমাকে যে-সব কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। বেচারীর দুরবস্থা দেখে দুঃখও হল এবং আদালতে তাঁর মামলা তদারক করব বলে আমি তাঁকে কথা দিয়ে ফেললাম।

জেমস হিকি যে মাথাপাগলা লোক, তা আগেই বলেছি। লোকজনের কাছে খোঁজ করতে তাঁরাও ঐ কথা বললেন। আদালতে মামলা উঠলে একটুতেই তিনি নাকি ক্ষেপে যান এবং নিজের অ্যাটর্নি-উকিলদের যা-তা বলে গালিগালাজ করেন। সেজন্য তাঁর মামলা করতে কেউ রাজী হন না। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই চিন্তার বিষয় হল বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে সত্যিই করুণা হল, রাজী না হয়ে পারলাম না। তবু তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে মামলার ভার যতক্ষণ আমার উপর থাকবে ততক্ষণ, হাজার ভুলচুক ও অন্যায় হলেও, সে সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলতে পারবেন না। এই ধরনের কোন বেয়াদপি আমি সহ্য করতে পারব না। আমার কথায় যখন তিনি রাজী হলেন, তখন তাঁর মামলার কাগজপত্র আমি চেয়ে নিলাম।

কাগজপত্র বুঝে নিয়ে টিল্‌ঘম্যান ও মর্সকে অনুরোধ করলাম হিকির পক্ষে দাঁড়াবার জন্য। মামলার শুনানির দিন হেবিয়াস কর্পাসের সাহায্যে তাঁকে জেলখানা থেকে আদালতে নিয়ে আসা হল। টিল্‌ঘম্যান যখন একজন সাক্ষীকে জেরা করতে আরম্ভ

করলেন, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হিকি সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না, প্রতিশ্রুতির কথাও ভুলে গেলেন। হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মতন চিৎকার করে বললেন টিল্‌ঘম্যানের দিকে আঙুল দেখিয়ে, "স্যার্, উনি কিছুই জানেন না স্যার্! এদেশের আদালতে ওকালতি করছেন বটে, কিন্তু নেটিব বাঙালীদের কিভাবে জেরা করে কথা বার করতে হয় তা তিনি এখনও শেখেন নি। হুজুর যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি নিজেই সাক্ষীকে জেরা করতে পারি।"

হিকির এই ব্যবহারে টিল্‌ঘম্যান তৎক্ষণাৎ মামলার কাগজপত্র ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং এই অপমানের জন্য আমার উপরেই দোষারোপ করলেন। করাই স্বাভাবিক, কারণ আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে আদালতে হিকি কোন অশোভন ব্যবহার করবেন না। এইভাবে আমাকে অপদস্থ করা হল বলে আমি হিকিকে ডেকে এনে মিথ্যাবাদী, ভবঘুরে, কুলাঙ্গার ইত্যাদি বলে খুব গালমন্দ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেচারী একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন, এবং তাঁর অন্যায় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কেবল আমার কাছে নয়, চীফ জাস্টিসের কাছেও। তাঁর কাছে তিনি হাতজোড় করে বললেন যে আর কখনও তিনি আদালতের মধ্যে এ রকম ব্যবহার করবেন না। যাতে আমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে আবার মামলার ভার নিই, সেজন্য আমাকে অনুরোধ করতে তিনি জজসাহেবের কাছে আবেদন করলেন। আমি শেষ পর্যন্ত রাগ করতে পারলাম না, আবার তাঁর মামলার ভার নিলাম। অবশেষে মামলাতে আমাদেরই জিত হল, বিশ হাজার টাকা মিথ্যা ঋণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হিকি কারামুক্ত হলেন।

মুক্তি পাবার দু'দিনের মধ্যেই আবার একজন তাঁর বিরুদ্ধে

কোর্টে নালিশ করলেন। এবারেও শুনানির সময় তিনি আদালত-গৃহের মধ্যেই সাক্ষীকে অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি করলেন—চোর-জোচ্চোর-পাষণ্ড-নরাধম ইত্যাদি। ঘন ঘন বুক চাপড়ে তিনি ভগবান যীশুকে ডেকে বলতে লাগলেন, "হায় যীশু! কেন আমায় শঠ ও প্রবঞ্চকদের খপ্পরে ফেলে এইভাবে নাজেহাল করছ!" যাই হোক, এই দ্বিতীয় মামলাতেও আমাদের জিত হল, হিকি সমস্ত ঋণের দায় থেকে একেবারে মুক্ত হলেন।

হিকির প্রথম প্রেস ও সংবাদপত্র॥ আমার সঙ্গে যখন হিকির প্রথম সাক্ষাৎ হল তার প্রায় সাত বছর আগে তিনি এদেশে আসেন। জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকার সময় একটি কারণে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি প্রিন্টিং সম্বন্ধে এই সময় একখানি বই হাতে পান, এবং বইখানি পড়ে তাঁর মনে প্রিন্টার হবার বাসনা জাগে। আমি যতদূর জানি, কলকাতা শহরে তখন ছাপাখানা বলে বিশেষ কিছু ছিল না। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বইখানি পড়ে হিকি ছাপার 'অক্ষর' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, এবং অনেকদিন ধৈর্য ধরে অসাধারণ পরিশ্রম করে তিনি একসেট ছাপার হরফ তৈরি করেন। তাঁর এই ছাপার হরফ দিয়ে বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল ছাপার কাজ মোটামুটি চলে যেত। যথেষ্ট সুলভ হারে তিনি এই সব কাজ করতে পারতেন বলে তাঁর ছাপাখানার ব্যবসা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জমে গেল। ব্যবসা থেকে কিছুদিনের মধ্যে সামান্য কয়েকশ' টাকা জমিয়ে তিনি ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন, পুরো একসেট ছাপাখানার যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদি আনার জন্য। তার সঙ্গে কিছু ওষুধ-পত্তরেরও অর্ডার দিলেন ডাক্তারী করার উদ্দেশ্যে। প্রিন্টার ও ডাক্তার দুই-ই হবার ইচ্ছা হল তাঁর।

ইংলণ্ডে ছাপাখানার অর্ডার দিয়ে মনে মনে তিনি আর একটি

পরিকল্পনা করে বসলেন। তাঁর ইচ্ছা হল, কলকাতা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। তখন কোন সংবাদপত্র শহরে ছিল বলে আমি জানি না। বিলেত থেকে টাইপপত্র এসে পৌঁছতে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন বলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সকলেই তাঁর পরিকল্পনার কথা শুনে খুশি হয়ে তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। উৎসাহ পেয়ে হিকি যথাসময়ে তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পত্রিকার বিশেষত্ব ও নতুনত্বের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তার পাঠকসংখ্যাও বেশ জুটে গেল। শ্লেষ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-রসিকতাই ছিল পত্রিকার বিশেষত্ব, যদিও সেগুলি খুব উচ্চস্তরের নয়। তার আরও একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি যে-কোন ব্যক্তির চরিত্র অনুযায়ী চমৎকার নামকরণ করতে পারতেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী রচনা করতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কলকাতা শহরে তখন টিরেটা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর পেশা ছিল স্থাপত্য। তিনি ইটালীয়ান হলেও জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে ফ্রান্স ও জার্মানিতে কাটাতে হয়। প্রায় কুড়ি বছর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে বাস করার পরেও তিনি তাই ইংরেজী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেন নি। কথা বলার সময় এমন একটা জগাখিচুড়ি ভাষায় তিনি কথা বলতেন, যা ইংরেজী ফরাসী পর্তুগীজ ও হিন্দুস্থানী না জানলে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দেখতে তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন, এবং সুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে সবচেয়ে আগে নজরে পড়ত তাঁর দীর্ঘ তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকাটি।

গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উত্তাপ বাড়ে জুন মাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জুনমাসের চার তারিখে রাজার জন্মদিন উপলক্ষে গবর্নরের নাচসভায় তিনি দামী ভেলভেটের সুট পরে সুসজ্জিত

হয়ে প্রতি বছরেই যোগ দিতেন। একবার এই নাচসভার বিবরণ দিতে গিয়ে টিরেটা সম্বন্ধে হিকি তাঁর পত্রিকায় লেখেন : "Nosey Jargon danced his annual minuets, seasonably dressed in a full suit of crimson velvet." টিরেটা সম্বন্ধে এমন সুন্দর নামকরণ আগে কেউ করতে পারেন নি। তারপর থেকে টিরেটা 'Nosey Jargon' নামে কলকাতার সাহেব-সমাজে পরিচিত হয়ে যান। বিশিষ্ট নাকের জন্য 'Nosey', এবং পাঁচমিশালী ভাষার জন্য 'Jargon'।

পত্রিকা চালিয়ে হিকি বেশ মোটা মুনাফা করতেন। যদি একটু মাথাঠাণ্ডা করে তিনি পত্রিকাটি চালাতেন, তা হলে ব্যবসার দিক থেকে লাভবান তো হতেনই, নিজেও যথেষ্ট অর্থ রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি পারেন নি, কারণ সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে পত্রিকায় কটু মন্তব্য করার ফলে তিনি অনেকবার মানহানির মামলার দায়ে পড়ে বহু টাকা খেসারত দিয়েছেন। তাঁর পত্রিকার ব্যাপারে একটা না একটা মামলা আদালতে লেগেই থাকত এবং সবই মানহানির মামলা। মানহানির দায়ে এইভাবে হিকি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, তবু তাঁর পত্রিকার এই আত্মঘাতী নীতি পরিহার করেন নি।

গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে আমি প্রায় বজবজ আমার এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে যেতাম। কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি সুন্দর জায়গায় নদীর তীরে তিনি থাকতেন, এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আমি সত্যিই খুব আনন্দ পেতাম। এইভাবে কলকাতার বিশিষ্ট সমাজে চলেফিরে পরমানন্দে আমার দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। অ্যাটর্নির ব্যবসাও বেশ জমে উঠল, এবং দিন দিন মক্কেলের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে লাগল। সারা সকাল একটানা কাজ করেও আমি তাল সামলাতে পারতাম না।

জুরির বিচারের জন্য আন্দোলন॥ কলকাতা শহরের আদালতের বিচারকরা তখন ইংরেজই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিচারে ইংরেজরাই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এদেশের 'নেটিব'দের মতন আদালতে তাঁদেরও অপরাধের বিচার করা হবে, ইংলিশম্যান ও ইণ্ডিয়ানের মধ্যে মর্যাদার কোন তারতম্য থাকবে না, এ কথা মেনে নিতে তাঁদের জাত্যভিমানে বাধল। যে ঘটনা থেকে ইংরেজদের মধ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হল, সেটি কিন্তু খুবই সামান্য একটি ঘটনা।

কর্নেল ওয়াটসনের দু'জন বাঙালী ছুতোর মিস্ত্রি একবার কিছু যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র চুরি করে ধরা পড়ে। চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্রেসির কাছে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজের সঙ্গী হিসেবে ক্রেসির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ক্রেসি ঐ দু'জন মিস্ত্রিকে হাত-পা বেঁধে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করেন। কেবল বেত্রাঘাত করেই তাদের তিনি রেহাই দেন নি, দু'দিন একটি গুদামঘরে বন্দীও করে রেখেছিলেন। ক্রেসির এই ব্যবহার নিশ্চয় আইনসঙ্গত হয় নি।

মিস্ত্রি দু'জন ছাড়া পাবার পরেই একজন অ্যাটর্নির কাছে যায়, ক্রেসির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। অ্যাটর্নি তাদের মামলা করতে পরামর্শ দেন, এবং তাদেরই নির্দেশে ক্রেসির কাছে অ্যাটর্নি চিঠি পাঠান। মিস্ত্রিদের অবৈধ ও অন্যায়ভাবে আটক ও বেত্রাঘাত করার জন্য ক্রেসির কাছে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। তাঁকে এ কথাও চিঠিতে জানানো হয় যে ক্ষতিপূরণ না করলে তাঁকে আদালতে যথারীতি অভিযুক্ত করা হবে। ক্রেসি ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক লোক। 'নেটিব'দের সঙ্গে বিবাদের ব্যাপারে আপসের কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। এ ক্ষেত্রে সেই 'নেটিব' আবার মিস্ত্রিশ্রেণীর লোক, কাজেই তাঁর

আত্মাভিমানে আরও বেশি বাধল। তিনি অ্যাটর্নির চিঠি উপেক্ষা করলেন, এবং তার কোন জবাব দেওয়াই প্রয়োজনবোধ করলেন না। অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে দু'জন মিস্ত্রী আদালতে দু'টি মামলা দায়ের করল, প্রত্যেকটি পাঁচহাজার টাকা খেসারত দাবির মামলা।

মামলা শুরু হবার পর ওয়াটসনের বাড়িতে একদিন বৈঠক হল। অ্যাটর্নি অ্যাডভোকেট নিয়োগ করে ক্রেসির পক্ষ কিভাবে সমর্থন করা যায়, বৈঠকে তাই নিয়ে আলোচনা হল। ক্রেসি কিন্তু এই অন্যের ওকালতির ব্যাপারে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তাঁর পক্ষে তিনি নিজেই ওকালতি করবেন, এবং একজন ইংরেজ হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশের রীতি অনুযায়ী দাবি করবেন জুরির বিচার। আমি তাঁকে একজন আইনজ্ঞ হিসেবে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, আমাদের পার্লামেণ্টের আদেশেই এদেশে আদালত স্থাপিত হয়েছে, এবং বিচারকরা নিযুক্ত হয়েছেন। দেওয়ানী মামলায় বিচারকরাই হলেন জুরর। কিন্তু কোন কথায় কর্ণপাত করার মতন মানসিক অবস্থা তখন ক্রেসির ছিল না। তিনি বললেন যে তা হতে পারে না, এ প্রথা ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন-বিরোধী, তিনি প্রাণপণ করে এই অন্যায় রীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

আদালতে মামলা শুরু হ'ল, এবং ক্রেসি ঠিক করলেন তিনি নিজে আদালতে তাঁর পক্ষের বক্তব্য পেশ করবেন। মামলার দিন সকাল আটটার মধ্যে কোর্টে ভিড় জমে গেল। কলকাতার ব্রিটিশ বাসিন্দারা, সিবিল ও মিলিটারী, সকলেই প্রায় কোর্টে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন অসুস্থতার জন্য চীফ জাস্টিস কোর্টে আসতে পারেন নি। সেইজন্য মামলার শুনানি সেদিনকার মতন স্থগিত রাখা হল।

মহরমের দাঙ্গা॥ দিনটা ছিল মুসলমানদের মহরম উৎসবের দিন। মহরমের সময় সর্বশ্রেণীর মুসলমানরা রাস্তায় শোভাযাত্রা করে বেরোয়, এবং ভাঙ (Bang) নামে একরকমের ড্রাগ খেয়ে উন্মত্তের মতন আচরণ করতে থাকে। এরকম উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা আর কোন সময় তাদের মধ্যে দেখা যায় না। শোনা যায়, সেই বছর নবাব সাদৎ আলি কলকাতায় এসেছিলেন, এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সেই কারণে মহরম উৎসবের উন্মত্ততা ঐ বছরে অত্যধিক বেড়েছিল।

মামলার শুনানির দিনে জাস্টিস রবার্ট চেম্বার্স ও হাইড তাঁদের আসনে এসে বসেছেন, এবং কোর্টের কাজকর্ম শুরু করার তোড়-জোড় চলছে, এমন সময় রাস্তায়, একেবারে আদালত গৃহের নিচে, বিরাট একটি জনতার হল্লা শোনা গেল। কাড়া-নাকাড়ার প্রচণ্ড শব্দে কোর্টে কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। জনতার হট্টগোল ও বাজনার শব্দে কোর্টের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল। স্যার রবার্ট নিরুপায় হয়ে আদালতের কনস্টেবলদের হুকুম দিলেন নিচে রাস্তায় গিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। হুকুম জারি করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রূপ নামে একজন বৃদ্ধ জার্মান কনস্টেবল চিৎকার করে দৌড়তে দৌড়তে নিচে থেকে উপরে ছুটে এল। এত ভয় পেয়েছে সে যে তার হাঁপানি আর থামে না। দেখা গেল যে তার মাথার পরচুলোটাও নেই। হাঁপানি একটু থামতে সে বলল যে, নিচে যখন সে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গিয়েছিল তখন তারা তাকে ধরে বেদম প্রহার করেছে, এবং তার টুপি ও পরচুলো কেড়ে নিয়েছে। তার হাতে বিচারালয়ের ন্যায়ের প্রতীকস্বরূপ যে 'দণ্ড'টি ছিল, জনতার ভিতর থেকে দু'জন ব্রিটিশ খালাসী এসে সেটি কেড়ে নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেছে।*

* এদেশী লোকের বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে ব্রিটিশ খালাসীর যোগদান ও এই আচরণ লক্ষণীয়।

জার্মান কনস্টেবলের এই বিবরণ কোর্টের সাহেবরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনলেন, এবং শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

জনতার হট্টগোল ক্রমেই খুব বাড়তে লাগল। কোর্টের আণ্ডার-শেরিফকে আদেশ করা হল জনতাকে হটিয়ে দেবার জন্য। ততক্ষণে আরও কয়েক হাজার লোক এসে জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তার চেহারাও হয়ে উঠেছে মারমুখী। দেখলে মনে হয়, যে-কোন সময় একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। আণ্ডার-শেরিফ হ্যারি স্টার্ক তাঁর শান্তির দণ্ডটি নিয়ে জনতার সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তারা তাঁর দণ্ডটি কেড়ে নিয়ে ভেঙে দিল, এবং তাঁকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে চলে গেল। নবাবের কয়েকজন ভৃত্য তাঁকে চিনত। ভিড়ের ভিতর থেকে দেখতে পেয়ে তারা তাঁকে উদ্ধার না করলে জনতার হাতে আণ্ডার-শেরিফ হয়ত সেদিন মারা পড়তেন।

দেখতে দেখতে জনতা যেন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কোর্টের সামনে যে সব বেয়ারা ও হরকরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উপর হামলা করল জনতা। চারিদিকে যত পালকি ছিল, সেগুলিকেও তারা ভাঙতে আরম্ভ করল। একদল আদালতগৃহ লক্ষ্য করে ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে লাগল। কাচের জানলাগুলি ভেঙে পড়তে লাগল ঝন্‌ঝন্‌ করে। ঘরের মধ্যে পর্যন্ত ইঁটপাথরের টুকরো আসতে লাগল।

এইভাবে আধঘণ্টা কাটবার পর শোনা গেল যে জনতা তলোয়ার নিয়ে আদালতের প্রহরীদের আক্রমণ করেছে, এবং মধ্যের বড় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। খবরটা শোনা মাত্রই উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হল, এবং যে যেদিকে সম্ভব ছুটতে আরম্ভ করল আত্মরক্ষার জন্য। আতঙ্কিত পলাতকদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, প্রাণ বাঁচাবার জন্য

একেবারে ছাদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, স্যার রবার্ট চেম্বার্সের ভাই উইলিয়াম চেম্বার্স আগে থেকেই পালিয়ে বসে আছেন। নেটিবদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর রীতিমত জ্ঞান আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বললেন, "আজকে আর আমাদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। ক্ষিপ্ত জনতা এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজকে ধরে ধরে হত্যা করবে মনে হয়।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমি ব্যাপারস্যাপার দেখে রীতিমত ভয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইংরেজ বলে গর্বিত মিঃ ক্রেসি উইলিয়ামের কথা শুনে বুক ফুলিয়ে বললেন, "ব্যাপার যদি তাই হয়, তা হলে আসুন আমরা ঠিক ইংরেজের মতন আমাদের সৎসাহসের পরিচয় দিই, এবং এইভাবে না পালিয়ে এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। যদি প্রাণই দিতে হয়, তা হলে তা বীরের মতন দেওয়াই ভাল, কাপুরুষের মতন মরে কোন লাভ নেই।" এই কথা বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে আরম্ভ করলেন, এবং তাঁর পিছু পিছু অন্যান্য ইংরেজরাও দৌড়তে লাগলেন।

ক্রেসির এই ব্যবহারে আশ্চর্য ফল হল। সকলে মিলে সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়াতে জনতা পিছু হটতে আরম্ভ করল। এর মধ্যে পুরনো কেল্লা থেকে একদল সৈন্য এসে হাজির হল ঘটনাস্থলে। প্রবলবেগে এক পসলা ইঁটপাটকেল বর্ষণ করে, গোরা সৈন্য দর্শনে, জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছুটতে থাকল। সেনাদলের কমাণ্ডারের কপালে সজোরে একটি ইঁটের টুকরো এসে লাগল, এবং ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল তাঁর কপাল দিয়ে। কমাণ্ডার তাতে আদৌ দমলেন না। খটখট করে তিনি আদালতগৃহের মধ্যে ঢুকে সোজা বিচারকদের কক্ষের দিকে চলে গেলেন। সামনে

গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "আমরা জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করব।"

আমার কাছে বীর ইংরেজপুঙ্গবদের এই অভিনয়টি অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। কারণ ক্রেসি কিভাবে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন তা শোনবার জন্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেদিন বহু ইংরেজ মিলিটারি অফিসার অস্ত্রশস্ত্রসহ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। জনতার হট্টগোলের সময় তাঁদের কাউকেই বীরপুরুষের মতন আচরণ করতে দেখা যায় নি। সাধারণ লোকের মতন তাঁরাও ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছিলেন।

সৈন্যরা আসার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল বটে, কিন্তু একেবারে ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল না, দূরে দূরে ছোট ছোট দল বেঁধে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

দাঙ্গায় আমার পালকিটি খোয়া গেল আরও অনেকের মতন। তিনশো টাকা দামের পালকিটি একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, জোড়াতালি দেবারও কোন উপায় ছিল না। বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনতা রাইটার্স বিল্ডিঙের (Writers' Buildings) বাইরের ফটক, জানলার শার্সি ও বাতিও অনেক ভেঙে ফেলেছিল। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় পথে কোন সাহেব দেখলেই তারা ঢিল ছুঁড়ছিল, এবং ধরে প্রহারও করছিল।

ভারতের ব্রিটিশ রাজধানীতে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, সারা দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়ে যায়। অনেকে বলাবলি করতে থাকেন যে নবাব নিজে এই দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছেন, এবং তাঁর অভিসন্ধি হল ইয়োরোপীয়দের হত্যা করা। গুজব নবাবের কানে পৌঁছতে তিনি তার প্রতিবাদ করে একটি ইস্তেহার জারি করেন, এবং কলকাতা শহরময় তা প্রচুর পরিমাণে বিলি করেন। দাঙ্গার পাণ্ডাদের ধরে দিতে পারলে

পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারি করে দেন এই মর্মে যে মহরম উৎসবের সময় কলকাতা শহরের ভিতরে কোনরকম শোভাযাত্রা করা চলবে না।

জু রি র বি চা র॥ কিছুদিন পরে ক্রেসির মামলা আবার আরম্ভ হল। শুনানির দিন কোর্টে আগের মতনই সাহেবদের ভিড় হল। ক্রেসি আত্মপক্ষ সমর্থনে বেশ ভালই ওকালতি করলেন। ঠিক এতটা তিনি করতে পারবেন এ আমি ভাবি নি। চীফ জাস্টিস অবশ্য তাঁর বিপক্ষেই রায় দিলেন, এবং তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য চারশো সিক্কা টাকা জরিমানা করলেন। অন্য মামলাটির আর আলাদা শুনানি হল না, ঐ একই জরিমানা সাব্যস্ত হল। কিন্তু আপীল করার ন্যায্য অধিকার থাকবে ক্রেসির, এ কথা তাঁর পক্ষের উকিল দাবি করলেন।

এর পরেই ইংরেজদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের আন্দোলন আরম্ভ হল। কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রইল না, বাইরে কোম্পানির অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশে তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজরা চিঠিপত্র লিখে ও টাকাকড়ি পাঠিয়ে তাঁকে ইংলিশম্যানের মর্যাদা রক্ষার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁকে "Wilkes of India" বলে ইংরেজ-সমাজ অভিনন্দন জানালেন। তাঁর আপীলের সমস্ত খরচ সংগ্রহের জন্য সাহেবরা সোৎসাহে চাঁদা আদায় করতে আরম্ভ করলেন। তার জন্য আলাদা একটি কমিটিও গঠিত হল।

কর্নেল ওয়াটসন বিচারকের রায় নিয়েই আপীল করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার তাতে মত ছিল না, কারণ তাতে কোন লাভ

হবে না বলেই আমার ধারণা ছিল। আমার মতন আরও অনেকে এই মত পোষণ করতেন। কিন্তু ওয়াটসন জিদ করলেন যে ব্যাপারটা এমনিতে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। অবশেষে তিনি শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ইংরেজকে ডেকে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন, এবং আলোচনা করে ঠিক হল যে যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতার ইংরেজদের একটি সভা ডেকে এ বিষয়ে কি কর্তব্য তা স্থির করা হবে। বিষয়টি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপন না করে ছাড়া হবে না।

১৭৭৯ জানুয়ারি মাসে এই উদ্দেশ্যে কলকাতার থিয়েটারগৃহে ইংরেজদের বিরাট একটি সভা হল। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে একটি আপীলের প্রস্তাবও গৃহীত হল। আপীলে ভারতে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার অ্যাক্ট সংশোধনের দাবি জানানো হল, এবং প্রস্তাব করা হল যেন ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, এবং সেই বিচার যেন জুরির বিচার হয়।

আবেদনপত্র খসড়া করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। কমিটিতে ছিলেন কর্নেল পীয়ার্স, কর্নেল ওয়াটসন, জন শোর (লর্ড টিগন্‌মাউথ), জন পেট্রি, আলেকজাণ্ডার হিগিনসন, হেনরি কটারেল, জন ইভেলিং, চার্লস পার্লিং, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন ও ব্রুক। প্রত্যেকেই বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং বিষয়টি নিয়ে সকলেই যথাসাধ্য মাথা ঘামাতে লাগলেন। সপ্তাহে চারদিন করে কমিটির বৈঠক বসতে থাকল। বৈঠকে ঠিক হল যে আপীল খসড়া করতে হলে মামলার নথিপত্রগুলি দরকার। তার জন্য চীফ জাস্টিসের কাছে আবেদন জানানো হল, কিন্তু কোন ফল হল না। তিনি কোর্টের

কর্মচারীদের হুকুম দিলেন যেন মামলা সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র কাউকে না দেখানো হয়। তাই হল, দলিলপত্র পাওয়া গেল না।

কমিটির পরবর্তী বৈঠকে কর্নেল ওয়াটসন বিচারকদের দাম্ভিক আচরণের তীব্র সমালোচনা করলেন। প্রসঙ্গত আমার স্বাধীন মনোভাব ও নির্ভীক মতামতের প্রশংসা করে কমিটির কাছে তিনি এই ব্যাপারে আমাকেই অ্যাটর্নি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করলেন। কমিটির সভ্যরা এই প্রস্তাব অবশ্য একবাক্যে সমর্থন করলেন, এবং পত্রের দ্বারা তাঁরা আমাকে জানালেন যে আমিই তাঁদের অ্যাটর্নির কাজ করব। তার পর থেকে কমিটির প্রত্যেক সভার নোটিশ আমি পেতাম, এবং আমাকে সভায় উপস্থিতও থাকতে হত।

অনেক চেষ্টা করে আমি কোর্টের দলিলপত্র দেখার অনুমতি পেলাম। তার জন্য কমিটির কাছে আমার খাতির খুব বেড়ে গেল। কারণ কয়েকটি দলিল না দেখতে পেলে আপীল খসড়া করা কঠিন হত। করলেও তা টিকত কি না সন্দেহ। যাই হোক, আমার কৃতিত্বে সকলেই মুগ্ধ হলেন। একজন প্রস্তাব করে বসলেন যে আপীলসহ আমাকে ইংলণ্ডে পাঠালে কাজটি আরও ভাল হতে পারে। প্রস্তাবটি সময় মতন বিবেচনা করে দেখবেন বলে সকলে আশ্বাস দিলেন।

এই কথা শোনবার পর থেকে আমার মন ক্রমেই ইংলণ্ডমুখী হতে থাকল। স্বদেশের অনেক স্মৃতি বারবার জাগতে থাকল মনে। কিছুদিনের জন্য সব গুটিয়ে ফেলা যায় কি না ভাবতে লাগলাম। লোকজনের কাছে ও বাজারে কত দেনা আছে, এবং মক্কেলদের কাছে পাওনাই বা কত আছে, তার একটা হিসেবপত্তর করতে আরম্ভ করলাম। আমার ইংলণ্ড যাবার মনোবাসনা অবশ্য কারও কাছে আভাসে-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করি নি। সারাক্ষণ পরিশ্রম করে নিজের কাজ করতে থাকলাম, এবং আপীলের ব্যাপারটাও

যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় তার জন্য তৎপর হলাম। বলা বাহুল্য, আপীলের আন্দোলনের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য বিচারকরা কেউ আমার উপর খুশি হন নি। স্যার এলিজা ইম্পে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে বাইরের কোন সভা-সমিতিতে সাক্ষাৎ হলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন, কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। স্যার চেম্বার্স বা হাইড অবশ্য দেখা হলে কথা বলতেন, কিন্তু তাঁরা যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। একদিন চেম্বার্স আমাকে বলেই ফেললেন যে আমি আপীলের ব্যাপারে জড়িত হয়ে বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছি। এতে আমার অ্যাটর্নির পেশারও ক্ষতি হবে বলে তিনি ইঙ্গিত করলেন।

১৭৭৯ ফেব্রুয়ারি মাসে কমিটির আবেদনপত্র খসড়ার কাজ শেষ হল। পত্রে নিবেদন করা হল, যে-অ্যাক্ট অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সংশোধন করা প্রয়োজন, ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় অন্তত যেন ইংরেজদের জুরির দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের সভা ডেকে আপীলের খসড়া মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হল। আপীলের একটা কপি আমার কাছে ছিল, এবং আমি তা এখানে প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু একবার প্রচণ্ড ঝড়ে আমার অনেক জিনিসপত্রের সঙ্গে কপিটিও নষ্ট হয়ে যায়।

আবার সকলে পরম উৎসাহে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন আপীলের খরচ যোগাবার জন্য। অনেক টাকা উঠল। এইবার আমি কর্নেল ওয়াটসনকে আমার ইংলণ্ড যাবার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলাম, এবং বললাম যে বছর দুয়েকের জন্য আপীলের কাজের দায়িত্ব নিয়ে যদি ইংলণ্ড ঘুরে আসি, তা হলে ক্ষতি কি? তিনি বললেন, ক্ষতি অনেক, কয়েক বছরে অ্যাটর্নি হিসেবে আমার যে পসার জমেছে তা নষ্ট হয়ে যাবে, এবং আবার তা জমানো আমার

পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। উঠ্‌তির মুখে এখন আমার বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কর্নেলের কথা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ জেনেও মনটা আমার ইংলণ্ডের জন্যই উন্মুখ হয়ে রইল। ইংলণ্ড যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

ইংলণ্ড যাওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলেছি দেখে ওয়াটসন শেষে কমিটির কাছে আমার ইচ্ছার কথা জানালেন, এবং প্রস্তাব করলেন যে পার্লামেণ্টে আপীল পেশ ও তদারক করার ভার আমার উপরেই দেওয়া হোক। তার জন্য আমার যাতায়াতের খরচ এবং দু'বছরের জন্য বার্ষিক দুশো পাউণ্ড অ্যালাউন্স মঞ্জুর করা হোক। কমিটির সভ্যরা খুশি হয়েই প্রস্তাব পাস করলেন, এবং দুশো পাউণ্ডের বদলে বছরে চারশো পাউণ্ড করে আমার অ্যালাউন্স ঠিক হল।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমার বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখুজ্যেকে ডেকে বললাম, তাঁর হিসেবপত্র বুঝে নিতে। অন্যান্য পাওনাদারদেরও খবর দিলাম। মাসান্তে বাজারের দেনা যথাসাধ্য শোধ করে দিতাম বলে আমার ধারণা ছিল যে দরজি বোধ হয় আমার কাছে হাজার দেড়-দুই টাকা পাবে। কিন্তু হিসেব আসতে দেখলাম, দরজির কাছে দেনা পাঁচহাজার টাকা। বেনিয়ানকে তাগিদ দিয়েও পুরো হিসেব পাওয়া গেল না। যাবার দিন এগিয়ে এল। স্যার চেম্বার্স ও জাস্টিস হাইডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, কিন্তু স্যার এলিজার কাছে যাবার সাহস হল না।

১৫ এপ্রিল, ১৭৭৯ সন্ধ্যায় কলকাতা ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলাম।*

* দু'বছর নয়, চার বছর পরে উইলিয়ম হিকি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন, এবং কিছুদিন মাদ্রাজে থেকে ১৭৮৩ জুন মাসে বাংলাদেশে এসে আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করেন।

৪

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ॥ বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৭৮৩, পয়লা জুলাই থেকে আমি আবার কাজকর্ম শুরু করলাম। আমার পুরনো বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখুজ্যে ঐদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং আমি কোম্পানির অধীনে একজন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান হয়ে ফিরে আসি নি দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমার মতন একজন লোক এই চাকরি চাইলেই পেতে পারে, এই তাঁর ধারণা ছিল।

দুর্গাচরণবাবু আমাকে একটি সুন্দর পালকি কিনে দিলেন, তার সঙ্গে একদল বেয়ারা ও অন্যান্য চাকরবাকরও যোগাড় করে দিলেন। তিনি চলে যাবার পর টল্‌ফ্রে ও অন্যান্য পুরনো বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলেন সকালে। চীফ জাস্টিস স্যার এলিজা ইম্পে কোন সূত্রে আগেই খবর পেয়েছিলেন যে আমি সমুদ্রপথে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা হয়েছি। খবর শুনেই বোধ হয় তিনি কোর্ট থেকে একটি নোটিস কলকাতা শহরের সব বিশিষ্ট স্থানে লট্‌কে দিয়েছিলেন। নোটিসের মর্ম এই :

> যে-সব অ্যাটর্নি কোর্টের তালিকাভুক্ত হয়েও একবছরের বেশি প্র্যাক্‌টিস করছেন না, অথবা অনুপস্থিত আছেন, তাঁরা এই নোটিস জারির চোদ্দ দিনের মধ্যে কোর্টে সশরীরে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করবেন। জবাব যদি তাঁদের যুক্তিসঙ্গত না হয়, অথবা তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হন, তা হলে কোর্টের অ্যাটর্নির তালিকা থেকে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হবে।

বোঝা গেল, আমার উপরেই প্রতিশোধ নেবার জন্য চীফ জাস্টিস এই কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। আমি পার্লামেণ্টে জুরির বিচার দাবি করে আন্দোলন করার জন্য ইংলণ্ড পর্যন্ত যাত্রা করেছিলাম বলে স্যার এলিজা আমার উপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। একটা ব্যক্তিগত আক্রোশের বশেই মনে হয় তিনি অ্যাটর্নিদের সম্বন্ধে এই নোটিস জারি করেছিলেন। কারণ একবছরের বেশি প্র্যাক্টিস করেন নি এরকম অনেক অ্যাটর্নি ছিলেন, কিন্তু আমার মতন কাউকে তার জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি। নোটিস যখন জারি হয়, আমি তখন ট্রিন্‌কোমালয়ে ফরাসীদের বন্দী হয়ে ছিলাম। সুতরাং চোদ্দ দিনের মধ্যে কোর্টে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেইজন্য কোর্টের 'ক্লার্ক' আমার নাম, বিচারকদের আদেশে, অ্যাটর্নির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত বলে আমি সত্যিই খুব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আমার মনোভাব চীফ জাস্টিসকে জানাবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একজন বিচারক হয়েও তিনি যে কত সংকীর্ণচিত্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারেন, সে-কথা চিঠিতে লিখে তাঁকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম। চিঠিখানা লেখা হলে বন্ধু পট্‌কে পড়িয়ে শোনালাম। পট্‌ বলল, চিঠির ভাষা খুবই কড়া হয়েছে, এবং এই চিঠি পড়ে জাস্টিস এলিজা একেবারে ক্ষেপে যাবেন বলে মনে হয়। পট্‌ নিজেই চিঠিখানা হাতে করে নিয়ে যাবে বলল, এবং আমাকে কথা দিল যে ইম্পে যতই ক্রুদ্ধ হন না কেন, সে তাঁকে শান্ত করে ঠিকই কার্যোদ্ধার করে নেবে।

এ লি জা ই ম্পে ॥ পরদিন সকালে পট্‌ আমার বাড়ি এসে একখানি চিঠি দিল আমাকে। চিঠিখানা চীফ জাস্টিসের। পট্‌ বলল, স্যার এলিজা আমার চিঠি পড়ে এত রেগে গিয়েছিলেন যে

তিনি কথাই বলতে পারছিলেন না। অনেক চেষ্টা করে সে তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়েছে ও কথা বার করেছে। অবশেষে, মেজাজ খুশি হবার পর, এই চিঠিখানা তিনি আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন :

উইলিয়ম হিকি

মহাশয়,

কোর্টের কয়েকজন অ্যাটর্নি কিছুদিন আগে আমার কাছে আবেদন করেছিলেন যে তাঁদের কাজকর্ম ক্রমেই কমে যাচ্ছে, এবং তার জন্য অ্যাটর্নির সংখ্যা আরও অনেক কমানো দরকার। এই কারণে, অ্যাটর্নির সংখ্যা কত, এবং তাঁদের মধ্যে সত্যিকার প্র্যাকটিসিং অ্যাটর্নি ক'জন, তার একটা সঠিক ধারণা করার জন্য আমি একটি নোটিস জারি করেছিলাম। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। এই ঘটনা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে অন্য কোন কারণে ইচ্ছা করে কোর্টের অ্যাটর্নির তালিকা থেকে আপনার নাম কেটে দেওয়া হয় নি। আপনি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এখানে অনুপস্থিত ছিলেন যে আপনি স্বেচ্ছায় আপনার পেশা ছেড়ে দিয়েছেন বলে আমাদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আপনি যখন জানিয়েছেন যে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়, অ্যাটর্নির পেশা ছাড়ার কোন ইচ্ছা আপনার নেই, এবং আপনার অজ্ঞাতে ও অনুপস্থিতকালে উক্ত নোটিসটি যখন প্রকাশ করা হয়েছিল, তখন আপনার নাম বাতিল করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই অবস্থায় আপনার নাম বাতিল করা হলে সত্যিই তা অন্যায় হয়। আমার দিক থেকে আমি তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি আবার স্বচ্ছন্দে এই কোর্টের অধীনে অ্যাটর্নির কাজ শুরু করতে পারেন। তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে তা আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে যদি একদিন সাক্ষাৎ করেন তো বলে দিতে পারি।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক,

ই. ইম্পে

স্যার্ এলিজার কাছ থেকে এই চিঠি পাবার পর পট্ একদিন

আমাকে তার গাড়ি করে কোর্টহাউসে নিয়ে গেল। আমি যখন ইয়োরোপে ছিলাম তখন সুপ্রিমকোর্ট পুরনো বাড়ি থেকে এই বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। বাড়িটা হল গঙ্গার ধারে চাঁদপাল ঘাটের কাছে। এই বাড়িতে স্যার এলিজাও সপরিবারে থাকতেন।

আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলিজা হাজির হলেন, এবং আমি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করে তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন জানালেন, কিন্তু মাথা নাড়ালেন কি না, এবং আমার দিকে ফিরে তাকালেন কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না। তাঁর অবস্থা দেখে পট্ বেশ জোরেই হেসে ফেলল। এলিজা এই গম্ভীর পরিবেশে তাকে হাসতে দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং রীতিমত চটে গিয়ে বললেন, "হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটল যার জন্য আপনি এমন বিসদৃশভাবে হেসে উঠলেন?" পট্ চুপ করে রইল, তাঁর কথার কোন উত্তর দিল না, এবং সত্যিই খুব অশোভনভাবে আরও জোরে অট্টহাসি হেসে উঠল। এলিজা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনার এই অকারণ পুলকের ধাক্কা যদি না সামলাতে পারেন, তা হলে দয়া করে আমার ঘর ছেড়ে আপনি চলে যান।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমি এখন সোজা কোর্টে যাচ্ছি, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে কোর্টে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" পট্ তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, "তা হলে দেখবেন স্যার, আমার বন্ধু হিকির উপর যেন সুবিচার করা হয়। আপনি কোর্টে যান, আমি একবার লেডি এলিজার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

আমি স্যার এলিজার পশ্চাদনুসরণ করলাম কোর্ট পর্যন্ত। কোর্টে গিয়ে তাঁর আসনে বসেই তিনি বললেন, "মিঃ উইলিয়ম

হিকি কি কারণে এতদিন কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করতে পারেন নি তা পরিষ্কার করে বলেছেন। বিচারকরা মনে করেন তাঁর নাম অ্যাটর্নির তালিকা থেকে বাদ দেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং তিনি যথারীতি শপথ গ্রহণ করে আবার অ্যাটর্নির কাজ শুরু করতে পারেন।"

কোর্ট থেকে সোজা আমি ফোর্ট উইলিয়মে চলে গেলাম কর্নেল ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করতে। এর মধ্যে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তিনি কিয়ারম্যান নামে এক মহিলাকে ঘটনাচক্রে বিবাহ করে বসেছেন। আগেকার মতন আন্তরিকভাবেই তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন, এবং অমন সুন্দর প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ড চলে যাবার জন্য খুবই দুঃখ করলেন। আর সে রকম কাজকর্ম আমি পাব কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। যাই হোক, তিনি বললেন, "সকলে মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয় আবার আপনার প্র্যাক্‌টিস জমিয়ে ফেলা যাবে। আমি আপনাকে কয়েকজন ধনিক এদেশী মক্কেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আমি নিজেও ধীরে-সুস্থে আমার বর্তমান অ্যাটর্নির কাছ থেকে কাজকর্ম সরিয়ে নিয়ে আপনাকে দিতে পারব। আমার বর্তমান অ্যাটর্নি একজন উঁচুদরের চোর, কেন যে এতদিন তাঁর ফাঁসি হয় নি জানি না। এ রকম ধূর্ত বদমায়েশ লোক আমি দেখি নি বললেই চলে। এই স্কাউনড্রেলটি আবার অন্যান্য অ্যাটর্নিদেরও এইসব শঠতা শিক্ষা দিচ্ছে।"

এই অ্যাটর্নির নাম সলোমন হ্যামিলটন। আমিও তাঁর সম্বন্ধে যা জানি তাতে ওয়াটসনের কথা আদৌ অতিরঞ্জিত বলে মনে হল না। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন তিনি আইরিশ আদালতে প্র্যাক্‌টিস করতেন। পরে এদেশে এসে তিনি অ্যাটর্নি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবসা বেশ ফেঁপে ওঠে, এবং তিনি

এলিজা ইম্পে

(টিলি কেটল অঙ্কিত)

মাদাম গ্র্যাণ্ড

অনেকের অনেক পয়সা নির্বিচারে ঠকিয়ে নিতে আরম্ভ করেন। ওয়াটসন তাঁর সম্বন্ধে যেসব কথা বললেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

কলকাতার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা সকলেই বেশ ভাল আছেন দেখলাম। কেবল শুনলাম আমার বিলেত যাবার বছর দুই পরে ক্লিভল্যাণ্ড মারা গেছেন। কোম্পানির অ্যাটর্নি নর্থ নেলরের স্ত্রীর প্রসবকালে শোচনীয় মৃত্যুর কথাও শুনলাম। এই ঘটনাটির সঙ্গে আমাদের চীফ জাস্টিস স্যার এলিজার বদমেজাজের পরোক্ষ সম্পর্ক আছে বলে এখানে তা বলা দরকার।

একবার গবর্নমেণ্টের সঙ্গে বিচার-বিভাগের কোন একটি নীতিগত বিষয় নিয়ে গুরুতর মতভেদ হয়। কোম্পানির অ্যাটর্নি হিসেবে নেলরের উপর এই অপ্রীতিকর বিরোধ মীমাংসার ভার পড়ে। বিচারকরা কোন একটি মোকদ্দমায় যে রায় দেন, গবর্নমেণ্ট তা অসঙ্গত মনে করে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে নেলর এ কথা উত্থাপন করা মাত্রই চীফ জাস্টিস চটে গিয়ে তাঁকে কোর্টের অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করেন। নেলরকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় বন্দী করা হয়, এবং তিনি সেখানে বেশ পীড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী এই সংবাদ শুনে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েন, এবং প্রসবকালে তাঁর মৃত্যু হয়। অসুস্থ অবস্থায় নেলরের পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা সম্ভব হয় নি। সাতদিনের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু হয়। স্যার এলিজার আক্রোশের শোচনীয় পরিণতি হয় এইভাবে।

এতেও তিনি শান্ত হন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল উইলিয়ম সোয়েনস্টন নামে কোম্পানির এক কর্মচারীর উপর। যে ব্যক্তিকে নিয়ে গবর্নমেণ্টের সঙ্গে বিচারকদের বিরোধ, সে যেখানে বাস করত সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সোয়েনস্টন। সরকারের কর্মচারী হিসেবে তিনি সরকারের আদেশ অনুযায়ী এই 'নেটিব'

লোকটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, এই তাঁর অপরাধ। চীফ জাস্টিস তাঁর উপরেও অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন, এবং নেলরের সঙ্গে তাঁকেও জেলখানায় বন্দী করে রাখেন। তবে তিনি শক্ত লোক, নেলরের মতন দুর্বল নন, অতএব বন্দীজীবনের কয়েকটা দিন তিনি দার্শনিক তত্ত্বকথা চিন্তা করেই কাটিয়ে দিলেন।

কোর্টের লোকজন, অ্যাটর্নি-অ্যাডভোকেট আগে যেমন ছিল তেমনি আছে দেখলাম। কোম্পানির সিনিয়র কাউন্সেল চার্লস নিউম্যান চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন শুনলাম। দীর্ঘদিন কোম্পানির অধীনে কাজ করা সত্ত্বেও যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর মাথার উপর দিয়ে একজন নতুন অ্যাডভোকেট-জেনারেল বহাল করা হল তখন তিনি মর্মাহত হয়ে পদত্যাগ করলেন। এর মধ্যে অবশ্য তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংলণ্ডে ফিরে যাবার সময় জাহাজডুবিতে তিনি মারা যান। কোম্পানির জুনিয়র কাউন্সেল মিঃ লরেন্স—আমি বাংলাদেশে ফেরার কয়েকদিন পরেই—ইহলোক ত্যাগ করেন। এ ছাড়া বাকি সকলেই দেখলাম বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন।

ডুয়েল লড়ার কাহিনী ॥ আমার বন্ধু পট্ ছিল মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে 'রেসিডেন্ট'। এর মধ্যে তার চাকরিটিও গেল। ৮ জুলাই তারিখে সকালে উঠে শুনলাম, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পাশের একটি ছোট ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসলাম। তাঁর নাম ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল কক্স। তিনি বললেন, "আমি মিঃ বেটম্যানের কাছ থেকে আপনাকে একটি কথা জানাতে এসেছি। আপনি যখন ট্রিনকোমালয়ে ছিলেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে আপনি অত্যন্ত জঘন্য কুৎসা রটনা করেছিলেন ফরাসী

মিলিটারি অফিসারদের কাছে—আপনার বিরুদ্ধে এই তাঁর অভিযোগ। আপনি হয় এই আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন, আর তা না হলে মিঃ বেটম্যান আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে এর মীমাংসা করবেন ঠিক করেছেন।" আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, "ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি তাঁর সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কুৎসা রটনা করি নি, যা বলেছি তা সত্যি কথা, এবং এখনও বলতে দ্বিধা নেই আমার।" আমার এই সাফ জবাবের পর ডুয়েল লড়ারই সিদ্ধান্ত হল। ঠিক হল, পরদিন সকালে আলিপুরে 'বেলভেডিয়ার হাউসে'র পেছনে আমরা ডুয়েলের জন্য পিস্তল নিয়ে উপস্থিত হব, এবং আমাদের সঙ্গে একজন করে বন্ধু থাকবেন। ক্যাপ্টেন কক্স থাকবেন বেটম্যানের সঙ্গে।

কক্স বিদায় নেবার পর আমি পটের কাছে গিয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বললাম, এবং তাকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে পরদিন ডুয়েলের স্থানে যেতে। পট্ রাজী হল এবং বলল, "ঠিক আছে বিল, কোন পরোয়া নেই। রাস্কেল বেটম্যানের মাথাটা লক্ষ্য করে একটা গুলি মারলেই কাজ হবে।"

ভৃত্য 'নবাব'॥ এই ৮ জুলাই (১৭৮৩) তারিখটি অনেক কারণে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার মধ্যে একটি কারণ এই ডুয়েলের খবর। অন্য কারণ হল, ঐদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে বারান্দায় বসে সামনে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় অরিয়োল নামে এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে ইংলণ্ড যাবার আগে 'নবাব' নামে একটি ভৃত্য উপহার দিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসেছি জেনে তিনি চিঠিতে লিখেছেন যে এখন যদি ভৃত্যটি আর তাঁর কাজে

না লাগে, তা হলে তাঁকে ফেরত দিলে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন। চিঠি পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি জানতাম, যে-কোন জিনিস (ভৃত্য হলেও) উপহার দিলে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না। অবশ্য অরিয়োল যে অত্যন্ত কৃপণ ও স্বার্থপর লোক তাও আমার অজানা ছিল না। তাঁর পক্ষেই উপহার-দেওয়া জিনিস ফেরত নেওয়া সম্ভব। তা হলেও মানুষ হিসেবে মনের এতখানি দীনতা তাঁর কাছ থেকে আশা করি নি। ভৃত্য হিসেবে 'নবাব' যে আমার একান্ত অনুগত ও প্রিয় ভৃত্য ছিল তা নয়, আমরা তার প্রতি সর্বদাই সদয় ও উদার ব্যবহার করেছি, কিন্তু প্রতিদানে তার কাছ থেকে পেয়েছি অকৃতজ্ঞতা। যাই হোক, তবু আমার ধারণা ছিল, সে বুঝি আমার অনুগত। আমি তাই তাকে ছাড়ব না ঠিক করলাম, যদি অবশ্য সে স্বেচ্ছায় তার পুরনো মনিবের কাছে ফিরে যেতে না চায়।

'নবাব'কে ডেকে পাঠালাম বারান্দায়। 'নবাব' এল, তাকে অরিয়োলের চিঠির কথা সব বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর মনে আছে অরিয়োলের কথা ?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, খুব ভালই মনে আছে।" এবার তাকে বললাম, "গত চার বছর যে তুই আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলি, তোর কি মনে হয় না যে আমি, আমার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন সকলে তোর সঙ্গে সব সময় অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছি ?" সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করেছেন।" একটু আশ্বস্ত হয়ে আমি বললাম, "মিঃ অরিয়োল তোকে ফেরত নিতে চান। তিনি অবশ্য তা নিতে পারেন না, যদি না তুই স্বেচ্ছায় যেতে চাস। আমাদের ছেড়ে তুই কি তোর পুরনো মনিবের কাছে ফিরে যাবি ?" অম্লান বদনে 'নবাব' উত্তর দিল, এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে, "হ্যাঁ, যাব।"

আমার পাশেই পট্ বসে এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রকাণ্ড একটি

ভল্যুম নেড়েচেড়ে কি যেন দেখছিল। হঠাৎ মুখ তুলে 'নবাবে'র উত্তর শুনে সে তার দিকে চাইল। মনে হল রাগে যেন তার সর্বশরীর কাঁপছে। প্রকাণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়াখানা কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে সে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। আমারও এত রাগ হয়েছিল যে তৎক্ষণাৎ তাকে আমি সামনে থেকে চলে যেতে বললাম। এ কথাও তাকে জানিয়ে দিলাম, যে-লোকটি অরিয়োলের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে, ইচ্ছা করলে সে এখনই তার সঙ্গে চলে যেতে পারে।

অরিয়োলের অভদ্র আচরণের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করে আমি তাঁকে একখানি চিঠি লিখে জানালাম যে, ভৃত্যটি ফেরত নেবার তাঁর কোন অধিকার নেই। তবু আমি তাকে ফেরত দিচ্ছি, কারণ এ রকম একজন নিষ্কর্মা চাকর পুষে লাভ নেই। কিন্তু নিষ্কর্মা হলেও, 'নবাব' এখন যখন খ্রীস্টান হয়েছে, তখন মিঃ অরিয়োল আর তার সঙ্গে ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করতে পারবেন না।

বে নি য়া ন দু র্গা চ র ণ মু খু জ্যে ॥ 'নবাব' বিতাড়িত হবার পর আমার প্রাতঃস্মরণীয় বেনিয়ান দুর্গাচরণ মুখুজ্যে সশরীরে এসে হাজির হলেন। আমি বিলেত যাবার আগে টাকার জন্য তাঁকে যে বণ্ড দিয়েছিলাম, তিনি বললেন যে সুদে ও আসলে মিলে তা প্রায় আটহাজার টাকা হয়েছে। টাকাটা তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব ফেরত দিলে তিনি খুশি হবেন। মুখুজ্যে মশায় আর কখনও কোন অ্যাটর্নির কাছে বেনিয়ানের কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন, এবং অন্য একজন বেনিয়ান দেখে নিতে আমাকে অনুরোধ করলেন। মুখুজ্যের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটু ঝাঁজ ছিল মনে হল। আমি জীবনে কখনও কারও উদ্ধত কথাবার্তা সহ্য করি নি, এদেশের

'নেটিবদের' তো নয়ই। বেনিয়ানের কথা শুনে আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। আমি তাঁকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম, আর তা না হলে তৎক্ষণাৎ চাকর ডেকে তাঁকে পদাঘাত করে বার করে দেব বলে শাসালাম। এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি আমার সামনে থেকে প্রস্থান করলেন, এবং সোজা অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে টাকার জন্য আমাকে নোটিস দিলেন। কি আর করব! অত টাকা তখন আমার দেবার সাধ্য ছিল না, বাধ্য হয়ে তাই অন্যের কাছ থেকে ধার করে আমায় টাকা শোধ করতে হল।

ডু য়ে লে র দি ন ॥ এইভাবে ৮ জুলাইয়ের দিনটি কাটল। ৯ জুলাই ভোর হল, বেটম্যানের সঙ্গে ডুয়েল লড়ার দিন। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম শ্রীমতী হিকি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তাঁকে আর জাগালাম না। পট্ ইতিমধ্যে উঠে পোশাক পরে তৈরি হয়ে গেছে। দু'জনে গাড়িতে উঠে সোজা বেলভেডিয়ার অভিমুখে যাত্রা করলাম। প্রায় মাইল তিনেক পথ, ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে বেশি দেরি হল না। আমরা পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেটম্যান ও কক্স এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আসতেই বারো পা করে জমি লড়াইয়ের জন্য মেপে নেওয়া হল। চাকতি ঘুরিয়ে ঠিক করা হল কে আগে পিস্তল ছুঁড়বে। বেটম্যানই প্রথম ফায়ারের সুযোগ পেলেন। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি পিস্তল ছুঁড়লেন, কিন্তু গুলি আমার গায়ে লাগল না। তারপর আমিও ছুঁড়লাম, গুলি বেটম্যানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। উভয়েরই লক্ষ্যভেদ যখন ব্যর্থ হল, তখন বেটম্যান শপথ করে বললেন যে তিনি আমার বা মিসেস হিকির বিরুদ্ধে কারও কাছে কোন নিন্দা করেন নি, এবং কোন বিদ্বেষভাবও আমাদের বিরুদ্ধে তিনি পোষণ করেন না। এ কথা তাঁর মুখ থেকে

শোনার পর আমারও ভুল ধারণা ভেঙে গেল। আমি বললাম যে এতদিন একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি তাঁকে একজন হীনচরিত্রের লোক বলে মনে করেছি। সেজন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। উভয়ের এই স্বীকারোক্তির পর আমাদের ঝগড়া মিটে গেল, এবং ডুয়েলের পর্বও শেষ হল।

১০ তারিখে সুপ্রিম কাউন্সিলের দু'জন সভ্য ম্যাকফার্সন ও স্টেবলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ১২ তারিখে আমার লণ্ডনের হেয়ারড্রেসার ফ্রেস্কিনি এসে উপস্থিত হল। খাওয়া-পরা ছাড়া মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে তাকে কাজে নিযুক্ত করলাম। সম্ভব হলে অন্য মহিলাদেরও কেশপরিচর্যা করে তাকে স্বাধীনভাবে কিছু রোজগারেরও সুযোগ দিলাম।

মাসের বাকি দিনগুলি লোকজনদের অভ্যর্থনা করে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেটে গেল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আমাকে ও মিসেস হিকিকে সঙ্গে নিয়ে পট্ তার ফিটনে করে রেসকোর্সে বেড়াতে যেত। তখনকার দিনে ফ্যাশান ছিল, স্ট্যাণ্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আরোহী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা নানাবিষয় আলাপ-আলোচনা করতেন।

স্যা র উ ই লি য় ম জো ন্স॥ পুরনো বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকে মামলা-মোকদ্দমার জন্য আমার খোঁজ করতে লাগলেন। এদেশী মক্কেলরাই খোঁজ করতেন বেশি। তাঁদের জন্য আমাকে প্রায় রোজই একবার করে শহরে আসতে হত। টলফ্রে তাঁর আফিসের একটি কামরায় আমার হয়ে মক্কেলদের অভ্যর্থনা করতেন। একদিন তিনি আমাকে বেশ খোঁচা দিয়ে বললেন, "ব্যবসা করবেন কলকাতায়, এবং থাকবেন শহরতলীর বাগানবাড়িতে, এইভাবে আর কতদিন চলবে?" তিনি আমাকে কলকাতায় একটি

বাড়ি ভাড়া করে থাকার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিতে থাকলেন। আমিও একটি ভাল বাড়ির খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম। আগস্টের মাঝামাঝি কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে, আদালতগৃহের কাছাকাছি, চমৎকার একটি বাড়ি পেলাম, মাসিক ভাড়া ৩০০৲ টাকা। এই মাসের শেষেই বিলেত থেকে স্যার উইলিয়ম জোন্স ও লেডি জোন্স কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। স্যার উইলিয়ম পরলোকগত জাস্টিস লা মেতরের শূন্যস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মেতর মারা গেছেন ১৭৭৭ সনে, আর জোন্স এসে উপস্থিত হলেন ১৭৮৩ সনের আগস্ট মাসে। রবার্ট চেম্বার্স এই সময় কিছুদিনের জন্য বারাণসী ও উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। জোন্সের আসার কথা ছিল বলে তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যেন তাঁর বাড়িতেই তিনি থাকেন, আলাদা একটি ভাল বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত। জোন্স তাই করলেন, কলকাতায় পৌঁছে চেম্বার্সের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পরদিন সকালে স্যার এলিজা ইম্পে কোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকের কাছে একটি সার্কুলার পাঠালেন। সকলকে ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করে জানানো হল যে তাঁরা পরদিন সকালে চীফ জাস্টিসের বাড়িতে আসবেন এবং ব্রেকফাস্ট খেয়ে একসঙ্গে কোর্টে যাবেন। সেখানে তাঁদের উইলিয়ম জোন্সের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, এবং তারপর নতুন বিচারক তাঁর শপথ গ্রহণ করবেন। অ্যাডভোকেট, অ্যাটর্নি ও কোর্টের অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, কেবল আমি ছাড়া। আমি এলিজার বাড়িতে চা-কফি খেতে যাই নি, তার কারণ আগে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তাতে আর আমার যাওয়ার প্রবৃত্তি হয় নি। আমি অবশ্য রাস্তা থেকে শোভাযাত্রায় যোগ

দিয়েছিলাম, এবং উইলিয়মের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়েরও সুযোগ পেয়েছিলাম। পরিচয়ের সময় জোন্স আমার নাম শুনে মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় হ্যারোতে আমার সহপাঠী ছিলেন?" আমি বললাম, "না আমি নই, আমার দুই দাদা আপনার সঙ্গে হ্যারোতে পড়তেন।"

নতুন বিচারকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর আমার বন্ধু মর্স তার দুই বোনের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য নিয়ে গেল। আগেই তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ইংলণ্ডে। দুই বোনই বিবাহিতা। একজনের বিবাহ হয়েছিল মিড্‌লটন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। হেস্টিংসের বিচারের সময় ইনি সাক্ষী দিতে গিয়ে এমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দেন যে সাধারণ লোকের কাছে তাঁর নাম হয়ে যায় 'Memory Middleton.' অর্থাৎ যা তিনি বলেন তাই ভুল হয়, এবং বলবার সময় কোন কথাই তাঁর মনে পড়ে না। মর্স ১৭৮১ সনে একটি সেনাদলে পে-মাস্টারের চাকরি নিয়ে ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে যান। তখনকার দিনে সেনাদলে এই পে-মাস্টারের চাকরি সকলের কাছেই খুব লোভনীয় ছিল, কারণ এতে উপরি আয় ছিল অনেক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেনাদলের সঙ্গে যাবার সময় পথে কমাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর কোন কারণে বিবাদ হয়। তার ফলে তিনি তাঁর চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। অবশেষে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে আবার ওকালতি ব্যবসায়ে যোগ দেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে হেনরি ডেভিস নামে এক ভদ্রলোক অ্যাডভোকেট হয়ে আসেন। আইনবিদ্যায় মর্স তাঁর চেয়ে বেশি পণ্ডিত হলেও, ডেভিস প্রত্যুৎপন্নমতি ও সুবক্তা ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেজন্য তাঁর প্র্যাক্‌টিস জমে যায়। মর্সের অনেক মক্কেল তিনি হাত করে

ফেলেন। তাতে মর্সের আর্থিক ক্ষতি তো হয়ই, আত্মসম্মানেও আঘাত লাগে। শোনা যায়, বিচারকরা তাঁকে কিছুদিনের মধ্যে শেরিফ করে দেবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রস্তাব শুনে তিনি আমাকে বলেন, "আমি যদি শেরিফের পদ গ্রহণ করিতে রাজী হই, আপনি তা হলে কি আণ্ডার-শেরিফ হতে রাজী আছেন ?"

এদিকে ডেভিস অল্পদিনের মধ্যে কোর্টে বেশ নাম করে ফেললেন। একটি মামলা পরিচালনা করে তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। গবর্নমেণ্ট এইসময় এমন একটি আইন পাস করার চেষ্টা করছিলেন যাতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীমহলের বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। ব্যবসায়ীরা তাই যাতে আইনটি পাস না হয় তার জন্য আদালতে লড়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন ডেভিস। তাঁর চমৎকার ওকালতির জন্য মামলায় ব্যবসায়ীরাই জয়ী হন, গবর্নমেণ্ট হেরে যান। তারপর থেকে ডেভিসের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তিনিই গবর্নমেণ্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদে এমন যোগ্যতার সঙ্গে তিনি কাজ করেন যে কোম্পানির ডিরেক্টররা খুশি হয়ে তাঁকে বেতন ও অ্যালাউন্স ছাড়া একেবারে থোক তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

এইসময় বিলেত থেকে একখানি জাহাজ এসে পৌঁছয় কলকাতায়, এবং চারিদিকে রটে যায় যে স্যার এলিজা ইম্পে শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে ডিরেক্টরদের কয়েকটি গুরুতর অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য। গুজব সত্য হয়, জানুয়ারি মাসে (১৭৮৪) এলিজা ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

সাহেবদের একটি উৎসব॥ নতুন যে বাড়ি ভাড়া করলাম কলকাতায় তা সাজাতে প্রায় বারো হাজার টাকার আসবাব লাগল। ঘর সাজানোর ভার পড়ল আমার স্ত্রী শার্লতের উপর। ১৭৮৩, সেপ্টেম্বর মাসে আমরা নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। এবারে একদিন ঘর-গোছানি উৎসবের (হিকি 'Setting up ceremony' বলে উল্লেখ করেছেন) ঝামেলা পোয়াতে হবে বলে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলাম। কলকাতার সাহেব-সমাজে এই উৎসবটি যে কোথা থেকে আমদানি হয়েছিল তা জানি না। সাহেবদের বিবিরা এসে যখন সংসার পেতে বসতেন তখন এই উৎসব তাঁদের করতে হত শহরের অন্যান্য বিবিদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। উৎসবের সমারোহ ও আয়োজনটি বেশ উপভোগ্য। উৎসবের দিন গৃহকর্ত্রী বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত ঘরে একটি চেয়ারের উপর সেজেগুজে বসে থাকেন, তাঁর দু'পাশে থাকেন দু'জন বান্ধবী সখির মতন। তিনজন ভদ্রলোক সর্বদা মোতায়েন থাকেন দরজার কাছে শহরের মহিলাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। তিনজন থাকেন কারণ প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে দু'জন করে ভদ্রলোক আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে প্রথমে আগন্তুক মহিলার হাত ধরে আপ্যায়ন করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসেন, বাকি দু'জন তাঁর সঙ্গী দুই ভদ্রলোককে সামলান। মহিলাকে ভিতরে এনে গৃহকর্ত্রীর সামনে নিয়ে গিয়ে নাম বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তিনি কিছুক্ষণ সমবেত মহিলাদের মধ্যে গিয়ে বসেন, এবং মিনিট পাঁচ-দশ পরে উঠে এসে গৃহকর্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেন। এইভাবে একজনের পর একজন আসেন ও চলে যান। এই আসা-যাওয়ার ব্যাপার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত চলতে থাকে। আমার পর্ব অবশ্য

একরাতেই শেষ হল না, পর পর আরও দু'রাত ধরে চলল। লৌকিকতার ব্যাপার যদি এখানেই শেষ হত, তা হলেও ভাল ছিল। কিন্তু তা হবার উপায় ছিল না। যে-সব মহিলা গৃহোৎসবে আসতেন, পালা করে তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে সস্ত্রীক অন্তত একবার যেতে হত।

কলকাতা শহরে ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা যত বাড়তে থাকল, তত এই গৃহোৎসবের উৎসাহও কমতে আরম্ভ করল। ১৭৮৬ সনের পর থেকে এই উৎসব কলকাতা শহরে আর কেউ করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তার পর থেকে শহরে নতুন সংসার পাতলে কেবল নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়েই উৎসব করা হত।

সাংবাদিক হিকি॥ এর পর হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম আমার সেই পুরনো মক্কেল জেম্‌স অগস্টস হিকির কাছ থেকে। চিঠির উপরে দেখলাম ঠিকানা কলকাতার সেই জেলখানা। আশ্চর্য! ভদ্রলোকের কারাবাসে যেন ক্লান্তি নেই। আমি ফিরে এসেছি জেনে তিনি আবার আমাকে তাঁর সঙ্গে একবার জেলখানায় দেখা করার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন। এ রকম অনুরোধ, এবং এই ধরনের বিচিত্র লোকের কাছ থেকে, রক্ষা না করে পারা যায় না। একদিন আমি জেলখানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই জেম্‌স হিকির মনের মধ্যে যার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ জমা হয়ে ছিল, অকথ্য ও অভদ্র ভাষার ভিতর দিয়ে সেগুলি অনর্গল বন্যার বেগে বেরুতে লাগল। অভিযোগের তাঁর অন্ত নেই। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, তাঁর গেজেটের পৃষ্ঠায় তিনি সাহস করে সত্য কথা বলেন বলে সকলে তাঁকে, বিশেষ করে ক্ষমতাবানেরা, অন্যায়ভাবে নির্যাতন করেন।

হিকি তাঁর সুদীর্ঘ অভিযোগ সম্বন্ধে ভাষণ শুরু করলেন এইভাবে: "বুঝলেন হিকি সাহেব, আমার কয়েকজন শত্রু কেবল নিজেদের জঘন্য প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমাকে অন্যায়ভাবে জেলখানায় আটক করে রেখেছেন। এই শত্রুদের নেতৃস্থানীয় হলেন দু'জন, গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার এলিজা ইম্পে। যেমন লাট-সাহেব একজন অপদার্থ জীব, তেমনি অপদার্থ তাঁর জজ।" এইটুকু প্রস্তাবনা করে জেমস হিকি বলতে লাগলেন, "এই দু'জন স্বেচ্ছাচারী শাসক ও বিচারক ন্যায়সঙ্গত আইনের দিক থেকে প্রকাশ্য আদালতের বিচারে আমাকে কিছুতেই জব্দ করতে পারছেন না দেখে, অবশেষে আমার বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত হীন ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসলেন। প্রথমে তাঁরা কলকাতার প্রধান শেরিফকে এই উদ্দেশ্যে হাত করলেন। উদ্দেশ্য হল শেরিফকে দিয়ে এমন বারোজন ইংরেজকে জুরি হিসেবে তিনি ঠিক করবেন, যাঁরা ন্যায়বিচারের কথা ভুলে গিয়ে তাঁরই নির্দেশ পালন করবেন। অর্থাৎ আমাকে বেশ কঠোর শাস্তি দিয়ে সায়েস্তা করবেন। তা হলে হেস্টিংস ও ইম্পের আনন্দের আর সীমা থাকবে না।"

আসল ঘটনাটি এই। হিকি তাঁর পত্রিকায় হেস্টিংসের চরিত্র ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এমন সব কথা এমন কুৎসিত ভাষায় লিখছিলেন যে শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। প্রথম মামলা আরম্ভ হলে জুরিদের মধ্যে দু'জন হিকিকে নিরপরাধ বলে রায় দেন। পরে বারোজনই একঘরে বসে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা আলোচনার পর হিকিকে 'not guilty' বলে রায় দেন। রায় শুনে চীফ জাস্টিস ইম্পে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেন যে এ রকম একটি অন্যায় রায় তিনি কোর্টে দলিলগত করে রাখতে অনিচ্ছুক।

সেইজন্য বিষয়টি ভাল করে পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি আবার জুরিদের অনুরোধ করেন। এই কথা শোনার পর জুরিদের মধ্যে টমাস লায়ন (বিখ্যাত আর্কিটেক্ট) সাহস করে বলেন, "জুরির নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন হয়েই তিনি এই রায় দিয়েছেন, এবং কোন কারণেই তা তিনি পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেন না।" ইম্পের আদেশ অনুযায়ী জুরিরা অবশ্য কয়েক মিনিটের জন্য ঘরে গিয়ে বসলেন, কিন্তু ফিরে এসে ঐ একই রায় দিলেন। এবারে ইম্পে আর তা গ্রহণ না করে পারলেন না। হিকির জয় হল। ইম্পে হুকুম দিলেন, দ্বিতীয় মামলার জন্য নতুন জুরি নির্বাচন করতে। কিন্তু দ্বিতীয়বারও একজন নির্ভীক ব্যক্তির জন্য (জুরিদের মধ্যে) হিকি নিরপরাধ বলে ছাড়া পেলেন। তৃতীয় মামলাতেও তাই হল।

হিকি বারবার তিনবার এইভাবে মামলায় জয়ী হলেন দেখে পরবর্তী সেসন্সে শেরিফকে দিয়ে বারোজন গবর্নমেণ্টের জো-হুকুম ব্যক্তিদের জুরির জন্য সাবধানে বাছাই করে নেওয়া হল। তিনটি মামলাতেই তাঁরা হিকিকে অপরাধী বলে রায় দিলেন। চীফ জাস্টিস প্রত্যেক মামলার জন্য হিকিকে ছ'মাস করে মোট আঠারো মাস কারাদণ্ড দিলেন এবং তিনহাজার টাকা করে মোট ন'হাজার টাকা জরিমানা করলেন। কারাবাসের নির্দিষ্টকাল উত্রে গেলেও, জরিমানা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে বলে স্যার এলিজা জানিয়ে দিলেন।

হিকি বলতে লাগলেন, "আমার স্বাদেশিকতা ও সমাজবোধের জন্য এইভাবে আমি আজ এই জঘন্য জেলখানায় বন্দী হয়ে আছি। দেখেশুনে মনে হয় না যে এই পৃথিবীতে কর্তব্যবোধ বলে কিছু আছে। কয়েকজন ব্রিটন (মুষ্টিমেয় কয়েকজন), এখনও যাঁরা ন্যায়বিচারবোধ জলাঞ্জলি দেন নি, আমার দুঃখভোগে কাতর হয়ে

তাঁরা আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ঠিক করেন, কলকাতা শহরে ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের একটি সভা ডেকে আমাকে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন, সকলে মিলে চাঁদা করে আমার জরিমানা ও ক্রাউন ক্লার্কের ফী দিয়ে দেবেন, এবং যতদিন না আমি মুক্তি পেয়ে আবার স্বাধীনভাবে আমার পত্রিকা প্রকাশ করতে পারি ততদিন আমার ব্যয়ভার বহন করবেন। এই উদ্দেশ্যে সভা ডাকা হল, প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হল, কিন্তু সভাস্থ মাত্র পাঁচজন লোক ভয় পেয়ে গিয়ে প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। তাঁরা বললেন যে গবর্নর-জেনারেল ও চীফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে তাঁরা এ রকম কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে রাজী নন, এবং কারও রাজী হওয়া উচিত বলেও মনে করেন না। এই ধরনের আপত্তি ওঠার পর প্রস্তাবটি চাপা পড়ে যায়। তারপর প্রায় দু'বছর হল আমি এই জেলখানায় বন্দী হয়ে আছি। আমার কোন সহায় বা সম্বল বলে কিছু নেই। জরিমানা আমার পক্ষে কোনদিনই দেওয়া সম্ভব হবে না। অতএব জীবনের বাকি দিনগুলিও এই শোচনীয় অবস্থায় আমাকে জেল-খানাতেই কাটাতে হবে মনে হয়। আমি যে আর জীবদ্দশায় মুক্তি পাব, এবং স্বাধীনভাবে কোনদিন আমার পত্রিকা প্রকাশ করতে বা কোন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারব, তা আশা করি না।"

আমি আগেই বলেছি, হিকি একজন প্রতিভাবান লোক। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাঁর প্রতিভা তিনি বিশেষ কাজে লাগাতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর মেজাজও ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। তিনি প্রায় কথায় কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, বিশেষ করে তাঁর কোন কাজকর্মে বা পরিকল্পনায় কেউ বাধা দিলে তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর বিচারের সময় তিনি নিজেই যেভাবে সাক্ষীদের জেরা করেছিলেন, তা একজন

বিচক্ষণ উকিলের দ্বারাই করা সম্ভব। জুরিদেরও সোজা প্রশ্ন করে তিনি এমনভাবে কোর্টের সামনে তাঁদের কয়েকজনের মিথ্যা নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন যে তাঁদের আর মুখ দেখানোর উপায় ছিল না। একজনকে তিনি হেস্টিংসের বন্ধু ও উমেদার বলে প্রমাণ করেছিলেন; আর-একজনকে স্যার এলিজার অনুগত বলে জুরির পদ থেকে তাঁর অপসারণ দাবি করেছিলেন; তৃতীয় একজনকে ঘুষখোর বলে এমনভাবে অপমান করেছিলেন যে সকলের সামনে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল; চতুর্থ একজনকে তিনি সরকারের বড় চাকুরে বলে জুরি হবার অযোগ্য বলে দাবি করেছিলেন। জন রাইডার নামে একজন জুরি সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্য আদালতে নির্ভয়ে বলেছিলেন, "ঐ ভদ্রলোকও যখন জুরিতে বসেছেন তখন আমার আর বিচারের প্রয়োজন কি? বিচার প্রহসন মাত্র। কারণ আমি জানি ঐ ভদ্রলোক আমাদের চীফ জাস্টিসের (স্যার এলিজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) একজন অন্ধ ভক্ত ও মোসাহেব বিশেষ। এলিজা ওঁকে যা বলবেন, উনি তারই পুনরাবৃত্তি করবেন। সুতরাং বিচারের আগেই আমি নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করতে রাজী আছি। মিঃ রাইডারের বিবেক বলে কিছু আছে কি না সন্দেহ। এ রকম একজন দুর্নীতিপরায়ণ জঘন্য চরিত্রের লোক কদাচিৎ সমাজে দেখা যায়। মিঃ রাইডার কেবল স্যার এলিজার মোসাহেব নন, লেডি এলিজারও বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। সারাদিন তিনি কলকাতা শহরের ভাল ভাল দোকানে ঘুরে বেড়ান লেডি এলিজার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে।"

এই কথা শুনে কোর্টের সমস্ত লোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর হিকি এমন বেয়াদবের মতন কথাটা বলে ফেললেন যে স্যার এলিজাও কোন জবাব দিতে পারলেন না।

৫
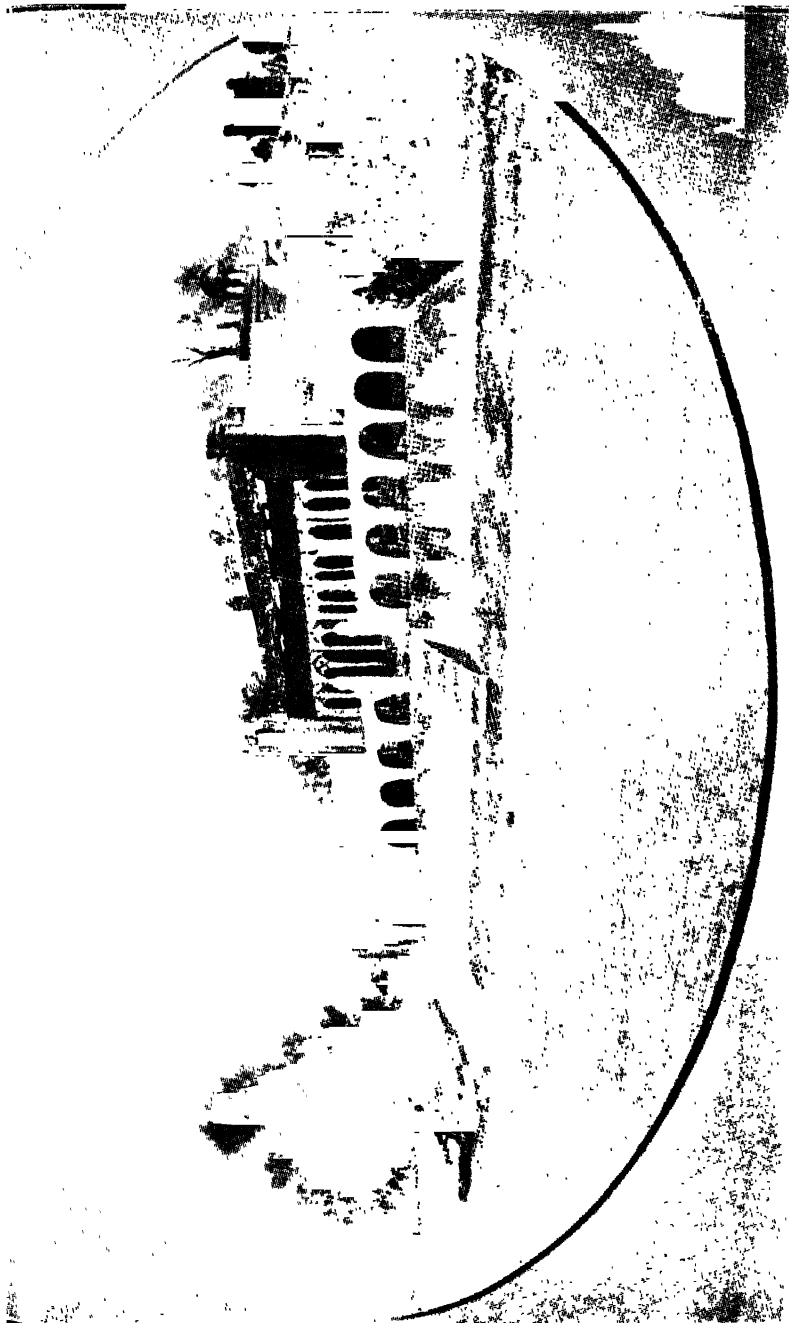
বাসা-খরচ॥ কলকাতায় বাসা করে থিতিয়ে বসার অল্পদিনের মধ্যেই আবার আগেকার মতন আমার প্র্যাক্‌টিশ জমে উঠল। আমার মক্কেলরা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে খুব খুশি হতেন, এমন কি বিপরীত পক্ষের লোকেরাও আমার উদারতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমি সবসময় আমার অধীন কর্মচারীদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতাম, কখনও তাদের অসম্মান করতাম না, অথচ মেলা-মেশার ব্যাপারে একটা পার্থক্য বজায় রেখে চলতাম। এই কারণে কোন স্তরের লোকের কাছেই আমি কোনদিন অপ্রিয় হই নি।

কলকাতায় বাসা করার পর মিসেস হিকি ও আমার জন্য দু'খানা গাড়ি কিনতে হল। মিসেস হিকির জন্য কিনলাম লণ্ডনে তৈরি চ্যারিয়ট গাড়ি, তিনহাজার সিক্কা টাকা দিয়ে। আমার জন্য কিনলাম একটি ফিটন গাড়ি, আঠারশ টাকা দিয়ে। তিনটি ঘোড়া কিনলাম ১৭৫০৲ টাকা দামে। তখনকার দিনে ভাল জাত-ঘোড়ার এরকমই দাম ছিল। এইসব জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে আমাকে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা খরচ করতে হল। তার জন্য আমাকে বছরে শতকরা ১২৲ টাকা করে সুদ দিতে হত। প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমাকে এই ঋণের বোঝা বহন করতে হয়েছে।

লর্ডের ছেলে॥ সেপ্টেম্বর মাসে তেরো বছরের ছেলে অনরেবল ফ্রেডারিক ফিৎসরয় কলকাতায় এসে পৌঁছল। লর্ড সাউদাম্পটনের ছেলে, তাই 'অনরেবল' বললাম। বিরাট পরিবার নিয়ে লর্ড শেষ-দিকে বেশ একটু আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে পড়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর কিশোর পুত্রকে কোম্পানির সামান্য 'রাইটার' করে বাংলাদেশে পাঠাতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। ছেলেটি খুব চঞ্চল ও হাল্‌কাপ্রকৃতির ছিল বলে আমার নিজের খুব ভাল লাগত, কারণ কিশোর বয়সে আমিও তাই ছিলাম। আমি তাকে আমার বাড়ির ভোজসভায় প্রায়ই নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু কিছুদিন আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝলাম যে, বাইরে থেকে তাকে যেরকম মনে হত আসলে তা সে নয়। ছেলেমানুষির মুখোশ পরে যে-কোন কুকর্ম তার পক্ষে করা সম্ভব। ছেলেটির এই পরিচয় পাবার পর থেকে আমি আর তাকে খুব বেশি পাত্তা দিতাম না বাড়িতে। শুনলাম তার মধ্যে কিছু পাগলামিরও লক্ষণ ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তার মার কাছ থেকে সে এই উপসর্গটি পেয়েছিল। এই পাগলামির একটি ছোট্ট ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি।

এক ভদ্রলোক কলকাতায় পৌঁছে মেকলে নামে এক ব্যক্তির খোঁজ করতে ফিৎসরয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিঙের কোয়ার্টারে তখন এঁরা সকলে একটি করে ঘর নিয়ে থাকতেন। মেকলে তখন বাসায় ছিলেন না। ভদ্রলোক ফিৎসরয়কে জিজ্ঞাসা করতে সে বলে, "মেকলে তো অনেক আছে, আপনি কোন্‌ মেকলেকে চান?" ভদ্রলোক বলেন, "এতজন মেকলে আছেন তা আমি জানতাম না, আমার বন্ধু একজন স্কচ্‌ম্যান।" সে বলে, "ঐ পরিচয় দিলে কি আর মেকলেকে খুঁজে পাওয়া যায়? তবে আসুন, দেখা যাক্‌ কোন একটা উপায় খুঁজে বার করা যায় কি না! আপনি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?" তিনি

উত্তর দিলেন, "তা নিশ্চয় পারব।" "তবে এক কাজ করুন, বাড়ির সামনে রাস্তায় চলে যান, সেখানে দাঁড়িয়ে 'ম্যাক' 'ম্যাক' করে ডাক দিন। ডাক শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনেকেই রাস্তার দিকে চেয়ে দেখবে, তখন আপনি আপনার মেকলেকে দেখে ফেলবেন।" এই কথা বলে ফিৎসরয় চলে গেল। ভদ্রলোক নিশ্চয় বুঝলেন যে পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

কলকাতায় বাসা করার কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রী শার্লতের দ্রুত শরীর খারাপ হতে লাগল। ডাক্তার-বৈদ্য দেখিয়েও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল করা সম্ভব হল না। তার কারণ, বাইরের সামাজিক লৌকিকতা রক্ষা করার জন্য তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হত যে ডাক্তারের কোন উপদেশই তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব হত না। পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা অনবরত চিঠিপত্র লিখে আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন ও প্রতিদানে নিমন্ত্রিত হতে চাইতেন। উপহার-উপঢৌকনও তাঁদের কাছ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় আসতে আরম্ভ করল। অতএব প্রতি-উপহারেরও ঝক্কি বাড়ল অনেক। সব ঝক্কিটাই প্রায় শার্লতেকে একলাই সামলাতে হত। মধ্যে মধ্যে বন্ধুপত্নীরা বাড়ি চড়াও করে তাঁকে বাজারে কেনাকাটা করার জন্য ধরে নিয়ে যেতেন। অসুস্থ শরীরে এত ঝঞ্ঝাট ও উপদ্রব তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। স্বাস্থ্যও তাঁর ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল।

চী না বা জা রে র ক থা ॥ শ্রীমতীর একদিনের বাজার করার অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে আছে। জনৈকা বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তিনি একদিন কলকাতার চীনাবাজারে বাজার করতে গিয়েছিলেন। চীনাবাজারে তখন বাঙালীদের অনেক দোকান ছিল, বাজারে গিয়ে তাঁর সঙ্গিনী একটির পর একটি দোকান ঘুরে জিনিসপত্র একেবারে

তছনছ করে ফেললেন, কিন্তু একটি পয়সারও জিনিস কিছু কিনলেন না। দোকানদাররা অত্যন্ত বিরক্ত হল, শার্লতেও আদৌ খুশি হন নি। অবশেষে দোকানদারদের কাছে সম্মান বাঁচাবার জন্য শার্লতে কয়েকটি বিলিতী রিবন কেনেন। ব্যাপারটা আমি কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, যখন ব্যবসায়ী গোপী দে'র তরফ থেকে অ্যাটর্নি হ্যামিলটন চিঠি লিখে জানালেন যে, দু' টুকরো রিবনের জন্য তাঁর ক্লায়েন্টের ৩২৲ সিক্কা টাকা অবিলম্বে আমাকে দিতে হবে, আরও পাঁচ টাকা তাঁর চিঠির খরচসহ। তা না দিলে সুপ্রিমকোর্টে ঐ টাকার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

চিঠি পেয়ে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সামান্য টাকার জন্য একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ীর এই উকিলের চিঠি লেখার ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। পাওনা টাকার সঙ্গে আমি অ্যাটর্নিকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাঁর চিঠির একটি জবাবও পাঠিয়ে দিলাম। হ্যামিলটনের চিঠিখানি আমি কোর্টের জজ, অ্যাডভোকেট ও অন্যান্য অফিসারদের সকলকে দেখালাম। সকলেই তাঁর চিঠির খুব নিন্দা করলেন, এবং স্বীকার করলেন যে এরকম চিঠি লেখা গোপী দে ও তাঁর অ্যাটর্নির পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে। হ্যামিলটন অবশ্য পরে খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারি নি। অ্যাটর্নি হিসেবে হ্যামিলটন কর্নেল ওয়াটসনের খুব প্রিয় ছিলেন। তা হলেও আমি সবসময় এর পর থেকে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম।

যাই হোক, ইতিমধ্যে শার্লতের ক্রমেই স্বাস্থ্যহানি হতে লাগল, এবং বোঝা গেল অসুখ বেশ জটিল হয়ে উঠছে। ১৭৮৩ সনে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর আমি পূর্বের জুরি-কমিটির কাছে আমার কিছু পাওনা টাকার জন্য চিঠি লিখলাম। বিলেতে কমিটির তরফ থেকে আবেদনপত্রটি পার্লামেণ্টে পেশ করে তদারক করে

আমি নিজে বেশ কিছু টাকা খরচ করেছিলাম। কর্নেল ওয়াটসন আমার দাবি সমর্থন করেন, কিন্তু কর্নেল পীয়ার্স, মিঃ শোর ও অন্যান্য সকলে সমর্থন করেন নি। ব্যক্তিগত কারণে নয়, অন্য কারণে।

আমাকে বাধ্য হয়ে তাই সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করতে হল। আবেদন করার আগে আমি আমার কাউন্সেলকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। ইংলণ্ড যাবার দু'মাস আগে থেকে কিভাবে কমিটিকে সাহায্য করেছি, ইংলণ্ডে গিয়ে কিভাবে আমি রেকর্ড-কীপার ও কোর্টের অন্যান্য কর্মচারীদের খরচ যুগিয়েছি, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহ করার জন্য, এবং কিভাবে আবেদনটি পার্লামেণ্টে যথাযথভাবে উত্থাপন ও পরিচালনা করার জন্য নিজে মেহনত করেছি, সেসব কথা তাঁকে গুছিয়ে বললাম। যে টাকা আমি কমিটির কাছে চেয়েছি, খুঁটিয়ে দাবি করলে তার চেয়ে অনেক বেশি চাইতে পারি। বিবরণ শুনে কাউন্সেলও তাই বললেন। অতএব আমার খরচপত্রের ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের একটি বিস্তারিত বিল তৈরি করে আমি সুপ্রিমকোর্টে ফাইল করে দিলাম। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। শুভাকাঙ্ক্ষীরাও তাই পরামর্শ দিলেন। জুরি-কমিটির বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে আমাকে মামলা করতে হল। কিছুদিন পরে সালিশী নিযুক্ত করে আমার মামলার নিষ্পত্তি করা হল, কমিটির কাছ থেকে তিন হাজার সিক্কা টাকা আমি পেলাম।

স্ত্রী বি য়ো গ ॥ এদিকে আমার স্ত্রী শার্লতের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কিছুদিন তাঁকে নিয়ে নদীর বুকে বেড়াতে, যদি হাওয়া বদলের ফলে কোন উপকার হয়। বেশ বড় একটি নৌকা তার জন্য ভাড়া করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলাম। ৭ ডিসেম্বর নৌকা করে বেরিয়ে পড়লাম

বজবজের দিকে। সেখানে আমার এক বন্ধু থাকতেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দিনটা বেশ ভালই কাটল, শার্লতের স্বাস্থ্যেরও যেন একটু উন্নতি হল বলে মনে হল। কিন্তু তার পরের দিন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের এত দ্রুত অবনতি হতে থাকল যে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পাঁচদিনের দিন সকালে তাঁকে নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় ফিরে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডঃ স্টার্ক বললেন যে তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা খুব কম বলে তিনি মনে করেন। বাস্তবিক তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে ক্রীসমাসের দিন এল, ২৫ ডিসেম্বর। সকালে উঠে শার্লতে একবার ম্লান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। কথা বলার আর শক্তি নেই তখন। ক্ষীণ স্বরে আমাকে কাছে ডাকলেন। হাত তোলার আর ক্ষমতা নেই। তবু কম্পমান হাত দু'টি তুলে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, মুখটি মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করে কানে-কানে বললেন, "দুঃখ করো না, ঈশ্বরের কথা চিন্তা করো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখো, শান্তি পাবে।" তার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার বললেন, শার্লতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একমুহূর্তের মধ্যে আমার চারিদিকের সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে যেন আলো নিভে গেল। মর্মান্তিক বিচ্ছেদ-বেদনার অগাধ অন্ধকারে আমি তলিয়ে গেলাম। কোন সান্ত্বনাই ভাল লাগছিল না। চেনা ঘরবাড়ি, চেনা মুখ, চেনা পরিবেশ, সবই আরও তীব্রভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আমার শার্লতেকে। টলফ্রে, মস ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা সকলে আমাকে কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে বললেন।

আমার বন্ধু রবার্ট পট্‌ তখন বর্ধমানে ছিল। সে আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখল। তার

পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলে আমার মনের ভার কিছুটা কমতে পারে ভেবে ৩০ ডিসেম্বর বর্ধমান যাত্রা করলাম। পরদিন সকালে বর্ধমান পৌঁছলাম ব্রেকফাস্টের সময়। পট্ আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। নানা কাজ ও নানা পরিবেশের ভিতর দিয়ে সে আমার সর্বক্ষণের একমুখী চিন্তাকে ভিন্নমুখী করবার ব্যবস্থা করল। বর্ধমান থেকে দূরে নানা জায়গায় আমরা বেড়াতে যেতাম। নানারকমের লোকজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতাম। বর্ধমান টাউন থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে পট্ শিকার করার জন্য চমৎকার একটি বাংলো তৈরি করেছিল। তার সঙ্গে প্রায়ই যেতে হত সেখানে। শিকারেও সঙ্গী হতে হত। মানুষের সান্ত্বনার চেয়ে প্রকৃতির পরিবেশের এই সান্ত্বনায় সত্যিই আমার মনের ভার কমেছিল অনেক।

অ প রা ধী র বি চা র ॥ ১৪ জানুয়ারি ১৭৮৪ একজন নীচজাতের লোককে খুনের অপরাধে বিচার করা হয়। কোন ধনিক হিন্দু পরিবারের ছ'বছরের একটি বালককে বাড়ির দরজার কাছ থেকে ভুলিয়ে ছোট একটা গলির ভিতর নিয়ে গিয়ে লোকটি তার গলা কেটে ফেলে এবং তার ধড়টিকে ভার বেঁধে (যাতে ভেসে না ওঠে) পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। এই বর্বর শিশুহত্যার প্রধান উদ্দেশ্য হল ছেলেটির পায়ের মল, হাতের বালা ও গলার হার ছিনিয়ে নেওয়া। এ দেশের অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বাল্যকালে নানারকম গহনা পরিয়ে রাখা হত। এতবড় অপরাধ করে স্বভাবতঃই লোকটি কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল যে সে দোষী। কিন্তু চেম্বার্স অকারণে আইনের সূক্ষ্ম বিচারের কথা ভেবে তাকে ঐভাবে দোষ স্বীকার না করে বিতর্কের সুযোগ

নিতে বললেন। বিচারকের এই অনুরোধ শুনে লোকটি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "বেশ, তা হলে আমি দোষী নই।"

জুরির একটি প্যানেল ঠিক করা হল। শুনানি চলতে লাগল। লোকটি যে সত্যিই খুন করেছে তা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হল না। অবশেষে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার কিছু বক্তব্য আছে কি না। সে উত্তর দিল, "আমার আর কি বলবার থাকতে পারে! আমি ছেলেটিকে খুন করেছিলাম। শয়তান আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল। আমি মহা অপরাধ করেছি, এবং আমি জানি সেজন্য আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। সবই আমার অদৃষ্ট, এতে কারও কিছু করার নেই। বিচার আপনারা ঠিকই করেছেন।"

যথারীতি কোর্ট-ক্লার্ক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তা হলে কি তোমার কিছু বলবার আছে?" লোকটি বেশ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "না মশায়, কিছুই বলবার নেই। কেন অনর্থক ঘ্যানর-ঘ্যানর করে বিরক্ত করছেন। আপনাদের মতন এমন অদ্ভুত বিচার আমি দেখি নি। আমি বলছি আমি খুন করেছি, আর আপনারা আমাকে দিয়ে বলাতে চান যে আমি খুন করি নি। তারপর আইনের নানারকম কসরত দেখিয়ে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত জাহির করতে চান। আপনাদের বিচারের উপদ্রবে আমি প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। অনুগ্রহ করে আপনাদের বিচারের পালা শেষ করুন, এবং আমাকে এই জঘন্য কাঠগড়া থেকে মুক্তি দিন।"

তা সত্ত্বেও মধ্যরাত্রের আগে বিচারের পালা শেষ হল না, কারণ আইনের বাতিকগ্রস্ত রবার্ট চেম্বার্স কেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাক্ষীদের নামের বানান এবং তাঁদের প্রত্যেকটি কথার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা

করতে লাগলেন। অবশেষে খুনী আসামীর মৃত্যুদণ্ড হল। পরদিন সোমবার সকালে ঠিক হল তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

মর্স আমাকে অনুরোধ করলেন, পরদিন ফাঁসির জায়গায় যথাসময়ে উপস্থিত হবার জন্য। আমি তাই উপস্থিত হলাম। ফাঁসির জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। মঞ্চে ওঠার আগে শেরিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মৃত্যুর আগে তোমার যদি কিছু বাসনা থাকে তো বল।" লোকটি তখন নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিল, "বাসনা আমার বিশেষ কিছু নেই। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, দয়া করে এখন কিছু খেতে দিন। জেলখানায় আপনারা আমাকে প্রায় না খাইয়ে রেখেছেন।" লোকটির কথা শুনে আমরা সকলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শেরিফের মুখ দিয়ে দেখি কথা বেরুচ্ছে না, তিনি বোবা হয়ে গেছেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে যে ব্যক্তি ফাঁসিকাঠে ঝুলে প্রাণ দেবে তার খিদে পেলেও তা যে এমনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, কেউ তা কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু ঐস্থানে তখন কোন খাদ্য সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। শেরিফ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখে লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, "আপনারা অকারণে আমার জন্য এত ব্যস্ত হবেন না। খাবার না পাওয়া গেলে আর কি করবেন! খাদ্যের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। তবে আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার কি ইচ্ছা আছে, আমি তাই উত্তর দিয়েছিলাম যে আমার খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিন। কিন্তু খাবার যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন আর দরকার নেই।"

খাদ্যসমস্যার এইভাবে যখন সমাধান হয়ে গেল তখন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চের তক্তাটিও সরিয়ে নেওয়া হল তার পায়ের তলা থেকে, এবং লোকটি দড়িতে ঝুলতে লাগল।

চিত্রকর টমাস হিকি॥ ফেব্রুয়ারি মাসে হেস্টিংস-পত্নী মাদাম ইমহফ কোম্পানির জাহাজে করে কলকাতা ছেড়ে ইয়োরোপ চলে গেলেন। মার্চ মাসে আর এক তৃতীয় হিকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এঁর নাম টমাস হিকি। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর, পোর্ট্রেট-পেণ্টার। হিকি বাংলাদেশে এলেন মূর্তিচিত্রের কাজ করবেন বলে। চিত্রকরের পেশা গ্রহণ করে তিনি কলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে দেখার পর থেকে আমার আরও বেশি করে শার্লতের কথা মনে হতে লাগল। একদা যখন আমি ও টমাস হিকি লিসবনের এক হোটেলে একসঙ্গে থাকতাম, তখন কতদিন যে শার্লতের কয়েকটি পোর্ট্রেট আঁকা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তার ঠিক নেই। টমাস হিকি কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত পল্লীতে খুব বড় একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। সেখানে ঠিকঠাক হয়ে বসে তিনি শার্লতের একটি পোর্ট্রেট আঁকবেন স্থির করলেন। পূর্ণাকার পোর্ট্রেট। তাঁর আঁকা শেষ হলে আমাকে অবশ্য ছবিটি পুরো দু'হাজার সিক্কা টাকা দিয়ে কিনে নিতে হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শার্লতের চেহারার সঙ্গে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও, পোর্ট্রেটটি আমার খুব ভাল লাগে নি।

মদ্যপান॥ শার্লতের মৃত্যুর পর থেকে স্বভাবতঃই আমার জীবনের ধারা খানিকটা বদলে গেল। স্রোতের মুখে কিছুটা গা ভাসিয়ে দিলাম। মদ খেয়ে বেশ গরম না হয়ে বিছানায় শুতে পারতাম না। ঘুম আসত না চোখে। মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম, এবং চেষ্টা করতাম এইভাবে শার্লতের স্মৃতি ভুলে থাকতে। ক্রমে ক্রমে মদ্যপান আমার রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

কলকাতায় তখন তরুণ ইংরেজ কর্মচারীরা কতকটা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে মদ্যপান করতেন। তাঁরা আমার সান্ত্বনার উৎস সন্ধানে সবচেয়ে উৎসাহী সুরাসঙ্গী হয়ে উঠলেন। সুতরাং সুরাপানের অভ্যাস হতে খুব বেশি দেরি হল না। টাকা জলের মতন রোজগার করতে লাগলাম বটে, কিন্তু দেনাপত্তর শুধে তাতেও আমার কুলোত না। ঋণের সুদ মিটিয়ে আমার খরচটা চলে যেত বলে টাকা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতাম না। অর্থাৎ টাকার কথা চিন্তা করে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন কখনও বোধ করি নি। গড়ে প্রতি মাসে আমার রোজগার ছিল প্রায় তিন হাজার সিক্কা টাকা। খরচও ছিল তাই। শহরের মধ্যে তখন আমারই চালচলন ও খানাপিনা ছিল সবচেয়ে শৌখিন। সবচেয়ে দামী ফরাসী মদ ও পুরনো মদিরা আমারই খানাটেবিলে নিয়মিত সাজানো থাকত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার কাজের ডেস্কে বসা পর্যন্ত সময়টুকু আমার কাছে খুবই অসহ্য বলে মনে হত। একা একা বসে যখন ব্রেকফাস্ট খেতে হত তখন শার্লতের কথা মনে হত আরও বেশি। চারিদিকে ঘরকন্নার সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করতাম। সমস্ত বাড়িটাতেই যেন তাঁর হাত-পায়ের ছাপ লেগে রয়েছে মনে হত। শার্লতের স্মৃতির এই দুঃসহ বোঝা নিয়ে এ বাড়িতে থাকা যে আর সম্ভব নয়, তা বুঝতে পারলাম। অন্তত বারো মাস থাকার কড়ার করে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই ছেড়ে যেতে হবে বলে তাঁকে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলাম। তিনিও তাতে আপত্তি করলেন না। আমি এসপ্লানেডের কাছে গঙ্গার ধারে সুন্দর একটি খোলামেলা বাড়ি ভাড়া করলাম। আরামে বাস করার মতন এত সুন্দর অঞ্চল কলকাতাতে আর নেই। নতুন বাড়িতে গিয়ে খুব দ্রুত আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হল।

এই সময় ইয়োরোপ থেকে আমদানি খাদ্যের ও পানীয়ের বেশ অভাব হয়েছিল কলকাতায়। অবশ্য তার চাহিদাও বেড়েছিল খুব, এবং সেই অনুপাতে জিনিসের আমদানি হচ্ছিল না। তাই ইয়োরোপীয় জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছিল খুব। হ্যাম ও চীজ পাঁচ সিক্কা টাকা করে পাউণ্ড বিক্রি হত। ক্ল্যারেট পাওয়াই যেত না, যা পাওয়া যেত তা ৬৫৲ টাকা করে ডজন বিক্রি হত। আমাদের অবশ্য তার বিশেষ অভাব ছিল না। ডেনমার্ক থেকে আমাদের এক বন্ধু জাহাজে করে প্রচুর ক্ল্যারেট নিয়ে এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি পুরো ছুটি চেস্ট কিনে মজুত করে রেখেছিলাম।

এপ্রিল মাসে আমার বন্ধু জেম্‌স গ্র্যাণ্ট বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। যেদিন তিনি এলেন সেইদিন রাত্রেই তাঁকে একটি ক্লাবের তরফ থেকে বিরাট একটি ভোজ দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল। আমিও সেই ক্লাবের একজন সভ্য ছিলাম। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে কোন কারণে আমার এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যে কলকাতায় আসার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে আমি তেমন উৎসাহবোধ করছিলাম না। ক্লাবের ভোজসভায় গিয়ে ভেবেছিলাম কোনরকমে পাশ কাটিয়ে চলে যাব। কিন্তু তা হল না। ভোজ আরম্ভ হবার ঠিক আগেই গ্র্যাণ্ট আমার কাছে এগিয়ে এসে একেবারে ছ'হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন, "কি মশায়, কেমন আছেন? আমাকে কি ভুলে গেলেন না কি? না, আগেকার রাগ আপনার এখনও কমে নি। আমার উপর রাগ করা কিন্তু আপনার অন্যায়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমাদের ছুজনেরই পরিচিত এক ব্যক্তি আমাদের পরস্পরের কাছে বন্ধুবিচ্ছেদের জন্য কুৎসা রটনা করেছে। সুতরাং মিথ্যা ধারণা নিয়ে আমার উপর রাগ করে থাকবেন না। আগেকার

কথা ভুলে যান। আসুন, আবার আমরা পুরনো দিনের মতো বন্ধু হয়ে যাই।”

এই কথার পর আমার পক্ষে রাগ করে থাকা সম্ভব হল না। আবার আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব আমরা ফিরে পেলাম। এবার আমি একদিন তাঁকে আমার বাড়িতে ডিনার খেতে বললাম। সেইদিন কলকাতার সব সেরা সাহেবদেরও নেমন্তন্ন করলাম। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ইংলিশ ক্ল্যারেট খাওয়াবার ইচ্ছা হল। কলকাতার বাজারে তখন তা একেবারে দুর্লভ! ‘ব্যাক্সটার অ্যাণ্ড জয়’ নামে বড় একজন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীর কাছে খোঁজ করতে ইংলিশ ক্ল্যারেটের সন্ধান পেলাম। শুনলাম কয়েকজন বাছাই খদ্দেরের জন্য কিছু মাল তাঁরা মজুত করে রাখেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁরা আমাকেও একজন বাছাই খদ্দের মনে করেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে তিনি ডজন ক্ল্যারেট পেলাম। সাধারণত এর অর্ধেকও কোন বিশিষ্ট খদ্দেরকে তাঁরা দেন না। নেহাত ভাগ্যের জোরে আমি পেয়ে গেলাম।

ভোজের দিন সকালবেলা আমি আমার খানসামাকে বলে রাখলাম রাত্রে খাবার সময় অতিথিদের ইংলিশ ক্ল্যারেট দিতে। দু’দিন আগে দোকান থেকে যে ক্ল্যারেট নিয়ে এসেছি, তাই দিতে হবে বলে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম। রাত্রে ভোজের সময় দেখলাম অতিথিরা ক্ল্যারেট পান করে একেবারে হৈহল্লা করে প্রশংসা করছে। “এ মাল কোথায় পেলেন” বলে সকলে রীতিমত চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। আমি তখন চুপচাপ বসে পান করছিলাম। পান করার সময় গন্ধ পেয়ে আমার মনে হল ডাচ ক্ল্যারেট পান করছি। ভাবলাম, খানসামা হয়ত ভুল করে ইংলিশের বদলে ডাচ ক্ল্যারেট দিয়েছে। কিন্তু কথাটা আর তখন ফাঁস করলাম না। খানসামা যখন প্লেট তুলছিল তখন কাছে

পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোন্ ক্ল্যারেট দিয়েছিলে, ইংলিশ না ডাচ?" খানসামা উত্তর দিল, "না সাহেব, আগে ডাচ ক্ল্যারেট দিয়েছি, এবারে খানার শেষে ইংলিশ ক্ল্যারেট দেব।" তার উত্তর শুনে আমি একটু বিরক্তই হলাম।

যাই হোক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এবারে ইংলিশ ক্ল্যারেট দিতে বললাম। কিন্তু দেওয়া মাত্রই অতিথিরা সমস্বরে বলে উঠলেন, "ছিকি সাহেব, আপনার খানসামা আগেকার মাল বদলে দিয়েছে।" আমি বললাম, "বদলে যখন দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আরও দামী ও ভাল মাল, আপনারা পান করে আরও আরাম পাবেন।" বলা মাত্রই তাঁরা সকলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "না না মশায়, মাল ভাল না, দরকার নেই আমাদের দামী মাল খেয়ে, আপনি আমাদের আগেকার মাল দিতে বলুন।" আমি তাঁদের কথায় বিশেষ বিচলিত হলাম না, কারণ আমি জানতাম যে তাঁদের ইংলিশ ক্ল্যারেটই দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা তা বুঝতে পারবেন বলে তাঁদের ধৈর্য ধরতে বললাম। দ্বিতীয়বার তাঁদের ঐ ক্ল্যারেটই দেওয়া হল। এবারেও খেয়ে তাঁরা ঐ মত দিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে ডাচ ক্ল্যারেটই অনেক বেশি সুস্বাদু ও সুগন্ধি। তাঁদের কথার আর প্রতিবাদ না করে আমি বললাম, "খুব ভাল কথা, আপনাদের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। তবে এইটুকু শুধু বলতে চাই যে আপনারা যে ক্ল্যারেট খেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন তা ১৮৲ টাকা ডজন হিসেবে কিনেছি। আর যার নিন্দা করলেন তা কিনেছি ৬৫৲ টাকা করে ডজন।" কিন্তু সত্যিকারের সমঝদার লোকের সংখ্যা যে কত অল্প তা বুঝলাম যখন দেখলাম, দাম শোনা মাত্রই কয়েকজন ইংলিশ ক্ল্যারেটের সপক্ষে মৃদুস্বরে গুণগান করতে আরম্ভ করেছেন। কেউ কেউ বলছেন যে ইংলিশ ক্ল্যারেটের একটা এমন আলাদা স্বাদ আছে যা ডাচের নেই, তবে তা ধরতে

পারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। দু'চারজন আগেই তা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু সকলের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন নি। আমি আর তাঁদের কথার কোন জবাব দিলাম না। কে যে কত বড় বোদ্ধা তা মনে মনেই বুঝলাম।

কলকাতার থিয়েটার॥ ১৭৮৩ সনে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর ফ্রান্সিস রাণ্ডেল নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আমি যখন বিলেতে ছিলাম, রাণ্ডেল তখন কোম্পানির অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন হয়ে কলকাতায় আসেন। বয়স তাঁর বছর পঁচিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় তাঁর দ্বিগুণ বয়স, লম্বা-চওড়া চেহারার জন্য। মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর, চোখগুলি টানা-টানা, কণ্ঠস্বর গম্ভীর। চোখের চাউনিতে মনের ভাব চমৎকারভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিককেও মধ্যে মধ্যে হার মানিয়ে দেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলেও তাতে এমন মিষ্টি সুর আছে যে শুনলে মোহিত হয়ে যেতে হয়। এই সব গুণের সমন্বয় দেখে মনে হত, যেন অভিনয় করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। ধীরে ধীরে তাঁরও সেই কথা মনে হল। সার্জেনের চাকরি থেকে মনটা গিয়ে পড়ল স্টেজের উপর। ভাল অভিনেতা হবার ইচ্ছা হল তাঁর। ইচ্ছাটা যে তাঁর কলকাতাতেই প্রথম জাগল তা নয়, তার আগে স্বদেশে ইংলণ্ডেও জেগেছিল। ইংলণ্ডে তিনি অনেক থিয়েটার করেছেন, এবং অভিনেতা হিসেবে অ্যামেচারমহলে তাঁর বেশ সুনামও হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়টাকে পেশা করার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সকলের বিশেষ আপত্তি ছিল। সেইজন্য তিনি সার্জারি পড়তে আরম্ভ করেন, এবং কোম্পানির সহকারী সার্জেনের চাকরি নিয়ে এদেশে চলে আসেন।

রাণ্ডেল যখন কলকাতায় আসেন তখন শহরে বেশ বড় একটি পাবলিক থিয়েটার সকলে চাঁদা দিয়ে চালাতেন। কিন্তু এই সময় থিয়েটারের ভদ্রলোক অভিনেতাদের মধ্যে, কার কোন্ চরিত্র অভিনয়ের যোগ্যতা আছে তাই নিয়ে ভয়ানক গণ্ডগোল বেঁধে গেল। প্রত্যেকেই চান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে, কারণ প্রত্যেকেরই ধারণা যে তিনিই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ঝগড়া এমন স্তরে পৌঁছল যে শেষে ডুয়েল পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তার ফল হল এই যে থিয়েটারের জন্য আর অভিনেতাই পাওয়া যেত না। অভিনয়ের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। ব্যয়বাহুল্যের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল থিয়েটারের।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই রাণ্ডেল থিয়েটারের মালিকদের কাছে প্রস্তাব করেন যে তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারেন, যদি তাতে তাঁদের কোন আপত্তি না থাকে। যেখান থেকে যে রকম করে হোক তিনি অভিনেতা সংগ্রহ করবেন, এবং নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এই চার মাস অন্তত সপ্তাহে একটা করে নতুন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। তা ছাড়া মালিকরা যদি তাঁকে প্রত্যেক বক্সের জন্য এক সোনার মোহর এবং প্রত্যেক সীটের জন্য আট সিক্কা টাকা মূল্য দর্শকদের কাছ থেকে আদায় করতে দেন, তা হলে তিনি থিয়েটারের সমস্ত ঋণও শোধ করে দেবার দায়িত্ব নিতে পারেন, এবং কখনও কোন কারণে মালিকদের কাছে আর টাকা চাইবেন না বলে কথাও দিতে পারেন। রাণ্ডেলের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে থিয়েটারের মালিকরা একটি সভা ডেকে বিষয়টি আলোচনা করেন, এবং থিয়েটারের সমস্ত দায়িত্ব রাণ্ডেলকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলাদা একটি চুক্তিপত্র করে রাণ্ডেলকে থিয়েটারের ভার অর্পণ

ফোর্ট উইলিয়াম—১৭৩৬ ভ্যান্ডারগুখ্টের এন্‌গ্রেভিং

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম—১৭৮৭ টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

করা হয়। থিয়েটার পরিচালনার ভার নিয়ে রাণ্ডেল তার কাছেই একটি সুন্দর বাড়িতে বাস করতে থাকেন।

রাণ্ডেলের সুদক্ষ পরিচালনায় দিন দিন থিয়েটারের উন্নতি হতে থাকল। থিয়েটার আগেও হত, কিন্তু রাণ্ডেলের তত্ত্বাবধানে ক্রমে তার যে রূপান্তর ঘটতে থাকল, কলকাতা শহরের অধিবাসীদের কাছে তা অভিনব ও অপ্রত্যাশিত। রাণ্ডেলের মতন পরিচালক ও অভিনেতা আগে কেউ ছিলেন না। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনি স্বভাবচরিত্র। একবার কেউ তাঁর কাছে এলে সহজে ছাড়তে পারতেন না। তাই আগে যাঁরা থিয়েটার থেকে দূরে থাকতেন, সহজে কাছে ঘেঁষতে চাইতেন না, তাঁরা অনেকেই তাঁর অধীনে থিয়েটারে যোগ দিলেন। কার কি কাজ বা অভিনয় করার যোগ্যতা আছে তা নিয়ে আর বিবাদ হত না। রাণ্ডেলের বিচারবুদ্ধিকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতেন। বাইরের অনেক ভদ্রলোক তাঁর কাছে অভিনয় শিক্ষা ও স্টেজের নানাবিধ পরামর্শের জন্য আসতেন। রাণ্ডেলের পরিচালনায় কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ভঙ্গি ও মঞ্চশিল্প দু'য়েরই যথেষ্ট উন্নতি হল।

উন্নতির প্রথম লক্ষণরূপে দেখা গেল থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। যে-কোন নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হলে থিয়েটারহলে দর্শকদের জায়গা দেওয়া সম্ভব হত না। এইভাবে থিয়েটারের আয় বেড়ে যাবার ফলে রাণ্ডেল অল্পদিনের মধ্যেই আগেকার ঋণ সব শোধ করে ফেললেন। মুনাফার অনেকটা অংশ তিনি নিজেও ভোগ করতেন। তবে সবটা নিজে গ্রাস করে না ফেলে তিনি তার খানিকটা অংশ অন্যান্য অভিনেতা ও স্টেজকর্মীদের ভাগ করে দিতেন। অভিনয়ের জন্য যাঁর যা পোশাকের দরকার হত, তাঁকে তা তিনি যত পয়সাই লাগুক কিনে দিতেন। শুধু তাই নয়, অভিনয় শেষ হবার পর সেই রাত্রে তিনি অভিনেতাদের ভূরিভোজন

করাতেন, এবং ক্ল্যারেট, স্যাম্পেন বা বার্গাণ্ডি দিয়ে আপ্যায়ন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কেউ কেউ দেখতাম এই রাজকীয় অভ্যর্থনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে রাতভোর পর্যন্ত বসে বসে সুরাপান করতেন। এই ভোজের জন্য আমি দেখেছি রাণ্ডেলকে ৮০৲ সিক্কা টাকা ডজন মূল্যে স্যাম্পেন কিনতে। রাণ্ডেলের নিজেরও অনেক-দিন থেকে সুরার প্রতি গভীর আসক্তি ছিল। সুরাপানের অভ্যাসও তাঁর দীর্ঘকালের। সুতরাং তরুণ অভিনেতাদের সুরা-প্রেমিক করে তুলতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের তরুণ উড্ডীয়মান ইংরেজদের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

কেবল মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবেই রাণ্ডেল একজন কৃতী ব্যক্তি ছিলেন না। অভিনয়কলাতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তখন কলকাতা শহরে তাঁর সমস্তরের অভিনেতা আর কেউ ছিলেন না। আমার মনে আছে একবার উইলিয়ম বার্ক তাঁর সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অভিনয় দেখে আমাকে বলেছিলেন যে সবদিক থেকেই রাণ্ডেলকে ইংলণ্ডের অন্যতম অভিনেতা গ্যারিকের সমকক্ষ বলতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। বার্কের মতন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতামত নিশ্চয় উপেক্ষণীয় নয়। কেবল 'হ্যামলেট' অভিনয় নয়, 'কিঙ লীয়ার', 'ওথেলো', 'রিচার্ড দি থার্ড' প্রভৃতি অভিনয়েও রাণ্ডেল অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে আমার ধারণা, 'ওথেলো'র অভিনয়ে তিনি কখনও গ্যারিকের উপরে উঠতে পারেন নি।

কলকাতা শহরে থিয়েটারের সাফল্যে রাণ্ডেল রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ইংলণ্ড থেকে অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুই-ই তিনি এদেশে নিয়ে আসার জন্য উদ্‌যোগী হলেন। তখন কলকাতার রঙ্গমঞ্চে মহিলা অভিনেত্রী কেউ ছিলেন না। পুরুষরাই দাড়িগোঁফ কামিয়ে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যে সময়ের

কথা বলছি সেই সময় মিঃ ব্রাইড ও মিঃ নরফার নামে দু'জন সুদর্শন ভদ্রলোক স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তা হলেও নারীর ভূমিকায় পুরুষের অভিনয় যত সুদক্ষই হোক, তা কখনও স্বাভাবিক হতে পারে না। দর্শকদের মনে কলকাতার মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে এইদিক থেকে একটা মস্তবড় অভাব ছিল। রাণ্ডেল এই অভাব পূরণ করে দিয়ে কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন যুগ প্রবর্তন করেন। ইংলণ্ড থেকে তিনি কয়েকজন মহিলা অভিনেত্রী নিয়ে আসেন। তাঁরা প্রথমশ্রেণীর না হলেও, দ্বিতীয়শ্রেণীর অভিনেত্রী নিশ্চয়ই। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাতেই একটা হৈচৈ পড়ে যায়। কয়েকজন পুরুষ অভিনেতাও এই সময় ইংলণ্ড থেকে আসেন।

আমার প্রকৃতির সঙ্গে রাণ্ডেলের সাদৃশ্য ছিল অনেক। সেইজন্য তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও বেশ গভীর হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েক ঘণ্টা করে আমি তাঁর সঙ্গে কাটাতাম। সুরাপানে মত্ত হয়ে অনেক সময় তিনি একটু অতিরিক্তি হৈ-হল্লা করতেন। তাই করে তিনি নিজের একটি হাত ও পা একেবারে জখম করে ফেলেছিলেন।

হে য়া র ড্রে সা র॥ আমার আইরিশ বন্ধু ক্যাপ্টেন হেফারম্যান এই সময় বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। হেয়ারড্রেসার ফ্রেস্কিনি আমার খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছিল, এবং বাস্তবিকই এমনভাবে আমার চুল ড্রেস করে দিত যে কলকাতা শহরে আমার মাথার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে।

ফ্রেস্কিনিকে নিয়ে একবার একটি সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল, এখনও আমার মনে আছে। ঘটনাটি এই। শার্লতের মৃত্যুর কয়েকদিন পরের কথা। সারারাত না ঘুমিয়ে বিছানায় ছটফট করে বেলা

প্রায় সাতটা আন্দাজ উঠে চুপ করে বারান্দায় বসে আছি। গায়ের লম্বা কোটটা মুড়ি দিয়ে নানারকমের কথা ভাবছি। এমন সময় একটি চাকর এসে খবর দিল, কে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার শরীর ও মন কোনটাই সেদিন ভাল ছিল না। তাই চাকরটিকে বললাম, তুমি গিয়ে তাঁকে বল যে আজ আমার পক্ষে দেখা করা সম্ভব হবে না, আর একদিন আসতে। চাকরটি ফিরে এসে বললে যে ভদ্রলোক আমাকে ঠিক দু'টি কি তিনটি কথা বলে চলে যাবেন, একেবারেই বিরক্ত করবেন না। এই কথা শোনার পর বাধ্য হয়ে আমাকে নিচে যেতে হল। ভদ্রলোক দেখা হওয়া মাত্রই খুব অনুনয় করে বললেন, "আমি খুব লজ্জিত, আপনাকে বিরক্ত করলাম। একটা কথা শুধু জানতে এসেছি, আপনার কি একদিন সময় হবে আমার বাড়িতে এসে একজন মহিলার একটু কেশচর্চা করে দিতে?" এতক্ষণে আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হল। বুঝলাম, ভদ্রলোক আমার হেয়ারড্রেসার ফ্রেস্কিনির খোঁজে এসেছেন, এবং আমাকে তাই মনে করে কথাবার্তা বলছেন। আমি কিছু না বলে একটি নমস্কার করে চলে এলাম। যাবার সময় বললাম, আমি আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি, সে ফ্রেস্কিনিকে ডেকে দেবে। প্রায় একঘণ্টা পরে একখানা চিঠি পেলাম ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ভদ্রলোকের নাম জেমস ক্রকেট। লণ্ডনের একজন নামকরা বহেমিয়ান, আমি চিনি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে লণ্ডনে এত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে পাওনাদারদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির একটা চাকরি নিয়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। তারপর অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমাকে একজন ইটালিয়ান হেয়ারড্রেসার মনে করে তিনি যে ভুল করেছিলেন তা নিয়ে আমরা প্রায়ই ঠাট্টাবিদ্রূপ করতাম।

বেনিয়ান বাবুর রসবোধ॥ এবারে শিল্পী টমাস হিকিকে নিয়ে সত্যিই আমি খুব বিব্রত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার বাড়িতে রোজ ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করলেন, আর একটি পোর্ট্রেট আঁকার জন্য। এবারে তিনি আমার পোর্ট্রেট আঁকতে চান। শার্লতের পূর্ণাকৃতি চিত্রের পাশে যদি আমারও একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র না থাকে তবে নিতান্তই বেমানান হয় বলে তিনি বারংবার আমাকে প্ররোচিত করছিলেন। কিন্তু আমি তো বিলক্ষণ জানতাম যে তাঁর একটি পোর্ট্রেট মানে হল দু'হাজার সিক্কা টাকা। অবশেষে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন এই টাকা দিয়ে ছবি আমাকে আঁকাতেই হল। আঁকা শেষ হবার পর প্রথমে আমি আমার বাঙালী বেনিয়ানবাবুকে ছবিটা দেখালাম। মতামত জিজ্ঞাসা করতে ছবির আপাদমস্তক কয়েকবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, "Yes, picture like master, but where watch ?" "ছবি তো স্যার্ ঠিক মাস্টারের মতনই হয়েছে, কিন্তু ঘড়িটা কোথায় গেল ?"

বেনিয়ানবাবুর দোষ নেই। ছবি, বিশেষ করে পোর্ট্রেট বলতে তখন বোঝাত, কেবল চেহারার নয়, পোশাক-পরিচ্ছদেরও নিখুঁত প্রতিলিপি। আমি তখন বেশ ঝকঝকে একটি সোনার হার শীলমোহরসহ বুকে ঝুলিয়ে রাখতাম। ছবিতে এই হারটি ছিল না, তাই বেনিয়ানবাবুর মনে হয়েছিল খুঁত আছে। আমি ইয়োরোপে অনেক সমঝদারের মুখেও ছবি সম্বন্ধে এই ধরনের সমালোচনা শুনেছি। সাদৃশ্য দিয়েই তাঁরা ছবির শ্রেষ্ঠতা বিচার করতেন। সেক্ষেত্রে একজন বাঙালী বেনিয়ানের আর দোষ কি!

ফেনউইক সাহেবের মেলা॥ এডওয়ার্ড ফেনউইক নামে তখন কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান ছিলেন কলকাতায়। মে মাসে প্রায় প্রত্যেক বছরই গার্ডেনরীচে তাঁর বাগানবাড়িতে

তিনি একটি চমৎকার মেলার আয়োজন করতেন। কয়েক হাজার লাল নীল রঙিন বাতি দিয়ে বাগান সাজানো হত। লক্ষ্ণৌ থেকে বিখ্যাত আতসবাজদের আনা হত বাজির উৎসবের জন্য। নানা-রকমের সঙ সেজে পোশাক পরে লোকজন আসত মেলায়, কেউ কেউ তাদের বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে মুখোশও পরত। বাগানের চারিদিকে তাঁবু খাটানো হত। তাঁবুর তলায় টেবিল সাজিয়ে দেওয়া হত নানারকমের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে। প্রায় তিনশো লোকের খানা এইভাবে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হত। এ ছাড়া বিশাল বাগানবাড়ির প্রায় প্রত্যেক ঘরে প্রচুর পরিমাণে খাবার মজুর থাকত। বাদকের দল থাকত বাগানের নানাস্থানে, মধ্যে মধ্যে তারা সামরিক কায়দায় বাজনা বাজিয়ে অতিথি ও দর্শকদের উৎসাহিত করত। নর্তকীরা থাকত বাজনার তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিমায় সকলের মনোরঞ্জনের জন্য। কেবল বাগানটি নয়, কলকাতা থেকে গার্ডেনরীচ যাবার শেষের দু'মাইল রাস্তা দু'দিকে দু'সার করে আলো দিয়ে সাজানো হত। তাতে দিবালোকের মতন পরিষ্কার দেখাত সব। কোনদিক দিয়েই ফেনউইক সাহেব তাঁর এই গ্রাম্য উৎসবের সমরোহের আদৌ কোন ত্রুটি করতেন না।

সেবার মেলা হল খুব সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে। সাধারণত বছরের এই সময়টাতে দক্ষিণে হাওয়ার জোর থাকে খুব বেশি, এবং প্রায়ই প্রবল ঝড় হয়। সে বছর তা হয় নি। শহরের অন্যান্য সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মতন আমি একটি মেলার নিমন্ত্রণের কার্ড পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেইদিনই আবার আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার বাড়িতে খাবার জন্য। খাবার সময় কতকটা বেহিসেবীর মতন সুরাপান করে ফেলে আমার অবস্থা রীতিমত কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা খুব শোচনীয় দেখে

বন্ধুবান্ধবরা সকলেই আমাকে ফিটনের বদলে চ্যারিয়টে চড়ে যেতে বললেন। দু-একজন তাঁদের চ্যারিয়টে আমাকে একটি সীটও দিতে চাইলেন। নিজে ফিটন চালিয়ে গেলে আমি যে নিশ্চিত একটি দুর্ঘটনা ঘটাব, এই তাঁদের ভয় হল। আমি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলাম না। ঠিক করলাম নিজেই ফিটন চালিয়ে যাব। অবশেষে ফিটনে উঠে বসলাম, এবং লাগাম হাতে নিয়ে আমিরী স্টাইলে ঘোড়া ছোটালাম। সহিস বা মশালচী কাউকেই সঙ্গে নিলাম না। ঘোড়া ছুটল জোর-কদমে। মেলার পথে গার্ডেনরীচের দিকে যাত্রীর ও গাড়ির ভিড় ছিল খুব। আমার ফিটন সকলকে ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। কর্নেল ওয়াটসনের ডকের প্রাচীরের কাছে এসে আমার হঠাৎ মনে হল ঘোড়াগুলো যেন একটু বেশি জোরে ছুটছে। মনে হতেই লাগাম টেনে ধরলাম, ঘোড়াও আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

এইভাবে বেশ আস্তে আস্তে ট্রট করে চলছি, এমন সময় দেখলাম আর একটি গাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, গাড়ির মধ্যে দু'জন ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রমহিলাদের দেখে স্বভাবতঃই আমার সৌজন্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমার নিজের গাড়িটা রাস্তায় পাশ করে তাঁদের বেরিয়ে যাবার পথ করে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সৌজন্য দেখাতে গিয়ে বিপদ ঘটল আমার। গাড়ি পাশ করতে গিয়ে ঘোড়া দু'টো ফিটনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা গাছের গুঁড়ির উপর। একটা পুরনো বাড়ির জীর্ণ দেয়াল ভেদ করে গাছটি ঠেলে উঠেছিল। আমি হঠাৎ ধাক্কায় একেবারে হুমড়ি খেয়ে কামানের গোলার মতন ছিটকে পড়লাম। মাথাটা তীরের মতন গিয়ে মাটিতে পড়ল, এবং মুখের একটা দিকের চামড়া অনেকটা ছড়ে গেল। কিন্তু অতিরিক্ত ক্ল্যারেট পানের জন্য আমার

বিশেষ স্যাড় ছিল না বলে এতটা আঘাত পেয়েও আমি কিছু বুঝতে পারি নি। তাই দুর্ঘটনার কথা আদৌ চিন্তা না করে, গাড়ি ও ঘোড়া ফেলে রেখে, আমি ফেনউইক সাহেবের বাগানবাড়ির দিকে টলতে টলতে এগুতে থাকলাম।

যখন মেলায় পৌঁছলাম, তখন আমার চেহারা যে কি রূপ ধারণ করেছে, সে সম্বন্ধে আমার চেতনাই ছিল না। আমার পরনে ছিল নীল রঙের সিল্কের একটি জামা। গাড়ি থেকে আছাড় খেয়ে পড়ার পর তার উপর ছোপ লেগেছিল ভাঙা ইটের গুঁড়োর। গাল দিয়ে রক্তের যে ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, তারও গাঢ় লাল রঙটি এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সব মিলে সত্যিই একটি রঙচঙে সঙ হয়ে উঠেছিলাম আমি। ভিতরে রঙ, বাইরেও রঙ। রঙবেরঙের আলোর মেলায় উপস্থিত হয়ে মনে হল আমিই যেন আদর্শ 'দর্শক'। ফেনউইকের আসল ঘরটিতে পৌঁছতেই উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে হৈ-হৈ করে উঠলেন। তাঁরা অনেকেই আমাকে চিনতেন বলে এতখানি অবাক হয়েছিলেন। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার মতন একজন রুচিবাগীশ লোক এরকম ক্লাউনের মতন উন্মত্ত অবস্থায় এসে এখানে হাজির হবে, এ কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। সকলে চেয়ার-টেবিল ছেড়ে হৈ-চৈ করে এসে আমাকে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায়, কখন ও কেন আমার এই শোচনীয় অবস্থা হল, সকলের মুখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। এর মধ্যে তাঁরা আমাকে সেবাশুশ্রূষাও করতে আরম্ভ করলেন। মুখের ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে তার উপর সাদা কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হল দেখলাম। এতক্ষণে মনে হল ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াবার মতন অবস্থা হয়েছে আমার। আগেকার মূর্তি নিয়ে কতকটা চেনা-পরিচিত ভদ্রলোকদের সামনে উপস্থিত হতেই তাঁদের যে অবস্থা

দেখলাম তাতে মনে হয় মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলে তাঁরা হয়ত আঁতকে উঠে চিৎকার করতেন অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতেন। সকলে মিলে অনেক বুঝিয়ে আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন, এবং আমোদ-প্রমোদে যোগ দিলে ক্ষতি হবে বলে উপদেশ দিলেন। আমি কিন্তু তাঁদের উপদেশ ও অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, ফেনউইক সাহেবের মেলায় কলকাতা শহরের এত সব অপ্সরী-উর্বশীর সমাগম হয়েছে, তাঁরা নড়েচড়ে নেচেগেয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমি তাঁদের না দেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনব, তা কখনই সম্ভব নয়। অতএব আমোদে ও প্রমোদে আমি যোগদান করবই, কারও বাধা বা আপত্তি শুনব না। তাই হল, খানাপিনা বা হল্লা কোনটাই বাদ দিলাম না। খানা-টেবিলে আমার মতন মজাদার ও মেজাজী সঙ্গী বাস্তবিকই কলকাতা শহরে তখন দুর্লভ ছিল। আমার সাহচর্যে সকলেই তাই পানভোজনে রীতিমত মেতে উঠলেন, এবং আমার ঠাট্টা-রসিকতায় হাসির ফোয়ারা ছুটতে লাগল। কিন্তু তাঁরা সেদিন আমাকে আর বেশি পান করতে দেন নি। ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে আমার নেশা অনেকটা কেটে গেল, আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

অনেক রাতে আমার গাড়িটা ও ঘোড়া দু'টোর কথা মনে হল। ফেনউইকের ভৃত্যদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কোন খোঁজ পেয়েছে কি না। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, জেনারেল স্টিবার্ট রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আমার গাড়ি-ঘোড়া দেখতে পান, এবং তাঁর লোকজনদের দিয়ে ঠিকঠাক করে ফেনউইক সাহেবের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তিনি ভেবেছিলেন, গাড়ির মালিক বা যাত্রীকে নিশ্চয়ই মেলাতে পাওয়া যাবে। গাড়ি থেকে নিচে পড়ার সময় ঝাঁকুনি খেয়ে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে লাগানো কয়েকটি মোহর ছিঁড়ে পড়ে যায়। তার মধ্যে একটি মোহর ছিল আমার অত্যন্ত

প্রিয়, ১৭৬৮ সনে আমি যখন প্রথম ক্যাডেট হয়ে ভারতবর্ষে আসি তখন আমার ভাই জোসেফ আমাকে উপহার দিয়েছিল। শীলটি দেখতে চমৎকার, টুকটুকে লাল পাথরের উপর এনগ্রেভ করা।

ফেনউইকের অতিথিদের পানভোজনের জের কাটিয়ে উঠতে রাত ভোর হয়ে বেলা সাতটা বেজে গেল। তাই দেখে অনেকে একেবারে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফিরবেন স্থির করলেন। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। বেলা নটার সময় আমি আমার ফিটন হাঁকিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করলাম। ফেরার পথে যখন সেই দুর্ঘটনার স্থানটিতে পৌঁছলাম, তখন আমার সঙ্গীটিকে বললাম যে গাড়ি থামিয়ে আমি আমার হারানো মোহরটি ভৃত্যদের দিয়ে খুঁজে দেখব। শুনে তিনি উপহাস করলেন। প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা রাস্তার মধ্যে ধুলো ঘেঁটে ছোট মোহর কুড়িয়ে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা ভাঙা টাইলের টুকরোর মতন কি দেখা গেল। ধুলো ঝেড়ে দেখলাম, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া মোহরটি। আমার একজন খিদমৎগার সেটি কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমাকে দেখাতে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। যেমন আগে পরতাম, তেমনি আজও আমি সেই মোহরটি পরে থাকি। এটি আমার সব সময়ের সঙ্গী বললেও ভুল হয় না।

রবার্ট চেম্বার্স॥ সেসন্সের বিচার আরম্ভ হল গ্রীষ্মকালে, জুন মাসে। তারিখ পড়ল ১০ জুন (১৭৮৪ সন)। সকাল ৮টায় কোর্ট বসবে, জুরিদেরও তাই জানানো হয়েছে। অন্যান্য বিচারকরা ও জুরিরা সকলেই সময়মত কোর্টে এসেছেন, কেবল স্যার রবার্ট আসেন নি। সব ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত ঢিমেতালে চলেন, এবং দু-চার ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বেলা একটা নাগাদ তিনি এসে পৌঁছলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ ঘণ্টা পরে। জুরিদের শপথ করিয়ে তাঁদের মামলা বুঝিয়ে দিতে বেলা তিনটে বেজে গেল। তারপর আর বিচার আরম্ভ করা যায় না বলে সেদিনের মতন শুনানি মুলতুবী রইল।

পরদিন সকাল নটার সময় হাইড ও জোন্স কোর্টে উপস্থিত হলেন, এবং জুরিদের শপথ গ্রহণের কাজ শেষ করে আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে চেম্বার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ, রীতি হল, চীফ বা সিনিয়র জজ উপস্থিত না থাকলে বিচারের কাজ আরম্ভ হতে পারে না। জাস্টিস হাইড ও উইলিয়ম জোন্স চুপ করে চেয়ারে বসে হাত কচলাতে লাগলেন। বেলা যখন এগারটা বেজে গেল তখন হাইড় রীতিমত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রবার্টের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। তিনি লিখলেন, "আমি ও জোন্স সাহেব বেলা নটা থেকে কোর্টে এসে বসে আছি, বেলা এগারটা পর্যন্ত আপনার দেখা নেই। অনুগ্রহ করে জানান,

কোর্টে আসা আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে কি না।” চাপরাসী দিয়ে রবার্টের বাড়ি পাঠাবেন বলে চিঠিখানা যখন তিনি ভাঁজ করছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি এসে উপস্থিত হলেন। হাইডের হাতে ভাঁজ-করা চিঠিখানা দেখে রবার্ট একগাল হেসে বললেন, “ব্রাদার হাইড, আমি যখন এসেই পড়েছি তখন অতদূরে কষ্ট করে চিঠি পাঠাবার আর দরকার নেই। ওটা এবারে ছিঁড়ে ফেলুন।” হাইড গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, “ছিঁড়ে লাভ কি বলুন; আবার তো কালকেই দরকার হবে!”

চেয়ারে উপবেশন করে স্যার রবার্ট প্রথমে তাঁর প্রাইভেট মিনিট-বুকে জুরিদের নাম লিখতে লাগলেন। নামের তালিকা করতে একঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কাঠগড়ার আসামীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন যে আজ তার বিচারের দিন নয়, অন্য একজন সিঁদেল চোরের বিচারের দিন। অবশেষে সেই চোরটিকে এনে হাজির করা হল। এতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। তারপর যা শুরু হল তা আরও চমৎকার। আসামীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে বলল ‘পিটার কার্ল’। আসামী জাতিতে আইরিশম্যান শুনে রবার্ট তার নামের ভাষাতাত্ত্বিক রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এবং এ বিষয়ে উইলিয়ম জোন্সকে কাছে পেয়ে নানারকম প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করে তুললেন।

রবার্ট। “আচ্ছা মিঃ জোন্স, নামের বানানটা কি তা হলে ‘K’ দিয়ে হবে, না ‘C’ দিয়ে হবে?”

জোন্স। “ ‘K’ দিয়ে কেন হবে বুঝতে পারছি না, ‘C’ দিয়েই তো হওয়া উচিত।”

রবার্ট। “উচ্চারণ তা হলে কি হবে?”

জোন্স। “CARLL—সার্ল।”

রবার্ট। "আপনি তো আইরিশ ভাষা জানেন?"

জোন্স। "আজ্ঞে হ্যাঁ জানি।"

রবার্ট। "বেশ, বেশ! তা হলে অনুগ্রহ করে বলুন, এ নামের অর্থ কি?"

জোন্স। "অর্থ আর কি? নামের অর্থ নাম; অর্থাৎ কার্ল মানে কার্ল। এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে বুঝতে পারছি না।"

দুই বিচারকের এই প্রশ্নোত্তরে আদালত-গৃহের লোকজন সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। স্যার রবার্ট কিন্তু তাতে আদৌ বিচলিত হলেন না। হাইডের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "আজ ১৬ জুন, ওয়েস্টমিনিস্টার ও ইংলণ্ডের অন্যান্য পাবলিক স্কুল আজকের তারিখ থেকে গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই পুরনো স্মৃতি আমার মনে পড়ছে।"

হাইড। "তাই না কি? আপনার স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে পারা যায় না।" হাইডের কথার সঙ্গে একটু বিরক্তি ও বিদ্রূপের সুর মেশানো ছিল।

স্যার রবার্টের মতন একজন বিচক্ষণ বিচারক যে আদালতে বসে এ রকম অবিবেচকের মতন আচরণ করতে পারেন, সামনের কাঠগড়ায় আসামীকে দাঁড় করিয়ে রেখে, তা কল্পনাই করা যায় না। তাঁর মতন একজন অসাধারণ পণ্ডিতের চরিত্রে এই বালসুলভ চাপল্য মোটেই খাপ খেত না। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত স্কলার ও ভাইনেরিয়ান প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালী হলেও, সমস্ত ছোটখাট কাজ এত নিখুঁতভাবে তিনি করতেন যার সত্যি কোন তুলনা হয় না। সামান্য কিছু একটা লিখতে হলে তিনি প্রত্যেকটি কথার অর্থ যাচাই করে ব্যবহার করতেন। একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ লিখে নিয়ে, জনসন ও

অন্যান্যদের অভিধান দেখে বিচার করে, তার মধ্যে একটিমাত্র শব্দ তিনি নির্বাচন করতেন। এটা তাঁর একরকমের বাতিক ছিল, যে-কোন ভাব-প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ প্রয়োগের বাতিক। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এইজন্য রবার্টের কথা উঠলে তাঁকে পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে অভিধানের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, অভিধান বটে, কিন্তু পাতাগুলি এলোমেলো করে সাজানো এবং অক্ষরবিন্যাসেও গণ্ডগোল। অর্থাৎ এমন অভিধান যার অবিন্যস্ত পৃষ্ঠা ও অক্ষরের ভিতর দিয়ে কোন শব্দের বা তার অর্থের হদিশ পাওয়া কঠিন। স্যার রবার্ট চেম্বার্স সম্বন্ধে সত্যিই এ কথা বলা চলে। চরিত্রের দৃঢ়তা ও চিন্তার সংযমের অভাবে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সমুদ্রের মতন গভীর না মনে হয়ে, গহন অরণ্যের মতন পথশূন্য মনে হত।

জা স্টি স হা ই ড॥ স্যার রবার্টের চরিত্রের এত দোষত্রুটি সত্ত্বেও জাস্টিস হাইড তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগও ছিল হাইডের, যা অবশ্য সকলের ছিল না। চেম্বার্সের মতন হাইডের চরিত্রেও অনেক অসঙ্গতি ছিল। হাইড ছিলেন উদারপ্রকৃতির হৃদয়বান ব্যক্তি, কিন্তু এমন কতকগুলি চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁরও ছিল যার জন্য তিনি অনেকবার বিপদে পড়েছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে ঝোঁকের মাথায় এমন সব কাজ তিনি করে বসতেন যার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত না। তাঁর গৃহের দ্বার সর্বদাই সকলের পানভোজনের জন্য উন্মুক্ত থাকত। পানের জন্য নানা-রকমের দামী মদ, এবং ভোজনের জন্য উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্যও মজুত থাকত তাঁর ঘরে। স্বভাবতঃই তার আকর্ষণে অতিথি ও বন্ধুবান্ধবদের ভিড় হত খুব তাঁর বাড়িতে। বিনা পয়সায়

সুরাপানের সুযোগ এবং তার সঙ্গে বিবিধ চর্বচোষ্য আহারের সুবিধা, কে না গ্রহণ করতে চাইবে বলুন? সপ্তাহে দু-তিনদিন করে এমন সব লোক আসতেন, যাঁদের ভাগ্যে বছরে একটি ডিনারের নিমন্ত্রণও জোটার কথা নয়। হাইডের উদার আতিথেয়-তার অপব্যবহার করতেন এইভাবে সকলে। কত লোককে যে তিনি মাসিক ভাতা দিতেন তার হিসেব নেই। প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা থেকে ২৲ টাকা, ৩৲ টাকা পর্যন্ত মাসহারা পায়, এ রকম অভাবগ্রস্ত লোকের সংখ্যা যে তাঁর তালিকায় কত হয়েছিল তা বলা যায় না। যে যে-রকম লোক তার সে-রকম মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য বছরে ৮০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং তাঁর বেতন বা আয় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি টাকায় কুলোতে পারতেন না। টাকার টানাটানি তাঁর সর্বদাই লেগে থাকত। দশ বছর ভারতবর্ষে বাস ও চাকরি করার পর তিনি দেখলেন যে দেনায় তিনি ডুবে গিয়েছেন। এত দেনা তাঁর হয়েছিল যে তা শোধ করার জন্য বিলেতের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তাঁকে প্রায় ১২,৫০০ পাউণ্ড স্টার্লিং, অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ সিক্কা টাকা নিয়ে আসতে হয়। এইরকম তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের বহর ছিল। বাস্তবিকই জাস্টিস হাইডের মতন হৃদয়বান ব্যক্তি তখনকার কালের কলকাতা শহরে খুবই দুর্লভ ছিল।

এবারে তাঁর উদারতার ও হঠকারিতার কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করব। টমাস মট (Thomas Motte) নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। শোনা যায়, সারা এশিয়ার মধ্যে, তাঁর মতন বড় ব্যবসায়ী দু-চারজন ছিলেন কিনা সন্দেহ। একবার একটি বড় কারবারে অনেক টাকা নিয়োগ করে তাঁর লোকসান হয়ে যায়। টাকার দায়ে এবং জেল খাটার ভয়ে তিনি ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে ফ্রেডারিকনগরে (শ্রীরামপুর) ড্যানিশদের অধীনে

আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আর্থিক দুরবস্থাও তাঁর এমন চরমে পৌঁছয় যে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে বাঁচাই মুশকিল হয়ে ওঠে। একজন ধনিক ব্যবসায়ীর হঠাৎ এই ভাগ্যবিপর্যয়ে পরিচিত সকলেই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে মটকে মাসিক অর্থ-সাহায্য করা হোক। প্রস্তাবকারীদের মধ্যে জাস্টিস হাইডও একজন ছিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় মটের শ্যালক পিটার টুচেট প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করার ভার নেন। তিনি ঠিক করেন যে মাসিক ৬০০৲ টাকা হলেই চলবে এবং তার জন্য ছ'জন বন্ধুর কাছ থেকে ১০০৲ টাকা করে তিনি চাইবেন। প্রথমে নিজের নামের পাশে ১০০৲ টাকা তিনি লিখে রাখেন। দ্বিতীয় বন্ধু জন হলডেনও তাই করেন। তারপর চাঁদার খাতা যখন হাইড সাহেবের কাছে যায়, তিনি তাঁর নামের পাশে ২০০৲ টাকা লিখে দেন। চতুর্থ ব্যক্তি পিটার স্পীকের কাছে যখন চাঁদার জন্য যাওয়া হয় তখন তিনি হাইডের টাকার অঙ্ক দেখে তার পাশে লিখে মন্তব্য করেন: "ছ'জন বন্ধু যখন সমানভাবে সাহায্য করবেন ঠিক হয়েছে, তখন হাইড সাহেবের বেশি টাকা দেওয়া অর্থহীন।" ব্যাপার হল, পিটার স্পীকেরও তখন দানধ্যানে খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। হাইড তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে যাবেন, এ বোধ হয় তাঁর সহ্য হল না। যাই হোক, মন্তব্যসহ যখন চাঁদার খাতা পুনর্বার হাইড সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি তা দেখে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যার উপর তিনি ক্রুদ্ধ হতেন, তাকেই 'গর্দভ' বলা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্পীকের মন্তব্য দেখেও তাই বললেন তিনি। তারপর যে-ব্যক্তি খাতা নিয়ে এসেছিল তাকে বললেন, "আপনি ফিরে গিয়ে মিঃ স্পীককে বলবেন যে অন্যের টাকার ব্যাপার নিয়ে অকারণে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

লালদীঘি—পূর্বদিক·
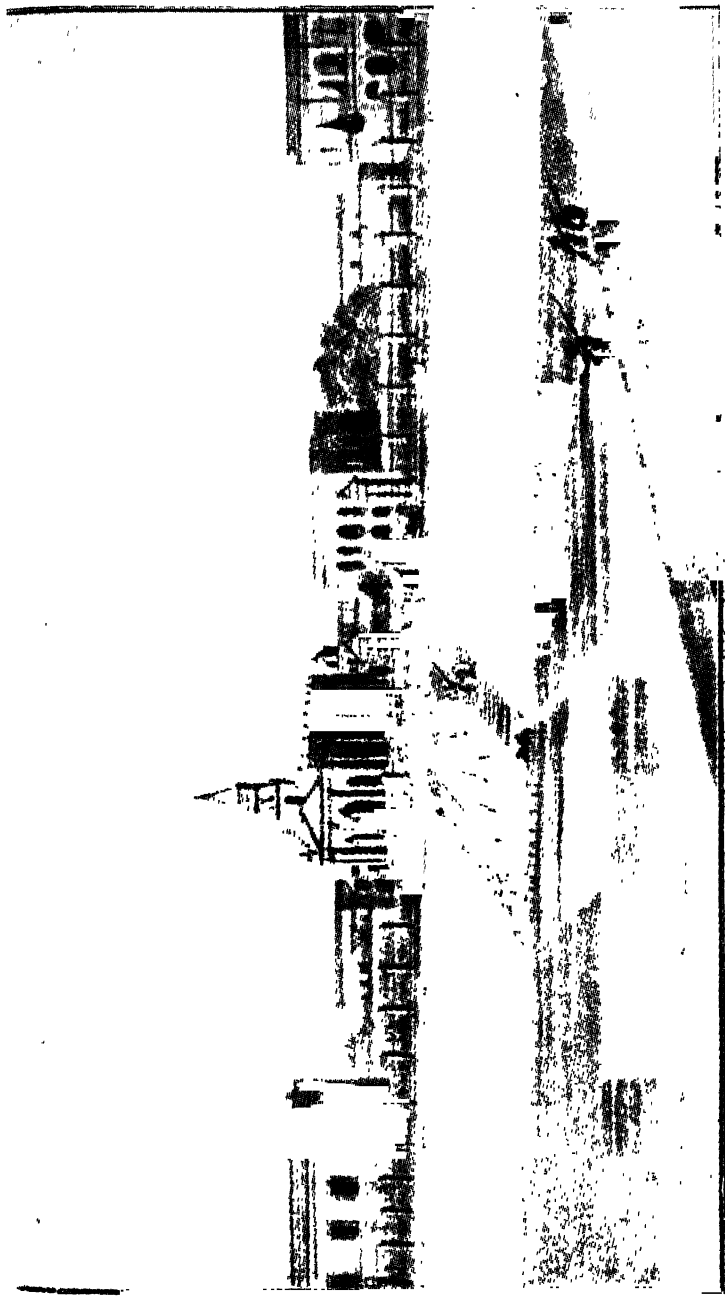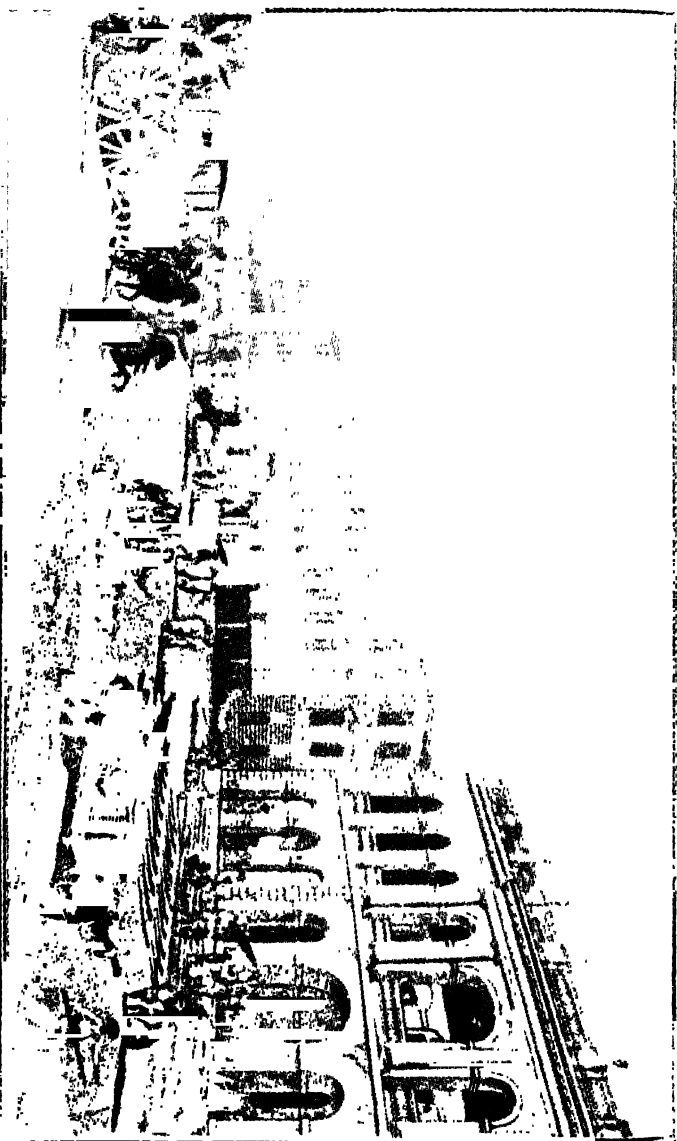
টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

মেয়রস কোর্ট ও রাইটার্স বিল্ডিং—১৭৮৬ টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

আমার টাকা যে-ভাবে খুশি খরচ করার স্বাধীনতা আমার আছে, তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার স্পীক পেলেন কোথা থেকে? তাঁর টাকা তিনি গঙ্গায় ফেলে দিন বা যাই করুন, আমি যেমন তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি, তেমনি তিনিও আমার টাকা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি যাকে ইচ্ছা যত টাকাই দিই না কেন, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না।" এই কথা বলে হাইড সাহেব চাঁদার খাতাটা খুলে তাঁর নামের পাশে ২০০৲ টাকার অঙ্কটি কেটে ৩০০৲ টাকা লিখে দিলেন। সেই মাসিক ৩০০৲ টাকা করেই সারাজীবন তিনি টমাস মটকে সাহায্য করেছেন।

হাইডের অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও, এই আত্মাভিমান, জিদ ও একগুঁয়েমির জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে খুবই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এমনিতে লোকজনের প্রতি তিনি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁর বিচারকের কাজকর্মের ব্যাপারে যদি কেউ কখনও তাঁর কাছে আসতেন, তা হলে আত্মীয়-বন্ধুনির্বিশেষে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত 'ফর্মাল' ব্যবহার করতেন, এমন কি রীতিমত রূঢ় হতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একবার তাঁর একজন বিশেষ পরিচিত কমাণ্ডার 'এফিডেভিট' করার জন্য তাঁর কাছে আসেন। হাইড যখন তাঁর আবেদনপত্র পড়ছিলেন তখন কমাণ্ডার ভদ্রলোক তাঁর সামনের একটি চেয়ারে বেশ আরামে বসে পড়েন। হাইডের সঙ্গে সত্যিই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি চেয়ারে বসা মাত্রই হাইড তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "উঠে দাঁড়ান! কে আপনাকে বসতে বলেছে?" কমাণ্ডার তাঁর দরখাস্ততে নাম লিখেছিলেন 'জে. প্রাইস' (J. Price)। হাইড বিরক্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "J—টা কি? জেকব, জেমস, জেরিমিয়া, জন, না আর কিছু? নামটা যে এইভাবে লিখেছেন, লোকে কি আপনার নাম নিয়ে গবেষণা করবে?"

কমাণ্ডার ভদ্রলোক হঠাৎ হাইডের এই বিস্ফোরণে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমার নাম স্যার্—জন প্রাইস, তবে বরাবরই আমি এইভাবে আমার নাম লিখে থাকি।"

হাইড আরও বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "তা যদি লিখে থাকেন তা হলে নিরেট বোকার মতন কাজ করেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বদভ্যাসটি ছাড়ুন।"

কথাবার্তার সময় তিনি নিজেই একটি দলিলের নিচে 'জে. হাইড' বলে নাম সই করে দেন। তাই দেখে কমাণ্ডার ভদ্রলোক বলেন, "আপনিও তো স্যার জে. হাইড লিখলেন। লোকে কি করে জানবে আপনার পুরো নাম কি?"

এই কথা শোনা মাত্রই হাইড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কমাণ্ডারকে তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। যাবার সময় তাঁকে ডেকে শুনিয়ে দিলেন, "মনে রাখবেন, আপনি একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন, সমাজের লোকের কাছে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকের সঙ্গে আপনার নামের ও তাঁর মর্যাদার পার্থক্য কি, তা আপনার জানা উচিত।"

কোন লোককে লাল রঙের কোট পরতে দেখলে (সেনাবিভাগের লোক ছাড়া) হাইড তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। কোন অ্যাটর্নির এক পর্তুগীজ ক্লার্ক আদালতে তাঁর কাছে একটা সাধারণ কাজের জন্য এসেছিল। হাইডের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই, সে 'যে-আজ্ঞে হুজুর' বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে, তার দিকে চেয়ে হাইড বিড়বিড় করে বললেন, "যে-আজ্ঞে হুজুর—গর্দভ কোথাকার!" পর্তুগীজ ক্লার্কটি হাইডের গজরানির উত্তরে আবার বলল, "যে-আজ্ঞে হুজুর!"

"এবারে বলুন তো যে-আজ্ঞে হুজুর, আপনার কি কাজ?" হাইড জিজ্ঞাসা করলেন।

"যে-আজ্ঞে হুজুর"—ক্লার্কটি উত্তর দিল।

"আপনি কি কেবল যে-আজ্ঞে হুজুর বলতেই এসেছেন, এটাই কি আপনার কাজ?" হাইড আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"যে-আজ্ঞে হুজুর"—পর্তুগীজ ক্লার্কটি আবার জবাব দিল।

এফিডেভিটের কাগজখানা রেগে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে আরদালিকে ডাক দিয়ে হাইড সাহেব বললেন, "ওই যে-আজ্ঞে হুজুর গর্দভটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোর্টের বাইরে বার করে দিয়ে এস।"

কলকাতা শহরে যখন পুলিস ছিল না তখন একজন বিচারক নিয়মিত চেম্বারে বসতেন, শহরের দৈনন্দিন অভিযোগ, বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি নিষ্পত্তির জন্য। চেম্বার ছিল লালবাজারের কাছে। একবার দু'জন হিন্দু ভদ্রলোক সামান্য একখণ্ড জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ করে হাইডের চেম্বারে নিষ্পত্তির জন্য আসেন। হাইড দু'জনের অভিযোগ শুনে সালিশীর দ্বারা ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে বলেন। প্রস্তাবে একজন রাজী হলেন, অন্যজন হলেন না। হাইড বারবার তাঁকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তা শুনলেন না। তিনি হাইডকেই বিচার করে দিতে বললেন। কিন্তু হাইডও নাছোড়বান্দা, এবং তাঁর জিদ হল, যেহেতু তিনি নিজে প্রস্তাব করেছেন, সেই হেতু তা মানতেই হবে। হিন্দু ভদ্রলোকটিও কম জেদী ছিলেন না। তিনি সাফ বলে দিলেন, "সালিশী আমি মানব না, বিচার আপনাকেই করতে হবে।" হাইড বললেন, "কি করতে হবে না-হবে তা আমি বুঝব, আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না। পাঁচ মিনিট আপনাকে ভাববার সময় দিলাম—ভেবে বলুন সালিশী মানবেন কিনা!" হিন্দু ভদ্রলোকটি একই ভাষায় উত্তর দিলেন, "এক-মিনিটও ভাববার প্রয়োজন নেই, আপনাকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে সালিশী আমি মানব না।"

"বেশ, ভাল কথা, আপনার একগুঁয়েমিকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি।" এই কথা বলে হাইড সাহেব একজন ক্লার্ককে ডেকে সেই হিন্দু ভদ্রলোকটিকে জেলখানায় নিয়ে গিয়ে আটক রাখতে বললেন।

এই হুকুম দিয়ে যখন তিনি শমন লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই হিন্দু ভদ্রলোকের কোন একটি ভৃত্য দৌড়ে গিয়ে তাঁর অ্যাটর্নিকে খবর দিল। অ্যাটর্নি কাছেই থাকতেন, খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন হাইডের চেম্বারে। অ্যাটর্নিকে দেখে হাইডের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। পারতপক্ষে কাজের সময় তিনি কৌতূহলী লোকের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। অ্যাটর্নিদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল সবচেয়ে বেশি। সুতরাং তাঁকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চান আপনি? হঠাৎ কি কারণে সন্ধ্যার সময় এখানে আপনার আসার প্রয়োজন হল?"

অ্যাটর্নি বললেন, "হুজুর, আমার নিজের ইচ্ছাতেই আমি এখানে এসেছি, সেজন্য মাফ করবেন। আমার একজন বিশিষ্ট মক্কেলের ভৃত্যের মুখে খবর পেলাম যে বিনা অপরাধে আপনি তাঁকে জেলখানায় বন্দী করে রাখার হুকুম দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে বলে আমি এসেছি।" হাইড বেশ ধমকানির সুরে বললেন, "আপনার ইচ্ছা হ'ল বলেই আপনি সোজা এখানে ওকালতি করতে চলে এলেন, এতটা স্বেচ্ছাধীন আপনি হলেন কি করে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি আমার চেম্বার ছেড়ে চলে যান, তা না হলে মুশকিলে পড়বেন।"

অ্যাটর্নি বললেন, "আমার মক্কেল কলকাতা শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। অর্থ ও প্রতিপত্তি দু'দিক থেকেই তাঁর সমকক্ষ লোক খুব অল্পই আছেন। জাতিতে তিনি হিন্দু, এবং হিন্দুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। জেলখানায় হীন বর্ণের

নানা জাতের লোকের সঙ্গে থাকলে তিনি জাতিচ্যুত হবেন, এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদাহানি হবে। যত টাকারই হোক, আমি তাঁর জন্য জামিন হতে রাজী আছি। আমার আবেদন, আপনি তাঁকে জামিনে মুক্তি দিন।"

এই কথার উত্তরে হাইড বললেন, "আমি আপনার জামিন বা প্রশংসা কোনটারই ধার ধারি না। আপনার মক্কেলের কত টাকা আছে, বা জাতিতে তিনি কত উচ্চস্তরের লোক, এসব সার্টিফিকেট দেবার জন্য আপনাকে এখানে ডেকে আনা হয় নি। অতএব আপনি আপনার নিজের কাজে যান, এখানে ঝামেলা করবেন না।"

অ্যাটর্নি সাহেব বেশ একটু মেজাজ দেখিয়ে বললেন, "আমার মক্কেলের অ্যাটর্নি হিসেবে আমাকে যা করতে হবে তা আপনাকে জানাচ্ছি। বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য বিচারকের কাছে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।"

অ্যাটর্নির এই উদ্ধত উক্তিতে হাইড ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করে উঠলেন: "এতবড় স্পর্ধা আপনার যে আইনের হুমকি দিয়ে আমাকে কাজ করাতে চান? আপনি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান, তা না হলে আপনার সম্ভ্রান্ত হিন্দু মক্কেলের মতন আপনারও অবস্থা হবে, এবং কেবল মক্কেলের জন্য নয়, আপনার নিজের জন্যও হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে।"

এই কথা শোনার পর অ্যাটর্নি হাইডের চেম্বার থেকে বিদায় নিলেন। হাইডও বুঝতে পারলেন যে কাজটা তাঁর আদৌ আইনসঙ্গত হচ্ছে না। সুতরাং অ্যাটর্নির প্রস্থানের পর তিনি তাড়াতাড়ি একজন হরকরা পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়, হিন্দু ভদ্রলোকটির মুক্তির আদেশ দিয়ে।

আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আমি জানি প্রত্যক্ষদর্শী

হিসেবে। ঘটনাটি এই। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কাজের জন্য হাইডের চেম্বারে বসে ছিলাম, এমন সময় হ্যামিলটন নামে একজন অ্যাটর্নি, হাগিন্স নামে তাঁর একজন মক্কেলকে নিয়ে হাইডের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর মৃত পিতৃব্যের বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন, এবং তা যথারীতি দখল করে দেখাশুনা করার জন্য কোর্টের অনুমতিপত্র নিতে এসেছেন। হ্যামিলটনের মক্কেল হাগিন্স মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অত্যধিক মদ্যপান করার ফলে তাঁর অর্ধেক চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বলে জাষ্টিস হাইড চার্টার ও পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট পাঠ করে দেখছিলেন, বিষয়টি তাঁর কোর্টের এক্তিয়ার-ভুক্ত কি না। হাইড যখন বইপত্র ঘেঁটে দেখছিলেন তখন হ্যামিলটনের মাতাল মক্কেল টলতে টলতে তাঁর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এইসব বড় বড় অপাঠ্য আইনের বই ঘাঁটবেন, আর আমি কি আপনার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব?"

ভদ্রলোক যে মাতাল তা হাইড এতক্ষণ বুঝতে পারেন নি। কথাগুলি শুনে তাঁর খেয়াল হল, তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে মক্কেলের অবস্থা একেবারে কাহিল। সুতরাং তিনি অ্যাটর্নিকে বললেন, "আপনার মক্কেল তো দেখছি একটি আস্ত জানোয়ার, ওকে এখনই কোর্ট থেকে বার করে নিয়ে যান।" অ্যাটর্নি অনেক কষ্টে তাই করলেন, টানতে টানতে মক্কেলকে আদালতের বাইরে নিয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার একদিন অ্যাটর্নি ও মক্কেল দু'জনেই এলেন। সেদিন অবশ্য মক্কেল প্রকৃতিস্থ ছিলেন। হাইড সাহেব তাঁকে অনুমতিপত্রটি দিয়ে বললেন, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আপনি এই বিপুল সম্পত্তি তদারক করতে পারবেন কি না।

তা ছাড়া, আপনার যা মতিগতি দেখছি, এবং যে মাত্রায় আপনি মদ্যপান করেন, তাতে ভরসা হয় না যে আপনি আপনার কাকার নাবালক ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবেন।”

হাইডের চরিত্রের এই মানবিক মাধুর্যই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। অনেক সময় আইনের দিক দিয়ে তিনি অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি দিতে পারতেন না বলে, এবং বহু অপরাধের সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না বলে, তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। বলতেন, “যদি বিচারকের আইন-প্রণয়নেরও ক্ষমতা থাকত, তা হলে বহু অন্যায়ের ন্যায্য প্রতিকার আমি করতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে ক্ষমতা নেই, তাই জেনেশুনেও সব সময় সব অন্যায়ের সুবিচার করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।”

এই ধরনের একটি বিচারের সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করব। শেরিফ নামে কলকাতা ট্রেজারির একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্লার্ক ছিলেন। তিনি একটি অনাথ বালিকার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতন বসবাস করতেও আরম্ভ করেন। যথাকালে তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যাও হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা যায়, আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং বিবাহ না করলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাজী নয় বলে, তিনি তাঁকে বিবাহ করতেও সম্মত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর পূর্বের স্ত্রী সেই অনাথ মহিলা ও তার ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের ব্যাপারে কিছু করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। অসহায় অবস্থায় তাদের পরিত্যাগ করে তিনি নতুন স্ত্রী নিয়ে ঘর করবেন মনস্থ করেন। শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক এত নিষ্ঠুর ও বদমায়েশ ছিলেন যে অনাথ স্ত্রীর সামান্য যা গয়নাগাঁটি ও জিনিসপত্তর ছিল, তাও ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যান। সেই অনাথ মহিলা অবশেষে

একেবারে নিরুপায় হয়ে জাস্টিস হাইডের শরণাপন্ন হন। শেরিফের কাছে মাসিক ভাতা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে তিনি হাইডের কাছে আবেদন করেন।

হাইডের মতন একজন মহানুভব বিচারক এ রকম অমানুষিক আচরণের কথা শুনে যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হবেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সময়কার আইন এমন ছিল যে তার জোরে শেরিফের মতন একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডকে বিশেষ কিছুই দণ্ড দেওয়া যায় না। তবু সেই অনাথ মহিলার আবেদনে তিনি এতদূর বিচলিত হলেন যে আইনের বলে কিছু করা যায় না জেনেও তিনি ঠিক করলেন যে শেরিফকে আদালতে ডেকে, সকলের সামনে, নির্মম ভাষায় গালাগাল করবেন। মানুষ হয়েও শেরিফ যে কত জঘন্য পশুর মতন আচরণ করেছেন একজন অসহায় মহিলার প্রতি, এ কথা প্রকাশ্য আদালতে বললে, হাইড ভাবলেন, হয়তো তার সুপ্ত মানবতাবোধ জাগতে পারে। কিন্তু তা হল না। তিনি অবশ্য শমন জারি করে শেরিফকে কোর্টে ডেকে পাঠালেন। তারপর প্রকাশ্য আদালতে হাইড ও শেরিফের মধ্যে যে বাক্যবিনিময় হল তা এই।

হাইড। "শেরিফ সাহেব, আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি যে আচরণ করেছেন, তাতে কি আপনি মনে করেন যে মনুষ্যসমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য!"

শেরিফ। "আমার ধারণা আমি এমন কিছু করি নি, যাতে সে যোগ্যতা আমার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।"

হাইড। "আপনি মানুষ নন, চোর ডাকাত ও জানোয়ারদের চেয়েও অধম। একটি অনাথ বালিকার নারীত্বের অপমান করে আপনি কাপুরুষের মতন আজ অন্য নারীর সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। যত সহজে ও নিশ্চিন্তে, এবং নির্বিবেকে

জীবের মতন, কেবল টাকার জোরে আপনি এই জঘন্য কাজ করছেন, বনের কোন জানোয়ারও তা করতে পারত না। আবার ঐ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন যে সমাজে আপনি ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার যোগ্য।"

শেরিফ। "মানুষ হিসেবে, এবং নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কি করা উচিত বা অনুচিত, আশা করি তার একমাত্র বিচারক আমি। আমার এই ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও আছে বলে আমি মনে করি না।"

হাইড। "তা অবশ্য নেই, ঠিক কথা। তবে একথাও ঠিক যে সভ্য মানবসমাজে বাস করে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন না। তবে বর্তমানে আইনের অবস্থা এমন যে তার জোরে আমারও ক্ষমতা নেই আপনার অন্যায়ের বিচার করার। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই ভেবে সে কোন্ গুণের জন্য, বা কিসের জোরে, আপনি নিজেকে ভদ্রলোক বলে জাহির করছেন? আপনি পায়ে জুতো পরে এসেছেন সেজন্য? আশ্চর্য! এই দেশে দেখতে পাই, জুতো পরলেই মানুষ 'ভদ্রলোক' হয়ে যায়। আর কি? নিশ্চয় আপনার বিলক্ষণ টাকার জোরও আছে? তাই নয় কি?"

শেরিফ। "নিশ্চয়ই, টাকার জোর তো আছেই।"

হাইড। "কত টাকা আছে আপনার?"

শেরিফ। "গুণে দেখি নি, তবে দু' লক্ষেরও বেশি।"

হাইড। "তা হলে, হে দু' লক্ষ টাকার ভদ্রলোক! আপনাকে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি—একলক্ষ টাকায় ভদ্রলোক হওয়া যায় না? অর্ধেক টাকা আপনি যদি আপনার অসহায় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে দিয়ে দেন, তা হলে কি সমাজের ভদ্রলোকের স্তর থেকে আপনার পতন হবে?"

শেরিফ। "আপনার এ কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।"

হাইড দুঃখে ও ক্ষোভে প্রায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, এবং সম্বিৎহারার মতন চিৎকার করে উঠলেন শেরিফের দিকে চেয়ে। বললেন, "পাষণ্ড জানোয়ার কোথাকার, বেরিয়ে যাও কোর্ট থেকে, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!"

শেরিফের নিষ্ঠুর আচরণে জাস্টিস হাইড সেদিন খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। অসহায় মহিলাটির দিকে চেয়ে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আর একটি কথাও তিনি বলতে পারেন নি। চুপি-চুপি কেবল তাঁর এজেণ্টকে বলে দিয়েছিলেন প্রত্যেক মাসে ৫০ টাকা করে মহিলাটিকে সাহায্য করতে, এবং কোথা থেকে কে তাঁকে এই অর্থসাহায্য করছে তা যেন তিনি কিছুতেই জানতে না পারেন। প্রায় পনের মাস হাইড এইভাবে মহিলাটিকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর গোপনতাও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে মহিলাটি হাইডের বাড়ি এসে, শহরের এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবের কথা জানালেন, এবং বললেন যে আর তাঁর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হবে না। হাইডের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর দুই চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় জল ঝরতে লাগল। হাইড তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তাঁর পুনর্বিবাহের সংবাদে তিনি যে খুব খুশি হয়েছেন, তাও তাঁকে জানাতে ভুললেন না। দয়াদাক্ষিণ্য দানধ্যান অনেককে করতে দেখেছি, কিন্তু মনে হয়েছে, কোথায় যেন তাঁদের আত্মপ্রচারের একটা বাসনা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। এ রকম বিনা আড়ম্বরে, ঢাক না পিটিয়ে, অকৃপণভাবে অসহায় ও বিপন্ন মানুষকে দানধ্যান করতে হাইডের মতন খুব কম লোককেই সংসারে দেখা যায়।

জাস্টিস হাইডের জীবনে আরও দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করব যা শুনলে আপনারা হাসি সংবরণ করতে পারবেন না।

একদিন রাতে চেম্বার থেকে হাইড বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় একজন তরুণী ইয়োরোপীয় মহিলা দৌড়তে দৌড়তে এসে রাস্তার উপর তাঁর পালকি দাঁড় করাল। তারপর সেই বিচিত্রবেশা মহিলার কি কান্না, কপাল চাপড়ানো ও আবেদন-নিবেদনের বহর! হাইড স্বভাবতঃই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কলকাতা শহরের রাস্তার উপর ঘটনাটি ঘটছে। জাস্টিস হাইডের পালকিও সকলের চেনা, আর তরুণী মহিলাটিও কারও অচেনা নয়, কারণ সে মহানগরের একজন বহুজনপরিচিতা বারাঙ্গনা। তাকে চিনতেন না কেবল হাইড সাহেব। তবু তার বিচিত্র বেশভূষা, এবং ততোধিক বিচিত্র মুখ-হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি দেখে তিনি কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রকাশ্য রাস্তার উপর নাটকীয় দৃশ্যটি জমতে দেওয়া ঠিক নয় বলে তিনি মহিলাটিকে বললেন, পরদিন সকালে তাঁর বাড়ি আসতে। বাড়িতে বসে তিনি তার অভিযোগ সব শুনবেন এবং সাধ্যমত তার বিহিত করারও চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু মহিলা তো সাধারণ মহিলা নয়, কম্‌লির মত নাছোড়বান্দা। সে তৎক্ষণাৎ বলল যে পরদিন সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার মতন অবস্থা নয় তার। সমস্যাটা জরুরী, এবং এখনই তার একটা যা-হোক সমাধান করা প্রয়োজন।

হাইডের পালকি গৃহাভিমুখে বেয়ারারা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল। পাশে পাশে সেই তরুণী বারাঙ্গনাটিও দৌড়তে লাগল। শহরের জনপথে, রাত্রিবেলা, সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

বাড়ি ফিরে হাইড জামাকাপড় বদলে খানাটেবিলে নৈশ-ভোজনের জন্য বসেছেন জনতিনেক বন্ধু নিয়ে, এমন সময় বেয়ারা

খবর দিল যে একজন মেমসাহেব খোঁজ করছেন। হাইড বুঝতে পেরে তাকে উপরতলায় ডেকে পাঠালেন। খাবার সময়, অতএব বাধ্য হয়ে তরুণীটিকেও খাবার কথা বলতে হল। ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলল যে ভোজনে তার রুচি না থাকলেও, কিঞ্চিৎ মদিরাপানে তার আপত্তি নেই। বেশ বড় এক গ্লাস মদিরা পান করে সে তার নাম বলল 'ডান্‌ডাস'। বর্তমানে যে জঘন্য জীবন তাকে যাপন করতে হচ্ছে তা বর্ণনা না করাই ভাল। এই বলে মিস্ ডান্‌ডাস জীবনের কথা বলতে শুরু করল। সদ্‌বংশের মেয়ে সে, তার দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, আর একজন নৌবাহিনীর লেফ্‌টন্যাণ্ট। তার বয়স যখন বছর চোদ্দ তখন একজন তারুণ্যতেজোদ্দীপ্ত অশ্বারোহীবাহিনীর অফিসারকে দেখে সে প্রেমে পড়ে, এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চতুর্দশী ডান্‌ডাস তার সহধর্মিণী হয়। অশ্বারোহী অফিসারের সঙ্গে সারা ইংলণ্ড চষে বেড়িয়ে অবশেষে রাজাজ্ঞায় স্বামীর ইস্ট ইণ্ডিজে যাত্রাকালে তার সঙ্গে ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রদেশে চলে আসে। তখন টিপুর সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হচ্ছে এবং সেই লড়াইয়ে তার বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা স্বামী প্রাণ হারায়। তারপর চরম দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে শ্রীমতী ডান্‌ডাস যে জীবন বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তা তো তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন। এই কথা বলে হাইডের সামনে ডান্‌ডাস ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। কোমলতায় হাইড স্ত্রীলোককেও হার মানিয়ে দেন। অতএব তাঁর হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে গলে গেল। ধরা গলায় তিনি বললেন, তারপর কি হল ?

তারপর আর কি ? বাংলাদেশে এসে ডান্‌ডাস নতুন বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করতে লাগল। বছরখানেক হল সে জনৈক মিড্‌লটন সাহেবের বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে থাকে ও

খায়, এবং তার জন্য যে টাকা দিতে হয় তা প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি বলেই তার ধারণা। তথাপি মিড্লটন ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে, এমন কি কারণে অকারণে মধ্যে মধ্যে তাকে বেদম ঠ্যাঙানিও দেয়। অদ্য রজনীতে সেই ঠ্যাঙানির দাপটেই সে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, এবং সেই সময় তাঁকে পালকি চড়ে যেতে দেখে ছুটে এসে পালকি আটকেছে। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে না এলে আজ বোধ হয় তার বাড়িওয়ালা ও বাড়িওয়ালী দু'জনে মিলে তাকে খুনই করে ফেলত।

ঘটনাটি করুণ, বলবার ভঙ্গিটিও মর্মস্পর্শী, বলতে বলতে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ, এবং সবার উপরে অভিনেত্রী বক্তা সুন্দরী তরুণী—এতগুলি ব্যাপারের অভাবনীয় সমাবেশে হাইড সাহেব রীতিমত বিচলিত ও অভিভূত হলেন। তাঁর স্বাভাবিক মানবতাবোধ অত্যন্ত উগ্রভাবে সজাগ হয়ে উঠল। ছলাকলায় সুদক্ষা শ্রীমতী ডান্ডাস সহজেই তাঁর অন্তরের দুর্গটি জয় করে ফেললেন।

হাইড বললেন, "আজ রাত্রে আপনি ঘরে ফিরে যান, আমার ভৃত্য গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তার সঙ্গে আমি একটি পরোয়ানাও পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাল সকালে যাতে মিস্টার ও মিসেস মিড্লটন আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, আমার সামনে, তাঁদের অভদ্র ও অন্যায় আচরণের কৈফিয়ত দেন সে জন্য।"

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী ডান্ডাসের এ প্রস্তাব পছন্দ হল না। তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে সে বলল, প্রাণ থাকতে আর সে ঐ বাড়িতে পদার্পণ করবে না, রাত্রিযাপন করা তো দূরের কথা। যদি অন্য কোথাও আশ্রয় না মেলে, তা হলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রাত্রি কাটিয়ে দেবে।

একজন অসহায় হতভাগ্য নারী, তার উপর সুন্দরী তরুণী, শহরের পথে পথে ঘুরে রাত কাটাবে, এ প্রস্তাব হাইড সাহেবেরও

মনঃপূত হবার কথা নয়। তিনি তাঁর সর্দার-বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "বাড়িতে কোন খালি ঘরে মিস্ ডান্‌ডাসের রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে ?"

সর্দার-বেয়ারা সবিনয়ে বলল, "সম্ভব হবে না হুজুর। কারণ কোন ঘরই খালি নেই, এবং দু-তিনটে বেশি খাটপালং যা ছিল তা আপনার এক বন্ধু সেদিন বারাসাত নিয়ে গেছেন।"

হাইড বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বৃদ্ধ বিলি পসন সে-রাতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। বৃদ্ধ বেশ রসিক ব্যক্তি। হাইডকে চিন্তিত দেখে তিনি বললেন, "স্যার, বৃথা চিন্তা করে লাভ কি ? ঘর এবং বিছানা দুইই যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এক কাজ করতে পারেন। আপনার ঘরও বড়, বিছানাও যথেষ্ট প্রশস্ত। তার একপাশে নবাগতা অতিথির শয়নের ব্যবস্থা করে দিলে ক্ষতি কি ?"

কাঁচা রসিকতা হাইড কোনদিনই বিশেষ বরদাস্ত করতে পারতেন না। বৃদ্ধ বিলির কথায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কথাবার্তায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, ভাল লক্ষণ নয়। মনে হয়, আপনার মস্তিষ্কটি একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে।"

হাইডের সমস্যার সমাধান অবশ্য ডান্‌ডাস নিজেই করে দিল। সে বলল, শহরে দু-তিনটি ভাল ট্যাভার্ন আছে, তার যে-কোন একটিতে সে স্বচ্ছন্দে রাত কাটাতে পারে। ট্যাভার্নের কথা শুনে হাইড তেমন খুশি হলেন না, কারণ কলকাতার ট্যাভার্ন সম্বন্ধে তাঁর আদৌ ভাল ধারণা ছিল না। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মট্ সাহেব ছিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর জানা দু'টি ভাল ট্যাভার্ন আছে, যেখানে ভদ্রভাবে রাত্রিবাস করা যে-কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

মটের কথা শুনে হাইড আশ্বস্ত হলেন এবং তখনই তাঁর

বেয়ারাদের ডেকে হুকুম দিলেন, পালকি সাজিয়ে মেমসাহেবকে ভাল একটি ট্যাভার্নে পৌঁছে দিয়ে আসতে। অবশেষে তাই করা হল। জাস্টিস হাইডের পালকি চড়ে নগরের নটী ডান্‌ডাস চলল ট্যাভার্ন সন্ধানে। নগরের লোক অবাক হয়ে দেখতে লাগল এবং যার মুখে যা এল তাই বলতে লাগল। দু-চারটে কথা ও মন্তব্য যে হাইডের কানেও পৌঁছয় নি তা নয়। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেন নি। সেটুকু সৎসাহস তাঁর বরাবরই ছিল দেখেছি। যা তিনি ভাল বুঝতেন বা করা কর্তব্য মনে করতেন তা লোকজনের মতামত উপেক্ষা করেই করতেন। বিদ্রূপ মন্তব্যে কখনও ভয় পেতেন না।

বেয়ারাদের ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন, শুতে যান নি। তারা যখন ফিরে এসে বলল যে মেমসাহেব একটি ভাল ট্যাভার্নে উঠেছেন, এবং তার মালিক হুজুরের কথা শুনে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি খাদ্য নিয়ে ঘটেছিল। সেটা উল্লেখ করছি এই জন্য যে হাইডের চরিত্র বুঝতে তা সাহায্য করবে। হাইডের এক বন্ধু একবার রংপুর থেকে তাঁর জন্য কিছু ভাল বাদাম পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কোথাও সে বাদাম পাওয়া যেত না, একমাত্র রংপুরে ছাড়া। তাও আবার একটিমাত্র গাছে সেই বাদাম ফলত। হাইড কিছুটা ভোজনবিলাসী ছিলেন। বাদাম পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন এবং খানসামাকে ডেকে বলে দিলেন প্রতিদিন দুধের সঙ্গে বাদাম দিতে, আর তার সঙ্গে আমের পুডিং। খানসামা বৃদ্ধ, কানে একটু কম শুনত। তা ছাড়া হাইড বই পড়তে পড়তে ও লিখতে লিখতে, মুখ নিচু করে এমনভাবে জড়িয়ে কথা বলতেন যে অর্ধেক

কথা বোঝা যেত না। খানসামার কানে তিনটি কথা মাত্র পৌঁছল— আমের পুডিংয়ের 'পুডিং' কথাটি, 'দুধ' আর 'বাদাম'। সুতরাং সে ভাবল, সাহেব তাকে রাতের খানার জন্য ভাল করে 'বাদামের পুডিং' বানাতে বলেছে। যত বাদাম ছিল সমস্ত ঝেড়েমুছে দিয়ে সে পুডিং বানাল। খাবার সময় উৎসাহের সঙ্গে সেই পুডিং নিয়ে হাইডের সামনে টেবিলের উপর রাখা মাত্রই, তার চেহারা দেখে তিনি চমকে উঠলেন। চক্ষু বিস্ফারিত করে খানসামার দিকে চেয়ে বললেন, "এ যে বিশাল পুডিং দেখছি। কার জন্য বানিয়েছ, আমাদের জন্য, না ফোর্ট উইলিয়মের গোরা সৈন্যদের জন্য? তারাও খেয়ে শেষ করতে পারবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে।"

খানসামা মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন বল তো খানসামা সাহেব, পুডিং নামে এই বিশাল পিণ্ডাকার পদার্থটির নাম কি? কিসের পুডিং?"

খানসামা হাত রগড়ে বলল, "আজ্ঞে হুজুর, এ হল আজ্ঞে পুডিং। আপনি বলেছিলেন হুজুর, তাই আজ্ঞে—বাদামের পুডিং।"

কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠে হাইড বললেন, "হ্যাঁ, কি বললে, বাদামের পুডিং? আরে জানোয়ার, গর্দভ, রাস্কেল, স্কাউণ্ড্রেল, অপদার্থ কোথাকার! বাদামের পুডিং, না অশ্বডিম্ব বানিয়েছ! কে খাবে তোমার পুডিং? খাবেন কেউ আপনারা?"

নিমন্ত্রিত অতিথিরা খাবার টেবিলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। হাইড আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বাদামের পুডিং বানিয়েছ, সব বাদামগুলো শেষ করে দিয়েছ! বেরোও রাস্কেল, বেরিয়ে যাও বলছি—"

ইত্যবসরে একজন অতিথি একটুখানি পুডিং কেটে খেয়ে, "বাঃ বাঃ চমৎকার পুডিং দেখছি, বাদামের যে এত সুস্বাদু পুডিং হয় তা তো জানতাম না—" ইত্যাদি বলে বোধ হয় হাইড সাহেবকে সান্ত্বনা

চৌরঙ্গী—১৭৮৭ টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট — ১৭৮৮ টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত
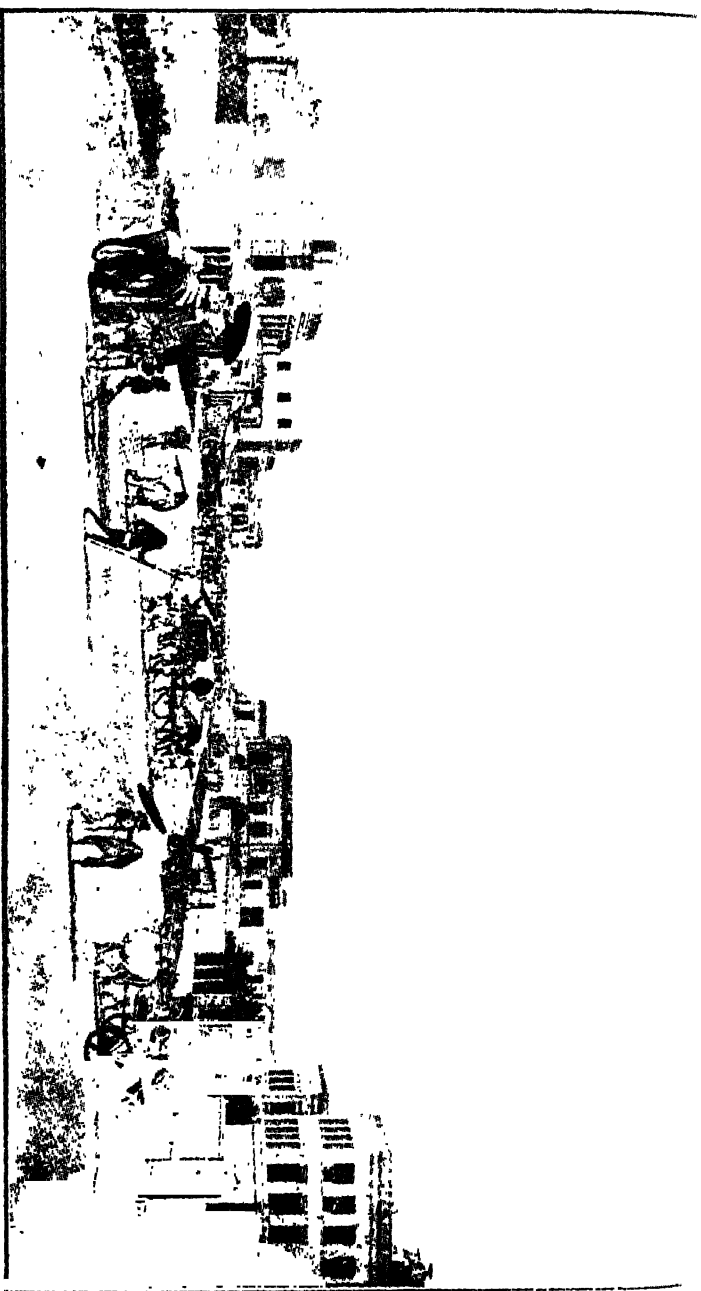
দেবার ও ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হাইড তাতে শান্ত হলেন না, একবার রেগে গেলে সহজে তাঁকে শান্ত করাও যেত না। খানসামার উপর তাঁর অনর্গল কটূবাক্যবর্ষণ চলতে থাকল।

তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেউ আর হাইড সাহেবের মুখে বাদামের কথা শোনেন নি। 'বাদাম' কথা উচ্চারণ করলেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। সামান্য পুডিং নিয়ে যে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না।

মু র্শি দা বা দে র রে সি ডে ণ্ট প ট॥ জুলাই মাসের দিকে (১৭৮৪ সন) এসপ্লানেড অঞ্চলে বেশ বড় একটি বাড়ি খালি পাওয়া গেল। খোলামেলা ও আলোবাতাসের দিক থেকে এরকম বাড়ি হঠাৎ পাওয়া কঠিন। অতএব আর দেরি না করে বাড়িটা ভাড়া করে ফেললাম। বাড়িটা পুরনো হলেও বাদশাহী ধরনের এবং কোর্ট হাউসের কাছে, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে এত সুন্দর বাড়ি তখন খুব কমই ছিল।

জুলাই মাসেই আমার বন্ধু রবার্ট পট খুব ভাল একটি চাকরি পেল। তখনকার দিনে কোম্পানির আমলের সবচেয়ে লোভনীয় চাকরি। বাংলার নবাবের দরবারে মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্ট (Resident) নিযুক্ত হল পট। বিরাট চাকরি, যেমন টাকা তেমনি মর্যাদা ও ক্ষমতা। নবাবের সমস্ত দেনাপাওনার টাকা, মাসহারা ইত্যাদি যা কিছু সব কোম্পানি তাঁদের মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্টের হাত দিয়ে পাঠান, এবং—'a considerable portion of it always stuck to his fingers'—সেই হাত দিয়ে নবাবের হাতে যাবার সময় তার বেশ খানিকটা অংশ রেসিডেন্টের হাতের দশ আঙুলে আটকে থাকে (অর্থাৎ হিকিসাহেব বলতে চান যে

নবাবের টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যাপারে রেসিডেণ্ট বেশ দু'পয়সা কমিশন পান)।

শুধু তাই নয়, রেসিডেণ্টের অর্থাগমের আরও একটি প্রশস্ত পথ ছিল, যা অনেকেই জানেন না। নবাব তাঁর ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য ইয়োরোপীয় পণ্যদ্রব্যাদি যথেষ্ট কেনাকাটা করতেন, এবং তার সম্পূর্ণ ভার থাকত সাহেব রেসিডেণ্টের উপর। তিনি যা বলতেন, যা পছন্দ করে দিতেন, তাই তিনি বিলিতী বাছাই মাল মনে করে পরম নিশ্চিন্তে কিনে ফেলতেন। কোন্ বিদেশী দ্রব্যের কি মূল্য, তাও এদেশী নবাবের জানবার কথা নয়, বিদেশী রেসিডেণ্ট জানতেন। অতএব সেদিক থেকেও যথেষ্ট অর্থ পকেটস্থ করার তাঁর সুযোগ ছিল। কেউ সে সুযোগ অবহেলা করেছেন বলে মনে হয় না।

পট যখন ইংলণ্ডে ছিল তখন লর্ড হাই-চ্যান্সেলর থার্লোর (Lord Thurlow) চেষ্টায় সে এই চাকরিটি কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছ থেকে যোগাড় করে। তখন কথা ছিল যে সেই বছরেই (১৭৮৩ বা ১৭৮৪) রেসিডেণ্ট স্যার জন ডয়িলি (Sir John D'oyly) কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, এবং রবার্ট পট মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হবে। কিন্তু ডয়িলি সুযোগ বুঝে শেষ কোপ মারতে ছাড়লেন না। পটের চাকরি পাওয়ার কথা শুনে তিনি জানালেন যে ইচ্ছা করলে এখনই অবসর না নিয়ে তিনি আরও দু-তিন বছর চাকরি করতে পারেন। জানাবার উদ্দেশ্য হল, পটের উপর চাপ দিয়ে, ঘাড় মটকে, বেশ কিছু টাকা আদায় করা। গরজ পটের, চাকরি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতে না পারলে হয়তো পরে ফস্‌কে যেতেও পারে, এবং চাকরিটাও যা-তা চাকরি নয়। পট তাই চট করে ডয়িলির টোপ্‌টি চোখ বুজে গিলে ফেলল।

বন্ধুবান্ধব আমরা সকলে তাকে নিষেধ করলাম, অনর্থক অর্থদণ্ড দিতে। কিন্তু চাকরির জন্য পট এত বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠল যে কারও কথা সে শুনল না। দু-দশ হাজার টাকা নয়, গুনে তিন লক্ষ সিক্কা টাকা ডয়িলির হাতে পট সমর্পণ করেছিল। তাতেও নাকি ডয়িলি মন্তব্য করেছিলেন যে দু'বছর আগে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বিনিময়ে যা ন্যায্য খেসারত তাঁর পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পান নি। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁর গৃহের পুরনো আসবাবপত্তরগুলিও পটের কিনে নেওয়া উচিত। দাম ডয়িলির এজেণ্টই ঠিক করে দেবেন। এজেণ্ট দাম ঠিক করলেন ৯০ হাজার টাকা। পট নগদ মূল্যে ডয়িলির মালপত্তরও কিনে নিল, যদিও তার অধিকাংশই তার কোন কাজে লাগে নি। সর্বসাকুল্যে পটের কাছ থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকা বিদায়-সেলামি নিয়ে ডয়িলি দয়া করে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের পদ থেকে যথাসময়ের বছর দুই আগে অবসর গ্রহণ করলেন।

মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্টের গদিতে বসবার সুযোগ পেয়ে পট ভারি খুশি হল, চার লক্ষ টাকা নগদ দক্ষিণার জন্য তার একটুও দুঃখ হল না। মহানন্দে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করে সে তাড়াতাড়ি আফজলবাগে তার বাড়িটি দখল করে বসল। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে প্রায় মাইল চার দূরে আফজলবাগ। রেসিডেণ্টের বাড়িটিও প্রাসাদতুল্য, গড়ন-পরিকল্পনাও অতি সুন্দর। কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি সুন্দর আমার বন্ধু পটের কল্পনা। সেই কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সে রেসিডেণ্টের পুরনো বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে আরম্ভ করল। কোথাও দু'খানা ছোট ঘর ভেঙে একখানা বড় ঘর করল, কোথাও নতুন বারান্দা করল, কোথাও বা নতুন সিঁড়ি। তাতে বাড়ির চেহারাই একেবারে বদলে গেল,

দেখলে মনে হয় যেন লাট-বেলাটের বাড়ি। বসবাসের ব্যাপারে দেখেছি, পটের বরাবরই একটা ব্যক্তিগত রুচি ছিল। তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। বর্ধমানেও একবার সে মাত্র কয়েক মাসের জন্য ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই বাড়ি ও আসবাবের ব্যাপারে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছিল।

এ ক টি বি চি ত্র দু র্ঘ ট না ॥ জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেক, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, এবং অধিকাংশই আমার ফিটনগাড়ি চালাতে গিয়ে। একদিন এক ডিনারের নেমন্তন্নে একটু বেশি মাত্রায় মদ্যপান করে ফেলেছিলাম। পা টলছিল, বেসামাল বোধ করছিলাম। ভোজ শেষ হবার পর, ক্যাপ্টেন বন্ধু মর্ডান্যাট বললেন, তাঁকে নিয়ে ফিটনে করে একটু বায়ু সেবন করাতে। সুরা-পানের পর বায়ু সেবন বেশ ভালই লাগে। আমিও তাই রাজী হলাম, এবং দুর্বুদ্ধির বশে নিজেই ফিটন হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুলাম। বল্‌গা হাতেই ধরা রইল, কিন্তু তাতে ঘোড়া দু'টির ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়নোর কোন বাধা হল না। পিঠে চাবুক পড়তে বেগ প্রায় বাতাসের গতি ধরল। চোখে তখন ক্ল্যারেটের রঙ ধরেছে, ফুর-ফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে, আর মনে হচ্ছে যেন দেবদূতদের মতন পুষ্পরথে করে স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছি। জানিও না কখন ঘোড়া দু'টি ফোর্টের দিকে বাঁক নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা ছিল ফোর্টের ভিতর দিয়ে যাবার। আমি নিজেই তাই শুনে ঘোড়ার মুখ কখন কেল্লার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি খেয়াল নেই। স্বর্গের বদলে যে আমরা ফোর্টের দিকে চলেছি, এবং দুরন্তবেগে, তাও হুঁশ নেই। ফোর্টের ভিতরে ঢোকার রাস্তাগুলি সরু সরু, জোরে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া কখনই উচিত নয়। সে চেতনা তখন আমাদের লুপ্তপ্রায়। সরু পথে ঘোড়া সবেগে ছুটেছে, ডান-বাঁ জ্ঞানও নেই। ফোর্টের

ভিতর থেকে আর একখানি গাড়ি আসছিল বাইরে। কিভাবে যে আমার ফিটন তার গা ঘেঁষে তীরবেগে বেরিয়ে গেল, এবং কেমন করে সামনাসামনি প্রচণ্ড সংঘর্ষে ধুলোয় গুঁড়িয়ে না গিয়ে তার পক্ষে এই ভেল্‌কি দেখানো সম্ভব হল, তা আমি জানি না, আমার ঘোড়ারা জানে। ধাক্কা যদি লাগত তা হলে ধরাধাম থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হত, শেলের মতন গাড়ির জোয়াল বিঁধত বুকে এবং তার ফলে হাড়-পাঁজর টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় উড়ত নিশ্চয়। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ফোর্টের ভিতর ঢুকলাম, গাড়ির বেগ না কমিয়ে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, ভাল করে পথও দেখছি না চোখে। এমন সময় একটা তীব্র গোঙানি শুনে চেয়ে দেখলাম, জনৈক গোরাসৈন্য আমার ফিটনের ধাক্কায় রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়েছে, এবং কি করব ভাবতে না ভাবতে নিমেষের মধ্যে ঘোড়া দু'টো ও গাড়ির চাকাগুলো তার দেহের উপর দিয়ে চলে গেল মনে হল। ফিটন থামাব কিনা ভাবছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন বললেন, "কি করছেন হিকিসাহেব? তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে কেটে পড়ুন, অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় নি। সৈনিকের দফা শেষ হয়ে গেছে, তার জন্য কোন চিন্তা নেই।"

বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। ভয়ে অবশ হয়ে বল্‌গা ছেড়ে দিলাম। ঘোড়া দৌড়ে ফোর্ট পার হয়ে গেল। বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনটা কিন্তু একেবারে দমে গেল। একটা নিরীহ লোককে এইভাবে বধ করলাম ভেবে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দ্বিতীয় দিন সকালে আমার বন্ধু ফোর্টের ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফোর্টের ভিতরে ঢোকার সময় পলাতক খুনী আসামীর মতন অপরাধী বোধ করছিলাম। ডাক্তার উইলসনের কাছে গিয়ে, এ-কথা সে-কথার

পর, জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, দু-একদিনের মধ্যে ফোর্টের ভিতরে কোন গাড়িচাপা-টাপার দুর্ঘটনা ঘটেছে কি ?” ডাক্তার বললেন, “দিন দুই আগে সন্ধ্যাবেলা একটি অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় রেজিমেণ্টের একটি সৈনিক কর্নেল হ্যাম্‌পটনের কোচগাড়িতে চাপা পড়েছে। মনে হয় গাড়ির জোয়ালে জোরে বুকে ধাক্কা লেগেছিল, কর্নেল বুঝতে পারেন নি বলে চলে গেছেন। সৈন্যটাকে আহত অবস্থায় ধরাধরি করে আমার কাছে নিয়ে আসতে, আমি তার অবস্থা দেখে ভাবলাম হয়তো টেঁসেই যাবে। কিন্তু খানিকটা রক্ত কেটে বার করে দেবার পর সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। এখন হাসপাতালে ভালই আছে, বোধ হয় কাল সকালেই ছাড়া পেয়ে যাবে।”

এই কথা বলে ডাক্তার উইলসন বললেন, “সৈন্যটি নিজের দোষেই চাপা পড়েছিল। মদ খেয়ে বেশ উন্মত্ত অবস্থায় সে রাস্তা দিয়ে চলছিল, আর কর্নেলের ঘোড়াও গিয়েছিল খেপে, তিনি সামলাতে পারেন নি। পলাশীর গেট দিয়ে নাকি তীব্র বেগে তাঁর গাড়ি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। সৈন্যটির ধারণা, কর্নেলের গাড়ি, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। অন্য কারও গাড়ি, এবং আরোহী চারজন নয়, দু'জন। তবে এই সময় সন্ধ্যাবেলা প্রায় কর্নেল হ্যাম্‌পটন গাড়ি করে ফোর্টের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলে সৈন্যটি তাঁর কথা বলেছে।”

আহত সৈন্যটি ভাল আছে ও সুস্থ হয়ে উঠছে শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নিজের অপরাধ স্বীকার করার সাহসও পেলাম অনেক। ডাক্তারকে বললাম, পূর্বাপর সব ঘটনার কাহিনী। শুনে তিনি আমার পলায়ন-কৌশলের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, “লোকটি সুস্থ হয়ে উঠলে, অনুগ্রহ করে একদিন যদি তাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, আমি

ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে কিছু টাকা দেব তা হলে।” উইলসন রাজী হলেন।

কয়েকদিন পরে সৈন্যটি এল আমার বাড়িতে, তার রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “আপনার ক্ষতিপূরণের উদার প্রস্তাবে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছি। তবে টাকাটা যদি সৈন্যটির হাতে না দিয়ে আপনি তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন তা হলে খুৰই ভাল হয়। সৈন্যটি এমনিতে খুব ভাল, সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু একটি মারাত্মক দোষ তার মদ্যপান। টাকা হাতে পেলে সে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। তার স্ত্রী অত্যন্ত পরিশ্রম করে চারটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, সংসার দেখছেন, এবং মুখ বুজে মাতাল স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করছেন। সেইজন্য আমার অনুরোধ, টাকাটা আপনি দয়া করে তার স্ত্রীর কাছেই পাঠিয়ে দেবেন।”

চিঠি পেয়ে আমি তাই করলাম, বেশ মোটা একটা টাকা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের নামে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তাকেও একেবারে খালি হাতে বিদায় করতে কষ্ট হল, দু’টি সোনার মোহর দিলাম তাকে। পরে খবর পেয়ে খুশি হলাম যে সৈন্যটি সেই মোহর দু’টি নিজে খরচ না করে তার স্ত্রীকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার স্ত্রী তাই দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র কিনেছিলেন।

৭

১৭৮৫ সনের এপ্রিল মাসে বেঞ্জামিন মী (Benjamin Mee) নামে আমার এক বন্ধু বিলেত থেকে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা লণ্ডন শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে'র অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। লণ্ডনে তিনি রীতিমত বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং অর্থের অপব্যয়ও করেছেন যথেষ্ট। তা ছাড়া, নানারকমের ফাটকাবাজিতেও অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। অবশেষে দেনার দায়ে পৈতৃক সম্পত্তির প্রায় অধিকাংশই তিনি পাওনাদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। বন্ধুবান্ধবরা তখন তাঁকে পরামর্শ দেন, ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভারতযাত্রা করতে। বাংলার সেনাবাহিনীতে একজন ক্যাডেটের চাকরি নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। উদ্দেশ্য যে চাকরি করা নয় তা বোঝাই যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষপুটে কোনরকমে একবার এদেশে পৌঁছে, স্বাধীনভাবে কিছু করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর ইংলণ্ডেই আলাপ হয়, এবং বন্ধুত্বও গভীর হয় দু'জনের মধ্যে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক॥ কলকাতা শহরে পৌঁছবার অল্পদিনের মধ্যেই বেঞ্জামিন ক্যাডেটের চাকরি ছেড়ে দেন এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কে অংশীদাররূপে যোগদান করেন। তখন ব্যাঙ্কের আরও দু'জন অংশীদার ছিলেন, জেকব রাইডার ও মেজর মেটকাফ, দু'জনেই

আমার বন্ধু। ব্যাঙ্কের ব্যবসা খুবই জমে উঠেছিল এবং লাভও হচ্ছিল যথেষ্ট। সারা এশিয়া মহাদেশের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোট চালু হয়েছিল বেশ, নগদ টাকার মতনই তার লেনদেন হত সর্বত্র। এত বেশি পরিমাণ টাকার নোট চলত ব্যাঙ্কের, যা তখনকার দিনে সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মানুষ সব সময় স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করে না, এমন কি নিজের মঙ্গল ও স্বার্থ কোথায় তাও বোঝে না। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অংশীদারদেরও তাই হল। তাঁরা দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, ব্যাঙ্কের উন্নতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে, নানারকমের বাণিজ্যের ও অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কতকগুলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে বাজারে তাঁদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হল, লোকের আস্থা ভেঙে গেল তাঁদের উপর। লোকের বিশ্বাস হারালে ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালানো যায় না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই তাঁদের ব্যাঙ্কের দ্রুত অবনতি শুরু হল, এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠানটি উঠেও গেল।

এই প্রসঙ্গে টমাস হেন্‌চম্যানের কথা মনে পড়ছে। বিলেত থেকে একই জাহাজে তিনি বেঞ্জামিনের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর মতন বুদ্ধিমান চালাক লোক তখন আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। বেশ কয়েক বছর তিনি বাংলাদেশে ছিলেন কোম্পানির কন্‌ট্র্যাক্টর হিসেবে,এবং ইয়োরোপের বাজারের জন্য পোশাক-কাপড় সরবরাহ করাই তাঁর কাজ ছিল। এই কন্‌ট্র্যাক্টরী করে তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে স্বদেশে ইংলণ্ডে তাঁকে ফিরে যেতে হল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। তিন বছর পরে তিনি আবার ফিরে এলেন কলকাতায়, কোম্পানির কন্‌ট্র্যাক্টর-রূপে নয়, মিলিটারী পে-মাস্টার-জেনারেলের বিরাট চাকরি নিয়ে। হেন্‌চম্যানের কৃতিত্ব কোনমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

মুর্শিদাবাদ যাত্রা॥ মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে আমার বন্ধুবর পট যে 'রেসিডেণ্ট' নিযুক্ত হয়েছিল, সে-কথা আগে বলেছি। বড় চাকরি পেয়েও পট যে তার অ্যাটর্নি বন্ধুর সুখদুঃখের কথা ভোলে নি তা বুঝলাম যখন দেখলাম যে সে মুর্শিদাবাদ থেকে খোঁজখবর করে একটি সুন্দর এদেশী মেয়ে আমাকে কলকাতায় উপঢৌকন পাঠিয়েছে, আমার নিজের ভোগের জন্য (হিকির ভাষায়, 'for my private use')। মেয়েটির নাম কিরণ (অর্থাৎ কিরণবালা)। কিরণবালার সঙ্গে প্রায় বছরখানেক মনের সুখে একত্রে বাস করার ফল হল একটি পুত্রসন্তান। মনে মনে আমি মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে সে আমারই সন্তান, যদিও তার ঘন কালো চুল ও কালো রঙ দেখে মনটা আমার আদৌ প্রসন্ন হয় নি। পুত্রের গায়ের ও চুলের রঙের কথা চিন্তা করে মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেত।

একদিন বাইরে থেকে বেড়িয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সময়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম, মাদাম কিরণবালা ঘরের মধ্যে বিছানার উপর আমার একজন খিদ্‌মৎগারকে জড়িয়ে ধরে দিব্বি শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। পাশে নবজাত সন্তানটিও গভীর ঘুমে মগ্ন। আমি সন্তর্পণে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছি, তাদের ঘুম ভাঙার কথা নয়। নিদ্রাভিভূত কিরণবালা ও খিদ্‌মৎগারকে ডাক দিতেই তারা উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভাবছিল, আমি স্বপ্নের ছায়ামূর্তি, না, বাস্তব কায়ামূর্তি! আমি অবশ্য একটুও বিচলিত হই নি। তাদের ঘুম ও বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর প্রশ্ন করে জানলাম যে কেবল আমি নই, আমার নোকর খিদ্‌মৎগারও কিরণবালার সঙ্গে সমানে এতদিন ধরে সহবাস করে এসেছে। নবজাত আবলুস কাঠের মতন পুত্রের জন্মরহস্যও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ভৃত্য ও কিরণবালা দু'জনকেই সন্তানসহ বিদায় করে

দিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু পরে যখন শুনলাম, কিরণ খুব দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, তখন তার জন্য একটা মাসহারার বন্দোবস্ত না করে পারলাম না।

মেজর রাসেল কয়েকমাস ধরে পেটের অসুখে ভুগছিলেন। কিছুতেই তাঁর অসুখ সারছে না দেখে ডাক্তাররা তাঁকে হাওয়াবদল করতে বললেন। রাসেল ঠিক করলেন, মুর্শিদাবাদে পটের কাছে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে যাবেন। আমাকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে যাবার জন্য অনুরোধ করতে আমিও রাজী হলাম। অনেকদিন শহর ছেড়ে বাইরে যাই নি, মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ যাওয়া স্থির হয়ে গেল। একটি ভাল পানসি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে ও পানীয়ে ভর্তি করা হল আমাদের মুর্শিদাবাদ সফরের জন্য। যাবার পথে নদীতীরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চললাম। পলাশী-গৃহ—এবং পলাশীর সেই ঐতিহাসিক রণাঙ্গন দেখলাম, যেখানে ক্লাইব সিরাজের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন করেছিলেন। কলকাতা থেকে নৌকোয় করে মুর্শিদাবাদ পৌঁছতে আটদিন সময় লাগল। পট থাকত আফজলবাগে কাশিমবাজারের নদীর তীরে, বহরমপুর সেনাবাস থেকে তিন মাইল এবং মুর্শিদাবাদ শহর থেকে দু'মাইল দূরে। এই মুর্শিদাবাদ শহরেই বাংলার নবাব তখনও বাস করতেন।

পট যে-বাড়িতে বাস করত তা রাজপ্রাসাদ বললেও ভুল হয় না। বাড়িতে তার আসবাবপত্তর যথেষ্ট ছিল, সবই রাজকীয় ইলের। পট থাকতও রাজার মতন। মেজর রাসেল ও সাদরে অভ্যর্থনা করে পট তার প্রাসাদে নিয়ে গেল। আমার জন্য প্রাসাদের একটা দিক আগে থেকে সাজিয়েগুছিয়ে সে ঠিক করে রেখেছিল। পরম আরাম-বিলাসে বসবাস করার

জন্য একজন মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন হতে পারে তার সবই সে ব্যবস্থা করেছিল। স্নানের জন্য ঠাণ্ডা-গরম জল থেকে আরম্ভ করে, এদেশে ভোগবিলাসের জন্য প্রয়োজন কোন সামগ্রীরই অভাব ছিল না।

পরদিন সকালে পটের সঙ্গে আমার বহরমপুর বেড়াতে যাওয়া স্থির হল। সকালে উঠে দেখলাম পটের প্রাসাদের বিশাল সোপানশ্রেণীর দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে সাজগোজ করে ভৃত্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন আমাদের তারা এদেশী কায়দায় সেলাম করতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রাঙ্গণে পৌঁছতে দেখলাম, একদল সুসজ্জিত অশ্বারোহী চমৎকার সব আরবী ঘোড়ার পিঠের উপর সুন্দর ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। তাদের কোমরের পাশে তলোয়ার ঝুলছে। সামনে আমাদের জন্য একটি বড় ফিটন প্রস্তুত ছিল। আমরা ফিটনে ওঠার সময় অশ্বারোহীরা তলোয়ার খুলে অভিনন্দন জানাল। এত সব চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার দেখতে অভ্যস্ত নই বলে পটকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব আবার কি?" পট হাসতে হাসতে বলল, "এরা আমার দেহ-রক্ষী, সংখ্যায় ষাটজন। আমি যখন কোথাও বেরুই তখন এরা এইভাবে হাজ্‌রে দেয়।" ফিটনে উঠে পট যখন ঘোড়ার লাগাম ধরল, তখন দু'জন অশ্বারোহী আগে দৌড়তে লাগল সামনে, এবং দশজন চলল পিছনে। এইভাবে রক্ষী-পরিবৃত হয়ে আমরা বহরমপুর পৌঁছলাম। সেনাবাসের অফিসাররা আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ইয়োরোপীয় ও দেশী সৈন্যদের ব্যারাক দেখালেন। বহরমপুরের অন্যান্য সরকারী অফিস-ঘরবাড়িও দেখলাম। আমার দু-চারজন পুরনো বন্ধু তখন এখানে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান মিস্টার কেলি ও মুর্শিদাবাদের কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট মিস্টার এডওয়ার্ড ফেনউইকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অতঃপর

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অন্যান্য পরিচিত বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আমাদের নামের একটি করে কার্ড রেখে এলাম। হঠাৎ খবর না দিয়ে আসার জন্য তাঁদের অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হল না। এইসব কাজ সারতেই বেলা বেড়ে গেল অনেক। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হল।

বেলা দু'টোর সময় খাবার টেবিলে আমরা প্রায় তিরিশজন খেতে বসলাম। নবাগত অতিথি মেজর রাসেল ও আমি ছাড়া, পটের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আরও কয়েকজন সেখানে থাকতেন। সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেকের বেড়াবার জন্য গাড়ি ঘোড়া মজুত থাকত, পটের জন্য থাকত আলাদা একটি ফিটন। আমি যাবার পর পট বাড়ির প্রত্যেক লোকজনকে আমার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে বলে দিয়েছিল, কারণ আমার যা পেশা তাতে বাইরে বেড়াবার অবকাশ খুব কম এবং কোন জায়গায় একবারের বেশি দু'বার আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দু'বেলা যাতে গাড়ি করে আমাকে এ-অঞ্চলের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়, তার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছিল পট। প্রতি-দিনের ভ্রমণ-তালিকাও সেইভাবে সে তৈরি করে দিয়েছিল। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলো যে কেমন করে কেটে যেত তা আমি টেরও পেতাম না।

অনেক জায়গার মধ্যে নবাবের প্রাসাদে বেড়াতে যাবার কথা স্বভাবতঃই বিশেষভাবে মনে আছে। যাবার আগের দিন পট নবাব-বাহাদুরকে খবর পাঠিয়েছিল যে সে তার বিশেষ অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে নিয়ে পরদিন সকালে তাঁর প্রাসাদে দেখা করতে যাবে এবং তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে। নির্দিষ্ট দিনে সকালে

যখন আমরা নবাব-প্রাসাদে পৌঁছলাম তখন নবাব আমাদের সাদর অভিনন্দন জানালেন এবং আপ্যায়ন করে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সাহেবী রুচি অনুযায়ী আমাদের জন্য ব্রেকফাস্টের চমৎকার আয়োজন করা হয়েছিল। খাওয়া শেষ হলে নবাব-বাহাদুর নিজে আমাদের তাঁর বিশাল প্রাসাদের সমস্ত মহল ঘুরে ঘুরে দেখালেন। প্রাসাদের সংলগ্ন তাঁর উদ্যান দেখলাম, গাড়িঘোড়ার আস্তাবলও দেখলাম। নবাবের জীবনযাত্রার এইসব বিচিত্র উপকরণ দেখে যে রীতিমত চমৎকৃত হয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য।

নবাবের প্রাসাদ থেকে আফজলবাগে ফিরে আসার সময় পথে একজন এদেশী সাধু দেখলাম। দেখে মনে হল সাধুটি খোঁড়া এবং পথের ধারে দাঁড়িয়ে পথিকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, কিন্তু তার ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গি অদ্ভুত। পথের ধারে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে সে চিৎকার তো করছেই, উপরন্তু যে-সব অঙ্গভঙ্গি করছে তাও ভয়ংকর। পাশ দিয়ে যাবার সময় পট সাধুটিকে লক্ষ্য করে একটি টাকা ছুঁড়ে দিল। আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম, সাধুটি টাকার দিকে চেয়েও দেখল না, ততোধিক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অনর্গল দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় কি যেন বকবক করতে লাগল। কণ্ঠস্বর ও প্রকাশভঙ্গি থেকে মনে হল, সাধু রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে কি বলছে। পটকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, সাধুটি নাকি অকথ্য ভাষায় আমাদেরই গালাগাল দিচ্ছে। পটের মতে তার কটূক্তির তাৎপর্য হচ্ছে এই—

"আরে হারামজাদা বিলেতি বাঁদর! দয়ার অবতার মনে করছ নিজেকে? তাচ্ছিল্য করে সাধুকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে টাকার গরম দেখাচ্ছ হা-রা-ম-জা-দা! আরে বিলেতি বাঁদর!

টাকার গরম কি দেখাচ্ছিস আমাকে! তাও বুঝতাম যদি অন্তত একশো টাকা ছুঁড়ে দিতিস। বিলেতি বাঁদর হয়ে তোরা রাজপ্রাসাদে থাকিস, আর সাধু হয়ে আমার মাথা গোঁজার স্থান নেই! শত শত ভৃত্য তোদের সেবা করে, আর কীটপতঙ্গ মাছির উপদ্রবে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি! ব্যাটা বাঁদর, বড় অহংকার হয়েছে তোদের! সামনে-পেছনে ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে, পথের ধুলো উড়িয়ে লোকজন তাড়িয়ে রথ হাঁকিয়ে চলেছিস! নবাব রে! আবার এত বড় স্পর্ধা হয়েছে যে যাবার সময় ব্রাহ্মণ-সাধুকে লক্ষ্য করে একটা ময়লা টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছিস? হারামজাদা বিলেতি বাঁদর, ভেবেছিস এইভাবে দান করে স্বর্গে যাবি? তা হবে না, সে পথ বন্ধ। জঘন্য নরকে যাবি তোরা, এবং সেখানে যমরাজ তোদের অন্যায় অত্যাচার ও পাপের জন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে চাবুক মেরে শায়েস্তা করবে।”

পটের এই ব্যাখ্যা শুনে আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “পথে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে এত কথা তুমি শুনলে কি করে, এবং যদি বা শুনেও থাক তা হলে এদেশী ভাষার অর্থ বুঝলে কি করে? সবটাই তোমার কল্পনা নয় তো?” উত্তরে পট বলল যে, সে বহুবার পথ চলতে এই সাধুকে দেখেছে, তার কথা শুনেছে, এবং গাড়ি থেকে নেমে সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে দোভাষীকে দিয়ে তার কটূক্তির অর্থ বুঝে নিয়েছে।

তিনদিন পরে নবাব-বাহাদুর সাড়ম্বরে পারিষদ-অনুচর পরিবৃত হয়ে আফজলবাগে পটের বাড়িতে এলেন সামাজিক শিষ্টতা রক্ষার জন্য। আমাদের তিনি নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। সেদিন রাতে সদলবলে আমরা নবাব-প্রাসাদে গিয়ে পর্যাপ্ত ভূরিভোজে আপ্যায়িত হলাম, এবং তার সঙ্গে চমৎকার আতস-বাজির উৎসবও দেখলাম।

অবশেষে একদিন অসংখ্য এদেশী বাঁদর দর্শনের পর আমার মুর্শিদাবাদ সফর শেষ হল। দশ-বিশটা বাঁদর নয়, কয়েকহাজার বাঁদর দেখলাম একসঙ্গে। তাদের ডেরা ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি নিভৃত আম্রকুঞ্জে। এ অঞ্চলের অনেক পর্যটক এই বানর-উপনিবেশ দেখতে আসতেন বলে তারা নর-সান্নিধ্যে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নরমূর্তি দেখে বানরের দল আদৌ বিচলিত হত না, বরং বেশ নিকট আত্মীয়বন্ধুর মত সোৎসাহে লেজ তুলে দর্শকদের কাছে এসে ঘিরে বসত, এবং হাত-পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করত। কিচির-মিচির শব্দ ও কুৎসিত মুখভঙ্গিমা করে একপাল বাঁদর কাছে আসতেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সঙ্গীরা আমাকে শান্ত করে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ওরা খাবার চাইছে। পট মধ্যে মধ্যে যখন বাঁদর দেখতে আসত তখন সঙ্গে করে প্রচুর পরিমাণে কেক মিষ্টি ও কলা নিয়ে আসত। বাঁদরগুলির হাবভাব দেখে মনে হল, সেদিনও যে আমরা এসব খাবার নিয়ে গেছি তা তারা জানে। কেক-মিষ্টি-কলা বিতরণ করার পর বাঁদরগুলি মহানন্দে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে লাফ দিয়ে আবার গাছের ডালে উঠে গেল।

পরের দিন এইভাবে আফজলবাগে কেটে গেল। আর থাকা চলে না, কলকাতায় ফিরতে হবে। মেজর রাসেল আরও কিছুদিন থাকবেন মনস্থ করলেন। পটের একখানি বগিগাড়িতে করে নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম। গাড়ি করে পলাশী-গৃহ পর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম, সেখানে বেয়ারারা পালকি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ি থেকে নেমে পালকিতে চড়লাম। অনেকে দেখেছি, বেশ স্বচ্ছন্দে পালকির মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারেন, আমি তা পারি না। পারতপক্ষে পথ

ওল্ড ফোর্ট স্ট্রীট—১৭৮৬

টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত

চলাচলের জন্য যতদূর সম্ভব আমি পালকি এড়িয়ে চলি। এক্ষেত্রে গত্যন্তর নেই বলে বাধ্য হয়ে পালকিতে চলতে হল। পালকি-বেয়ারারা সাধারণত ঘণ্টায় চার মাইল করে পথ চলে, সূর্যাস্তের পর ছায়া নামলে তার চেয়ে বেশিও যেতে পারে। দিনের বেলা রোদের তাপে পালকি বইতে তাদের খুবই কষ্ট হয়। পালকির পেছনে আরোহীর মালপত্তর নিয়ে কুলিরা দৌড়তে থাকে। পথ দীর্ঘ হলে স্বভাবতঃই একদল বেয়ারা আগাগোড়া পালকি বইতে পারে না। সমস্ত পথটা বিভিন্ন 'স্টেজে' বা পর্বে ভাগ করা থাকে, সাধারণত আট মাইল অন্তর এক-একটি পর্বের শেষ হয়। দুই পর্ব পর্যন্ত পথ চলার পর বেয়ারা-বদল হয়, অর্থাৎ একদল বেয়ারা ষোল মাইল পথ পালকি টানে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখন গ্রীষ্মকাল এবং গরমও এত বেশি যে হেঁটে পথ চলাই দুঃসাধ্য। তার উপর অধিকাংশ চলার পথই হল খোলা মাঠের বুকের উপর দিয়ে। যেদিকে চেয়ে দেখ সেদিকেই কেবল মাঠ আর মাঠ। ধুধু করছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, রোদের হল্‌কা ছুটছে মাটি দিয়ে, গাছপালা ঝোপঝাড় কিছুরই চিহ্ন নেই কোথাও। মাথার উপরে ঝকমকে নীল আকাশ, তার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতন সূর্য চারিদিক যেন ঝল্‌সে দিচ্ছে। বেয়ারা প্রায় আটক্রোশ পথ চলার পর রোদের ঝলসানিতে মুষড়ে পড়ল, কাতরস্বুরে বলল, "সাহেব, আর আমরা পালকি বইতে পারব না।" তাদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, আর এক পাও পালকি টানার ক্ষমতা নেই তাদের। অন্য একদল বেয়ারা তারা খোঁজ করল, কিন্তু গ্রাম কোথায় আর লোকই বা কোথায়? নেড়া মাঠের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পালকিতে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর অসহ্য গরমে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছটফট করছি, এমন সময় মাথায় এক মতলব খেলে গেল। এর মধ্যে বেয়ারাদেরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম

নেওয়া হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম কিছু বেশি পয়সা বকশিশ বা ঘুষ দেবার লোভ দেখালে হয়তো তারা উৎসাহিত হতে পারে। টাকাপয়সা, বিশেষ করে বকশিশ ও ঘুষ এমন জিনিস যে তাতে সব জাতের মানুষের উপর সমান ক্রিয়া হয়। এদেশে এসে এ অভিজ্ঞতা আরও বেশি করে লাভ করেছি। নির্জীব মানুষকে ঘুষ সজীব করে তোলে, অথর্ব ও পঙ্গুকে নতুন জীবনীশক্তি দান করে। ঘুষের জাদুস্পর্শে খোঁড়াও সোজা হয়ে দৌড়তে আরম্ভ করে। অতএব বেয়ারাদের কাছে বেশ লোভনীয় ঘুষের প্রস্তাব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল, বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পালকির বাঁট কাঁধে তুলে হনহন করে পথ চলতে লাগল। কিন্তু মানুষ তো, শক্তির সীমা আছে। ঘুষের মাদকতায় তারা মাত্র ছ'মাইল পথ পালকি বয়ে নিয়ে গেল। তারপর বিশাল এক জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, "আর পারব না।" তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, সূর্যের তাপে গোটা মাঠটা জ্বলন্ত চুল্লীর মতন গন্‌গন্ করছে। বহু কাকুতি-মিনতি করে ও টাকার লোভ দেখিয়েও আর কোন ফল হল না। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল, আর এক পাও চলতে তারা রাজী নয়। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কিছুক্ষণ কি যেন তারা আলাপ করল, তারপর আমাকে মাঠের মধ্যে ফেলে হঠাৎ এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করল যে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেকদিন হয়ে গেল এদেশে আছি, এ রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয় নি। সেদিন মনে হল, এই মাঠের মধ্যেই বোধ হয় আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মরতে হবে।

তাকিয়ে দেখলাম, শূন্য মাঠের উপর দিয়ে বেয়ারারা প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটা গাছের ঝোপের মতন কি

দেখা যাচ্ছে সেইদিকে। সেটা কোন্ দিক, পুব পশ্চিম, না উত্তর দক্ষিণ, এবং ঐ ঝোপটাই বা কিসের, কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না। মাথার ঘিলু রোদের তাপে গলে তরল হয়ে গেছে মনে হল। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে লাগল, মনে পড়ল ১৭৫৭ সনে কলকাতার অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী। সূর্যাস্তের পর ছায়া নামলে যে নিশ্চিন্ত হব তাও তখন ভাবতে পারছি না। কারণ আগেই শুনেছি, এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব ভয়ংকর, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে শিকারের সন্ধানে তারা বাইরে বেরোয়। দিনে রোদ এবং রাতে বাঘ, এই ভয়াবহ উভয়-সংকটের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লাম। একবার মনে হল রোদে পুড়ে মরার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া ভাল, আবার পরক্ষণেই বাঘের পেটে যাওয়ার আতঙ্কে শিউরে উঠে ভাবলাম রোদে দগ্ধে মরা অনেক ভাল। নানারকমের উগ্র চিন্তা ও কল্পনা কিলবিল করতে লাগল মাথার মধ্যে। শেষে ক্লান্ত হয়ে পালকির ভিতরে ঢুকে শুয়ে রইলাম।

ঘণ্টা দুই পালকির ভিতরে শুয়ে থাকার পর দূরে মনে হল কারা যেন এইদিকে আসছে। আরও কাছে এগিয়ে আসতে মনে হল, আমারই পালকি-বেয়ারারা। তারা আবার দল বেঁধে ফিরে আসছে। মনে একটু আশার সঞ্চার হল। ফিরে আসার পর তারা বলল, মাইল আড়াই-তিন দূরে একটা আমবাগান ও পুকুর আছে তারা জানত। দৌড়ে গিয়েছিল তারা সেই পুকুরে স্নান করার জন্য। তা না হলে এই গরমে আজ তাদের আধমরা হয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে হত। পুকুরে স্নান করে, আমগাছ থেকে আম পেড়ে খেয়ে, বাগানের ছায়ায় তারা ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে এসেছে। এখন তাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে, পূর্ণ উদ্যমে পালকি বইতেও তাদের আপত্তি নেই। এতক্ষণ পরে আমার দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটল।

পালকি চলল প্রান্তরের উপর দিয়ে। একটা গ্রামের কাছে পালকি আসতে থামতে বললাম বেয়ারাদের। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। একটা তরমুজ কিনলাম গ্রাম থেকে এবং তাই খেয়ে কোনরকমে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

বিকেল চারটে নাগাদ হুগলী পৌঁছলাম, কলকাতা থেকে মাইল তিরিশ দূরে। হুগলীতে আমার এক বন্ধু কিন্‌লক সাহেব থাকতেন। তাঁর বাড়িতে উঠে, একটু জলযোগ ও বিশ্রাম করে, কলকাতামুখো রওয়ানা হব ঠিক করলাম। বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, প্রায় তিনদিন হল বন্ধুটি আমার শিকার করতে বেরিয়েছেন, সপ্তাহান্তে ফিরবেন। তাঁর ভৃত্যরা সংবাদ দিল। আমার রোদে-পোড়া ক্লান্ত চেহারা দেখে খানসামা বুঝল যে আমি বিশ্রাম নিতে এসেছি। সে আমাকে বাড়ির ভিতরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম করতে অনুরোধ করল। তারপর খানসামাটি আমাকে আশ্বাস দিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আমার জন্য কিছু খানা তৈরি করে নিয়ে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে চমৎকার খানার সঙ্গে এক বোতল ক্ল্যারেট আনতেও ভুলল না। খানাপিনা শেষ করে মনে হল, বন্ধুর খানসামার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেছি খানসামাটি আমাকে সুন্দর একটি সাজানো শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে ঘুমুতে বলল, কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারলাম না। তাকে বললাম, আমাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে, তা না হলে কাজের ক্ষতি হবে, এবং বিশ্রাম নিয়েও স্বস্তি পাব না। সন্ধ্যা সাতটার সময় হুগলী থেকে পালকিতে রওয়ানা হয়ে রাত প্রায় দু'টোর সময় কলকাতায় পৌঁছলাম আমার বাড়িতে। বাড়ি পৌঁছেই সোজা ঘরে গিয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুম দিলাম। আমার মুর্শিদাবাদ সফরের কাহিনী এইখানে শেষ হল।

কর্নওয়ালিসের আগমন॥ ১৭৮৫ সনের আগস্ট মাসে দু'জন ভদ্রলোক কলকাতা এসে পৌঁছলেন ইংলণ্ড থেকে। একজন স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ডাক্তার জেম্‌স হেয়ার, আর একজন ব্যারিস্টার রবার্ট লেডলি। কলকাতায় দু'জনেই প্র্যাক্‌টিশ করতে এসেছেন, একজন ডাক্তারি, একজন ব্যারিস্টারি। দু'জনেই বিশিষ্ট গুণী ভদ্রলোক, কলকাতার সাহেব-সমাজে তাঁদের উপস্থিতিতে বেশ সাড়া জাগল।

আমি এই সময় কলকাতার "Bachelors' Club"-এর একজন সভ্য নির্বাচিত হয়েছি। নাম দেখেই বোঝা যায়, ক্লাবটি কেবল অবিবাহিত পুরুষদের জন্য। কেউ বিবাহ করলে তাঁকে সভ্যপদ ত্যাগ করতে হত। আমি যখন সভ্য নির্বাচিত হই, তখন ক্লাবের সভ্যসংখ্যা কুড়িজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধরনের ক্লাবের সভ্যপদ যে খুব বেশিদিন কেউ বজায় রাখতে পারতেন না তা বলাই বাহুল্য। ঘন ঘন ক্লাবের সভ্য বদল হত। অবিবাহিত সভ্যরা বিবাহ করে পদত্যাগ করতেন, আবার নতুন সভ্য নির্বাচিত হত। ক্লাবটি ছোট হলেও, কলকাতার সাহেব-সমাজে তার নামডাক ছিল খুব। প্রায় বিশ বছরের উপর ক্লাবটি টিকে ছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের (১৭৮৫ সন) গোড়ার দিকে লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতা এসে পৌঁছলেন, গবর্নর-জেনারেল ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, উভয় পদের দায়িত্ব নিয়ে। কর্নওয়ালিসের আগে আর কাউকে এই যুক্ত-পদের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। তাঁর সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে এলেন কর্নেল রস, এবং 'এডি' হয়ে এলেন দু'জন —ক্যাপ্টেন হলডেন ও ক্যাপ্টেন ম্যাডান। রস, হলডেন ও ম্যাডান তিনজনেই আমাদের অবিবাহিতদের ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত হলেন।

লর্ড কর্নওয়ালিসের উপস্থিতির কয়েকদিনের মধ্যেই উইলিয়ম

বার্ক তাঁর বাগানে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করলেন নবাগত গবর্নর-জেনারেলকে আপ্যায়ন করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। কর্নওয়ালিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সুযোগ হয় আমার এই ভোজসভায় তাঁর ভদ্র ও শিষ্ট আচরণে আমি মুগ্ধ হই। সুরাযোগে চর্বচোষ্য ভোজ খাওয়া রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত চলবার পর, কর্নওয়ালি শহরে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বার্ক তাঁবে অনুরোধ করলেন আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য, কিন্তু তিনি অনুনয়-বিনয় করে বললেন যে, খাদ্য ও পানীয় দুই-ই তিনি খু উপভোগ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেয়েছেন, আর কিছু খাবার ক্ষমতা নেই তাঁর। গৃহে ফিরে তাঁকে অনেক দরকারী কাজ সারতে হবে, এর বেশি পান-ভোজন করলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

মিস্টার বার্ক তাঁকে কোচে তুলে দিয়ে এলেন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল রসও ভোজটেবিল থেকে উ পড়েছিলেন, কিন্তু বার্ক তাঁকে ছাড়লেন না। কর্নওয়ালিস তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "যতক্ষণ খুশি বার্ক সাহেব আপনি মিস্টার রস ও অন্যান্যদের আটকে রাখুন। মিস্টার রসকে বসিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা খাওয়ান, আমার আপত্তি নেই।" এই কথা বলে তিনি কো হাঁকিয়ে চলে গেলেন। একাই গেলেন, সঙ্গে একজনও ভৃত্য চাপরাসী বা সিপাহী কেউ গেল না দেখলাম। শুনেছি, যতদিন কর্নওয়ালিস বাংলাদেশে ছিলেন, ততদিন তিনি কেবল সরকারি ব্যাপারে ছাড়া কোন ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যাপারে কখনও সিপাহী-ভৃত্য পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতেন না। যে-কোন সাধারণ সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের মতন বিনা আড়ম্বরে একাই তিনি চলাফেরা করতে ভালবাসতেন।

বার্কের বাগানবাড়িতে খানাপিনার অভিজ্ঞতার পর কর্নওয়ালিস মনস্থ করেন, বাইরে কারও বাড়িতে আর কোনদিন নিমন্ত্রণ খাবেন না। প্রত্যেকদিন তাঁর গৃহেই তিনি প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে ডিনার খেতেন। কেবল প্রথানুযায়ী বছরে একদিন চীফ জাস্টিসের বাড়ি, অথবা কোন সরকারী উৎসবে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। এ ছাড়া, বাড়ির বাইরে কখনও কোন খানাপিনার সভায় তিনি যেতেন না। তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল বলে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমিও তাঁর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম। নির্দিষ্ট সময়ে খানাটেবিলে বসা হত, গ্রীষ্মকালে বেলা চারটেয়, শীতকালে বেলা তিনটের সময়। গবর্নর-জেনারেল প্রায় দু' ঘণ্টা সময় খানাটেবিলে কাটাতেন এবং নিজে পানভোজন তদারক করতেন। টেবিলের উপর মদের বোতল হাতে হাতে ঘুরবে, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। কেউ যদি বোতল 'pass' করতে দেরি করতেন, অথবা তাতে ছিপি আঁটতে ভুলে যেতেন, তা হলে কর্নওয়ালিস খানাটেবিলে বসেই ঠাট্টা করে বেশ দু-কথা তাঁকে শুনিয়ে দিতেন। এইভাবে দু' ঘণ্টা ধরে প্রত্যহ নিমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে তাঁর গৃহে নিয়মিত ডিনার খাওয়া চলত।

তখনকার রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ক্রীসমাসের দিন গবর্নর-জেনারেল, তাঁর কৌন্সিলের সদস্যরা এবং কলকাতা শহরের গণ্যমান্য সাহেবসুবোরা সকলে কোর্টহাউসে একত্রে মিলে ডিনার খেতেন। রাতে মহিলারা 'সাপার' খেতেন এবং শেষে 'বল্‌নাচ' হত। সে-বছরেও ২৫ ডিসেম্বর ভোজের দিন ঠিক হল। লর্ড কর্নওয়ালিস এই পদ্ধতিতে ক্রীসমাস উৎসব পালনের বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এইভাবে নাচগানহল্লার মধ্যে ধর্মোৎসব পালন করলে তার কোন গাম্ভীর্য বা মর্যাদা রক্ষা করা হয় না।

কলকাতা শহরে ইংরেজরা যে ক্রীসমাস উৎসবকেও এই ভোগ-বিলাসের স্তরে নামিয়ে এনেছেন, এ দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর থেকে, প্রধানত কর্নওয়ালিসের জন্যই, ক্রীসমাস উৎসবের ধারা বদলে যায় কলকাতায়।

বা ণি জ্য - বো র্ডে র বি রু দ্ধে অ ভি যো গ॥ ১৭৮৬ সনের জানুয়ারি মাস থেকে কর্নওয়ালিস একটি অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রিয় কর্তব্য পালনে অগ্রণী হন। কোম্পানির সিনিয়র কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে ডিরেক্টররা তাঁকে তদন্ত করার আদেশ দিয়েছেন। অভিযোগ হল, তাঁরা পণ্যদ্রব্যের কন্‌ট্র্যাক্টের ব্যাপারে নিজেরা জড়িত থেকে, অথবা অনেক সময় বেনামীতে নিজেরাই কন্‌ট্র্যাক্ট নিয়ে কোম্পানিকে ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতেন 'বোর্ড অফ ট্রেড' (Board of Trade)। একজন প্রেসিডেণ্ট ও এগারজন সদস্য নিয়ে এই বাণিজ্য-বোর্ড গঠিত হত। কোম্পানির সিনিয়র কর্মচারীরা ক্রমিক পদোন্নতির ফলে বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করতেন। তাতে যে তাঁরা খুব প্রসন্ন বা কৃতার্থ হতেন তা নয়, কারণ পদোন্নতির ফলে তাঁদের কেবল সম্ভ্রম-মর্যাদাই বাড়ত, অধিক অর্থপ্রাপ্তি ঘটত না। বোর্ডের সদস্যদের মাসিক বেতন ছিল তখন ১১০০৲ সিক্কা টাকা। প্রত্যেকে প্রায় তার অনেক বেশি টাকা বাইরের ব্যবসা-বাণিজ্যাদি থেকে রোজগার করতেন। অতএব বোর্ডের সদস্য হবার পর তাঁরা সকলেই এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে নেন। ব্যবস্থাটা এইরকম—তাঁরা যাঁদের পণ্যদ্রব্যের কন্‌ট্র্যাক্ট পাইয়ে দেবেন, তাঁদের কাছ থেকে কমিশন নেবেন, অথবা নিজেরাই

গোপনে বেনামীতে কনট্র্যাক্ট নিয়ে মুনাফাটা আত্মসাৎ করবেন। এ কাজ তাঁরা নিঃসঙ্কোচেই করতেন, এবং এদেশের সমস্ত লোক তো বটেই, বিলেতের কোম্পানির ডিরেক্টররাও খুব ভালভাবেই তাঁদের এই অপকৌশলে অর্থোপার্জনের কথা জানতেন। তবু হঠাৎ ডিরেক্টররা কেন ক্রুদ্ধ হয়ে লর্ড কর্নওয়ালিসকে এই অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করতে বললেন তা বোঝা যায় না। তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন যে কোম্পানির কোন সিনিয়র কর্মচারী মাসিক ১১০০৲ টাকা বেতন পেয়ে বাংলাদেশে সমর্যাদায় দিনযাপন করতে পারেন না। অতএব যে-কোন উপায়ে হোক, বাড়তি টাকাটা তাঁদের রোজগার করতেই হয়। কেউ ঘুষ নেন, কেউ কমিশন নেন, কেউ বা গোপনে ব্যবসা করে মুনাফা করেন। তা না করলে, কেবল কোম্পানির মুনাফার তহবিল ভর্তি করলে, তাঁদের চলবে কেন? এতৎসত্ত্বেও কোম্পানির ডিরেক্টররা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের প্রতারণার অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দুঃখের বিষয়, এই অপ্রিয় কাজটা সম্পাদন করার ভার পড়েছিল কর্নওয়ালিসের উপর। তিনি গুপ্তচর-গোয়েন্দা লাগিয়ে বোর্ডের সদস্যদের কাজকর্ম ও গতিবিধির খোঁজখবর করতে লাগলেন। এ কথা নিশ্চয় বলব যে, এ কাজ গবর্নর-জেনারেলের যোগ্য কাজ নয়। তাঁর সময়ে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইলিয়ম বার্টন। বার্টনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হল। তাঁর পূর্বের দু'জন প্রেসিডেন্ট (দু'জনেই তখন ইংলণ্ডে ছিলেন) ডেভিস ও অলড্রাসিকেও (Aldrassey) একই অপরাধে অভিযুক্ত করা হল। এই তিনজন প্রেসিডেন্ট ছাড়া, মিস্টার রাইডার, মিস্টার রুক, মিস্টার বেটম্যান, মিস্টার কেইলি নামে চারজন বোর্ডের সদস্যের বিরুদ্ধেও অভিযোগ পেশ করা হল। মিস্টার টমাস ফ্লুকম্যান নামে

একজন কনট্র্যাক্টরও বোর্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত হলেন। কোম্পানির অ্যাটর্নি প্রত্যেক অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগের খসড়া ও প্রতারিত অর্থের বিল তৈরি করলেন। বিল তৈরি হতে না হতেই বিলেতের ডিরেক্টরদের কাছ থেকে কর্নওয়ালিস নতুন নির্দেশ পেলেন এই মর্মে যে, যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের যেন অবিলম্বে, আদালতের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ডের সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। অর্থাৎ আদালতের বিচারের আগেই ডিরেক্টররা নিজেরাই রায় দিয়ে দিলেন। কোম্পানির কয়েকজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট পুরাতন কর্মচারী এইভাবে রাতারাতি একেবারে অসহায় অবস্থায় পথে এসে দাঁড়ালেন।

এদিকে আমার বন্ধুবান্ধবরা এই সময় প্রতিদিন আমাকে অজস্র অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলেন। কলকাতার অন্যতম অ্যাটর্নি হিসেবে বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যের মামলা আমিই পরিচালনা করব এবং তার জন্য প্রচুর অর্থও পাব, এই তাঁদের উল্লাস ও অভিনন্দনের কারণ। অভিযুক্তদের মধ্যে আমার উপর মামলা পরিচালনার ভার দিলেন প্রেসিডেন্ট বার্টন, রাইডার, বেটম্যান, ফ্লুকম্যান ও কেইলি। সুতরাং কথাটা যে একেবারে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হয়ে রটেছিল তা নয়।

বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বার্টন প্রথমে খুব বুক ফুলিয়ে বললেন যে আদালতে তিনি এমন সব সত্য কথা প্রকাশ করবেন যাতে ডিরেক্টরদের অভিসন্ধি ফেঁসে যাবে এবং বিচারকরাও তাঁকে নির্দোষ বলে রায় দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু মামলা ওঠার কয়েকদিন আগে তিনি গোপনে খবর পেলেন যে সরকারপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে দলিলপ্রমাণসহ প্রতারণার এত তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে কোর্টে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। পরাজয় হলে তাঁর নামে প্রায় একলক্ষ

পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১৯-২০ লক্ষ টাকা) ডিক্রি হবে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ডাচদের আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে পালিয়ে গেলেন, এবং সেখানে কয়েকমাস আত্মগোপন করে থাকার পর ডাচ-জাহাজে করে ইয়োরোপ যাত্রা করলেন। বাকী জীবন আর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান নি। কোপেনহ্যাগেন শহরে ভূসম্পত্তি কিনে ওমরাহ হয়ে কিছুকাল বসবাস করার পর বার্টন দেহত্যাগ করেন। আমার একজন প্রধান মক্কেলের মামলা এইভাবে চুকে যায়।

মেসার্স বেটম্যান ও রাইডার কোর্টে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই অ্যাটর্নির টাকার বিল খানিকটা পরিমাণ কমিয়ে মেনে নেন। কিন্তু তাঁরা যে তাঁদের মনিব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতারণা করেছেন, এ কথা স্বীকার করেন না। উৎকোচ বা কমিশন যা তাঁরা কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে পেয়েছেন, তা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য বলেই তাঁরা মনে করেন। তার মধ্যে কোন অসাধু উদ্দেশ্য, অথবা কোম্পানিকে ঠকানোর ইচ্ছা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়ে তাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছেন। কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং খেসারতের কথা উঠলে তাঁরাই সেটা দাবি করতে পারেন। তাঁদের এই যুক্তি যে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত, কোম্পানির ডিরেক্টররা তা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তারপর বেটম্যান ও রাইডার দু'জনেই আবার তাঁদের আদেশে বোর্ডের সদস্যপদে পুনর্বহাল হন।

কোর্টে মিস্টার কেইলি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা লড়তে থাকেন। প্রায় পনের মাস কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে মামলা চালিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ডাক্তাররা তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। কেইলি ইংলণ্ডের কোর্টে মামলা চালাবার

অনুমতি চাইলে সরকার তা মঞ্জুর করেন। তিনি ইংলণ্ড চলে যান। যাবার সময় আমি তাঁকে আমার বাবা ও ভাইয়ের কাছে চিঠি দিয়ে দিই। বিলেতে কেইলির মামলা পরিচালনার ভার তাঁদের উপর পড়ে। আমার বাবাই ছিলেন বিলেতে কেইলির সলিসিটর। কিছুদিন পরে বাবার সঙ্গে কেইলির মামলাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়। অন্য অ্যাটর্নি তাঁর মামলার দায়িত্ব নেন। কয়েকবছর ধরে প্রচুর খরচ করে মামলা চালাবার পর কেইলি জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু দেনায় তিনি ডুবে যান। অবশেষে দেনার দায়ে তাঁকে কিছুদিন জেল খাটতেও হয়।

মিস্টার ফ্লুকম্যানই কেবল বাংলাদেশ থেকে দফায় দফায় তাঁর মামলা লড়েছিলেন। প্রত্যেক দফায় তিনি জয়ীও হয়েছিলেন। শেষে কেবল নিজের খরচা দিয়েই তাঁর মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ডিরেক্টররা তাঁকে কন্‌ট্র্যাক্টরীর কাজে পুনর্বহাল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হন নি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে-কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁদের কর্মচারীদের প্রতি এরকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাঁদের অধীনে কাজ তিনি করবেন না। কিছুদিন পরে ফ্লুকম্যান ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে 'কোর্ট অফ্ প্রোপ্রাইটার্সে' কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাজকর্মের ও নীতির তীব্র সমালোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রায় ষোল মাস ধরে সুপ্রিমকোর্টে এই মামলাগুলি চলে (১৭৮৬-৮৭) এবং তার ফলে আমার যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে তাতে নিজের দেনা প্রায় অর্ধেক শোধ করে ফেলি। কলকাতা শহরে নবাবী চালে জীবন কাটানোর ফলে দেনায় আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে ছিল। বাণিজ্য-বোর্ডের সদস্যদের মামলা পরিচালনা করে যে দু-পয়সা পেলাম তাতে দেনা অর্ধেক শোধ হল। বাকী অর্ধেকের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম না। কেবল দেনা নয়,

তার সুদের কথা ভাবলেও ভয় হত। শতকরা ১২ টাকা হারের কম সুদে টাকা ধার পাওয়া যেত না। ঘরভাড়া, চাকর-বাকর, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে আমার মাসিক সংসার-খরচ লাগত প্রায় চার হাজার টাকা, এবং কষ্টে চালালেও তিন হাজার টাকার কমে কুলোতে পারতাম না।

১৭৮৬ সনের বাকি দিনগুলি কোনরকমে কেটে গেল। আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়লাম, মধ্যে মধ্যে হিক্কার মতন হতে লাগল, বোধ হয় অত্যধিক স্বেচ্ছাচারিতার জন্য। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে। তার জন্য দু'টি ভাল ঘোড়া কিনলাম, তার মধ্যে একটি ভাল রেসের ঘোড়া, বহুবার বাজি জিতেছে। ঘোড়াটির নাম মোমাস, রিচার্ডসন নামে একজন খেলোয়াড়ের ঘোড়া। প্রায় ছ'মাস ধরে সপ্তাহে দু'দিন আমি নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালাম, তারপর আর দিন ও ঘণ্টা ধরে অত নিয়ম পালন করা সম্ভব হল না বলে ছেড়ে দিলাম। আমার আইরিশ অতিথি কার্টার ঘোড়ায় বেড়াতে খুব ভালবাসতেন এবং প্রত্যহ সকালে মোমাসকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। এরকম ভাল ঘোড়া তিনি নাকি আর কখন চড়েন নি।

বছরের শেষদিকে আমার এক বন্ধু হামফ্রে হোওয়ার্থ স্বদেশে ফিরে যাবেন ঠিক করলেন। আফিমের ঠিকাদারি করে অল্পদিনের মধ্যে তিনি ভাগ্য ফিরিয়ে নেন এবং প্রায় হাজার চল্লিশ পাউণ্ড উপার্জন করে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তার সদ্ব্যবহার করবেন মনস্থ করেন। এই সময় আমার এক বিশেষ বন্ধু হঠাৎ অসুখে মারা যান। তাঁর নাম হেনরি ভ্যান্সিটার্ট। সেদিন উইলিয়াম ডানকিনের বাড়িতে আমার মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ ছিল, যাবার পথে হেনরির বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁজ করে জানলাম তিনি খুবই অসুস্থ। সেইদিনই বিকেল পাঁচটা-ছটার সময় ফেরার

পথে তাঁর দরজায় এসে শুনলাম তিনি মারা গেছেন, এবং শুধু তাই নয়, আধঘণ্টা আগে তাঁর মৃতদেহ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা চুকে যেতে পারে ভাবতে পারি নি। ভ্যান্সিটার্টের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই ডানকিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তার অ্যালেন ও ফ্লেমিঙের ঐকান্তিক চেষ্টায় কোনরকমে বেঁচে উঠলেন। ডাক্তাররা তাঁকে অন্তত মাসখানেক মাস-দেড়েকের জন্য নদীপথে বেড়াতে উপদেশ দিলেন। সুযোগ পেয়ে আমিও তাঁদের সঙ্গী হলাম। পয়লা ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে আমরা যাত্রা করলাম।

নৌকা ভ্রমণ॥ ডাক্তার অ্যালেনও আমাদের সঙ্গী হলেন। খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্তের ভার দেওয়া হল স্টিফেন ক্যাসনের উপর। এদেশের লোকদের হালচাল আমার বিলক্ষণ জানা আছে বলে আমি পরামর্শ দিলাম যে বাবুর্চিদের নৌকা ও খানসামা-ভৃত্যদের নৌকা না ছাড়া পর্যন্ত আমাদের নৌকা যেন না ছাড়া হয়। কারণ ঐ নৌকা দু'টি চোখের সামনে না রাখলে খাওয়া-দাওয়ায় বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং জলপথে ভ্রমণের সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যেতে পারে। আমি ভুক্তভোগী বলে সাবধান করে দিলাম। কিন্তু মনে হল ক্যাসন সাহেব, যাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন আমার কথায় একটু ক্ষুব্ধ হলেন। আমাকে তিনি বললেন যে ঐ নৌকা দু'টিতে তিনি একটি করে হরকরা রেখেছেন, তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য। কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি পুনরায় তাঁদের সাবধান করে দিলাম, ক্যাসন তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সকাল দশটায় চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল এবং দক্ষিণে হাওয়ায় নৌকা বেশ জোরেই চলতে লাগল। বেলা

সাড়ে-এগারটার মধ্যে আমরা শ্রীরামপুর পার হয়ে গেলাম। ডানকিন জানালেন যে তাঁর বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদেরই পেয়েছে, তাঁর তো পাওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনি অসুখ থেকে উঠেছেন। এদিকে বেলাও দুপুর হয়েছে। কিন্তু খাবার কোথায়? কোথায় বা সেই বাবুর্চি-খানসামাদের নৌকা? নদীর উপর যতদূর চোখ যায় কোথাও তাদের দেখা যায় না। আমি বেগতিক দেখে শ্রীরামপুরে নৌকা বাঁধতে বললাম এবং প্রস্তাব করলাম হয় কিছু খাবার কেনা যাক, না হয় বাবুর্চিদের নৌকা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু আমার উপদেশ আবার উপেক্ষা করা হল। ক্যাসন বিরক্ত হয়ে বললেন, একটু ধৈর্য ধরুন মশাই, সব ঠিক হয়ে যাবে। অত ব্যস্ত হলে কি চলে? নৌকা বাঁধা হল না, যেমন চলছিল তেমনি দ্রুত চলতে লাগল, একে-একে চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ব্যাণ্ডেল সব পার হয়ে গেল। তার পর অনেক দূর পর্যন্ত নদীতীরে আর কোন শহর নেই। সেই নৌকা দু'টিরও কোন খোঁজ নেই।

খাবার জন্য পুরো একঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল, এবং বেলা দু'টোর মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবার কথা। বেলা তিনটে বেজে গেল, খাবারের নৌকার দেখা নেই। পেট সকলেরই জ্বলছে, ডানকিন সাহেবের প্রায় দাউ দাউ করে। এবারে ধৈর্যচ্যুত হয়ে তিনি ক্যাসনকে বেশ একটু ধমকই দিলেন। বললেন, আপনি নিজেই গোঁ ধরে চলছেন, কারও কথায় কর্ণপাত করছেন না, অথচ দেখা যাচ্ছে আপনার ধারণা কোনটাই ঠিক নয়। কিন্তু অভিযোগ বা ক্রোধ প্রকাশ করলে তো আর পেট ভরবে না! বেলা যখন পাঁচটা বেজে গেল, ডাক্তার অ্যালেন তখন বললেন যে কিঞ্চিত ঝোল জাতীয় খাদ্য পেলে যদি চলে তাহলে আমাদের সহগামী একটি ছোট বজরা থেকে তিনি কিছুটা অন্তত ডানকিনের

জন্য সংগ্রহ করে এনে দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, পাশে আলাদা বজরায় করে যাচ্ছিলেন ডাক্তারের স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ে। প্রস্তাব শুনে ডানকিন প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, যে-কোন খাদ্য পেলেই তিনি খুশি হবেন, 'কারি' বা যাই হোক। তাই শুনে ডাক্তার তাঁর বজরা থেকে খাদ্য নিয়ে এলেন, প্রচুর 'কারি', ভাত ও রুটি। আমরা সকলে হুমড়ি দিয়ে পড়ে তা গোগ্রাসে গিলে ফেললাম। ছ'টা বেজে গেল, সন্ধ্যা হল। রাত কাটাবার জন্য শুকসাগরে আমরা নৌকা বাঁধলাম।

রাত প্রায় ন'টার সময় ভৃত্যদের নৌকা এসে পৌঁছল। তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া চলছে তখন। কেউ হুঁকো, কেউ তামাক আনতে ভুলে গেছে। ডানকিন সাহেবের পরামাণিক নাকি তাদের আটকে রেখে ক্ষুরে শান দিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া ঘাটে ভৃত্যরা এসে ক্রমে জমা হলেও শেষে দেখা গেল নৌকার মাঝি আসে নি। এরকম ছোটখাট অনেক কারণের জন্য ঘাট থেকে নৌকা ছাড়তে তাদের প্রায় ঘণ্টা তিনেক দেরী হয়েছে। তা যে হবে আমি জানতাম। কারণ এই বাংলাদেশের লোকদের আমি দেখেছি, যখনই ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে হয় তখনই যেন তাদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। এইজন্যই আমি ঐ নৌকা দু'টি আগে ছাড়বার কথা বলেছিলাম। এই বিপর্যয়ের পর ডানকিন আমাকে ক্যাসনের বদলে ম্যানেজারী করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর শুধু একটি শর্ত হল যে প্রত্যহ সকালে ঘণ্টা দুই তাঁর খেলার সঙ্গী হতে হবে। কথা হল সেই সময় ডাক্তার অ্যালেন আমার কাজটুকু চালিয়ে নেবেন। তাই হল, আগেকার ব্যবস্থা বদলে গেল, এবং তার পর থেকে যথাসময়ে যথেষ্ট খাবার পাওয়ার আর কোন অসুবিধা হয় নি।

নদীপথে আরও আমরা এগিয়ে গেলাম, চড়ায় আটকে মধ্যে

মধ্যে বেশ বাধাও পেতে হল। কাশীমবাজারের নদীর মুখে আমাদের নৌকা এমন আটকাল এবং খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল যে দাঁড়ি-মাঝিরা প্রাণপণে টানাটানি করে হয়রান হয়েও নৌকা এক ইঞ্চি নড়াতে পারল না। শেষে অন্যান্য নৌকার দাঁড়িরা মিলে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঠেলাঠেলি করে নৌকাটিকে একটি খালে নিয়ে গিয়ে ফেলল। একটা গোটা দিনই আমাদের এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল। ন'দিনের দিন আমরা আফজলবাগে পৌঁছলাম। পৌঁছে আমার বন্ধু রবার্ট পটকে একটি চিঠি পাঠিয়ে খবর দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি পট নিজেই তার পঞ্চাশ-দাঁড়ি পান্‌সি নিয়ে আমাদের নৌকার কাছে এগিয়ে আসছে। আমাদের আসার খবর কাশীমবাজার থেকে নবাবের আমলারা গতকাল রাতেই তাদের কানে পৌঁছে দিয়েছিল। পটের অনুরোধে আমরা নামলাম এবং তারই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। দশদিন আমরা তার অতিথি হয়ে ছিলাম, তার নবাবী চালের খানাপিনায় অভ্যর্থনায় পরম নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে দিয়ে। তার মধ্যে দু'দিন কাশীমবাজার কুঠির 'কমার্সিয়াল চীফ' জেমস কেলি (James English Keighley) আমাদের ভূরিভোজনে আপ্যায়ন করেছিলেন। কুঠির প্রধান কর্মকর্তা হয়েও তিনি আলাদা রেশমের ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা করে-ছিলেন। পট ছিল নবাব-দরবারের 'রেসিডেন্ট', কাজেই ইংরেজ-রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে নবাবী বিলাসিতা তার শোভা পায়। কিন্তু কুঠির কমার্সিয়াল চীফ হয়েও কেলি পটের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে চলবার চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া একটা দিন ফেনউইক সাহেবের সঙ্গে (যাঁর গার্ডেনরীচের বাড়িতে মেলার বিবরণ আগে দিয়েছি) বেশ আনন্দেই কাটল, একদিন নবাবের আতিথ্যও গ্রহণ করতে হল, এবং আর একদিন কম্যাণ্ডিং অফিসার ডেভিড সাহেব আফজলবাগ থেকে মাইল দুই দূরে তাঁর গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ

করে নিয়ে গেলেন। এদিকে আমাদের কলকাতায় ফেরার সময় হয়ে এল। পয়লা মার্চ থেকে কোর্ট খুলবে, তার আগে সকলকেই পৌঁছতে হবে। আমাদের নৌকাযাত্রার উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে, ডানকিন বেশ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছেন। এখন আমরা স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারি। ১৯ ফেব্রুয়ারি আফজলবাগ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কাশীমবাজার অভিমুখে যাত্রা করলাম। দু'দিন কেলি সাহেবের অতিথি হয়ে কাশীমবাজারেও থাকতে হল, তাঁর মন রাখার জন্য। দু'দিনেই তিনি আতিথেয়তার চূড়ান্ত করলেন। ২১ তারিখে কলকাতার দিকে আমরা রওনা হলাম, পৌঁছলাম ২৭ তারিখে। একটি মাস বেশ চমৎকার কাটল।

ক ল কা তা র ঝ ড়॥ এই বছর নবেম্বর মাসের গোড়ায় (২ নবেম্বর ১৭৮৭) প্রচণ্ড ঝড় হয় কলকাতায়। সাধারণত এমন সময় তা হবার কথা নয়, কারণ বর্ষা শেষ হয়ে তখন শীতের হাওয়া বইতে থাকে। এবছর অবশ্য তা হয় নি, বর্ষা অতিরিক্ত দিন স্থায়ী হয়েছিল। সেদিন আমার কোর্টের কাজ ছিল অনেক, তাই একটু ভোরে উঠে আফিসঘরে কাজ করতে বসেছিলাম। সকাল সাতটা আন্দাজ বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি তো বৃষ্টি, একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি! তার সঙ্গে প্রচণ্ড দমকা হাওয়া, সাংঘাতিক ঝড়। যে বাড়িটায় আমি তখন বাস করতাম তা এত পুরনো ও জীর্ণ যে ঝড়ের দাপটে কাঁপতে থাকল, প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এই বুঝি মাথায় ধসে পড়ে। আমার অতিথি কার্টার সাহেব ভয়ে 'চাপা পড়লাম' বলে আর্তনাদ করতে লাগলেন। ঝড়ের মধ্যে আমাকে কোর্টে যেতে হল, না গিয়ে উপায় ছিল না বলে। বেয়ারারা অনেক কষ্টে পাল্কি বয়ে নিয়ে গেল, কয়েক গজ যেতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগল। কোর্ট থেকে নদীর উপর ঝড়ের

তাণ্ডবলীলা দেখলাম, বোট-নৌকাগুলি নিয়ে যেন খেলনার মতন ছিনিমিনি খেলছে। বড় বড় তিনচারশো টনের পোতগুলিও ঢেউয়ের আঘাতে ডুবুডুবু হয়েছে। হুগলী নদীর মতন এত ছোট নদীতে ঝড়ের তাণ্ডবে যে এরকম ভয়াবহ তরঙ্গ-বিক্ষোভ হতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে তা কখনই বিশ্বাস করতাম না।

প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হল। তারপর হঠাৎ সব থেমে গেল, কিন্তু মাথার উপরে নীল আকাশ ভেসে উঠল না। তর্জনগর্জন স্তব্ধ হল বটে, মেঘের আক্রোশ কাটল না। তামাটে রঙের মেঘ চারিদিক ছেয়ে রইল। আমরা কোর্টগৃহের ছাদের উপর গিয়ে চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নদীর উপর নৌকা-বজরা-পান্‌সি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেসে চলেছে, বড় বড় প্রায় আটখানা জাহাজ নোঙর উপড়ে পশ্চিমতীরে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে পুনরায় ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ হল। প্রায় চারঘণ্টা ধরে আবার ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত হল। কোর্টে বিশেষ কোন কাজ হল না। বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরলাম। দুপুরে কয়েকজন ভদ্রলোককে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু তিনজন ছাড়া আর কেউ বাড়ি থেকে বাইরে বেরুতে সাহস করেন নি। ফিরে দেখি আমার আইরিশ অতিথিটি ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে আছেন।

পরদিন সকালে নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠল এমন দীপ্ত ভঙ্গিতে যে তার দিকে চেয়ে আগের দিনের ঝড়বৃষ্টির কথা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। এরকম ঝড়ের অভিজ্ঞতা এদেশেও আমার কোনদিন হয় নি। ঝড়ে বহু লোকের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, আর কত লোক যে মারা গিয়েছিল তার ঠিক নেই। গাছপালা উপড়ে পড়ে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার চোদ্দ মাইল দক্ষিণে বারুইপুর পর্যন্ত টানা রাস্তার

দু'দিকে যে বড় বড় গাছের সারি ছিল তার গোটা ছ'য়েক ছাড়া একটিও খাড়া ছিল না।

জমাদারনী॥ কিছুদিনের মধ্যে আমার আইরিশ অতিথি কার্টার লিভারের অসুখে অত্যন্ত কাতর হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবেন মনস্থ করলেন। আমি তাঁর যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার বাসায় যখন তিনি থাকতেন তখন একটি সুন্দর হিন্দুস্থানী মেয়ে তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করত। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভাল এবং বেশ চালাক-চতুর। কাজেই কার্টার চলে যাবার পর মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সঙ্গে থাকবে কিনা। বেশ খুশি হয়েই সে তার সম্মতি জানাল এবং তারপর থেকে আমার সঙ্গেই সে বাস করতে লাগল। তার নাম ছিল 'জমাদারনী', আমার বন্ধুবান্ধবরাও ঐ নামে তাকে ডাকত। জমাদারনী হিন্দুস্থানী মেয়ে হলেও এদেশের মেয়েদের মতন আদৌ লাজুক ছিল না এবং বিদেশীদের দেখলে ঘোমটা দিয়ে সামনে থেকে পালিয়ে যেত না। তার এই সপ্রতিভ ভাবভঙ্গির জন্য আমার বন্ধুরা সকলেই তাকে খুব পছন্দ করতেন। খানাপিনার টেবিলে, এমনকি ভোজসভায় পর্যন্ত, স্বচ্ছন্দে সে মেলামেশা করতে পারত। অবশ্য খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে তার নিজের সংযত অভ্যাস ও রুচি কোনদিন সে ত্যাগ করে নি।

শিল্পী ড্যানিয়েল॥ এই সময় বাংলাদেশে দু'জন প্রতিভাবান শিল্পী আসেন। তাঁরা খুড়ো-ভাইপো ড্যানিয়েল। শিল্পকর্মে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিভার সমাদর করতে আমি কখন কুণ্ঠিত হই নি, ড্যানিয়েলদের ক্ষেত্রেও হলাম না। যথাসাধ্য শিল্পকর্মে তাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করলাম। তাঁদের ইচ্ছা

হল, কলকাতা শহরের কয়েকটি চিত্র আঁকবেন। আমি নিজে তাঁদের অগ্রিম গ্রাহক তো হলামই, কলকাতায় পরিচিত বন্ধুমহলেও তাঁদের বহু পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক করে দিলাম। শহরের বারো-খানি দৃশ্যচিত্র তাঁরা আঁকলেন, বারোটি মাস লাগল আঁকতে। এই তাঁদের এদেশের প্রথম শিল্পপ্রয়াস, অতএব পরবর্তীকালের ছবির মতন কলকাতা শহরের এই ছবিগুলির মধ্যে তাঁরা সেরকম শিল্পনৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি।

ম ন্ব ন্ত র ॥ ১৭৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ডানকিন ইয়োরোপ চলে যান। ১৭৮৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে জেরিমিয়া চার্চ নামে আমার এক অ্যাডভোকেট বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়। বন্ধু পট রেসিডেণ্টের চাকরি ছাড়ার পর বিবাহ করেন। পাত্রী কুমারী ক্রাটেনডেন, সম্পর্কে তাঁর বোন হলেও, দেখতে-শুনতে ও স্বভাবচরিত্রে চমৎকার মহিলা ছিলেন। ফিলিপ নামে একজন ব্যারিস্টার অসুস্থ হয়ে বিলেত চলে যান। তাঁর কাছে ড্যানিয়েলদের আঁকা কলকাতা শহরের বারোখানি দৃশ্যচিত্রের একটি সেট আমি আমার ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিই।

আমি যে বাড়িটায় বাস করতাম সেটা বহুদিনের পুরনো বাড়ি। সেদিনের প্রচণ্ড ঝড়ে তার ভিতরের পাঁজরাগুলো ঝরঝরে হয়ে গেছে মনে হল। বাড়িটায় বাস করা আর নিরাপদ নয় মনে করে আমি বাড়িওয়ালাকে জানিয়ে দিলাম যে মাসের শেষে বাড়ি ছেড়ে দেব। একথা শুনে তিনি একদিন আমার কাছে এসে বললেন যে আমার মতন একজন ভাল ভাড়াটে ছেড়ে দিতে তিনি অনিচ্ছুক। দরকার হলে তিনি বাড়ি ভেঙে ফেলে আমার ফরমায়েস মতন তৈরি করে দেবেন। এই প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম এবং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে তাঁর আর একখানি বাড়িতে উঠে গেলাম। যেদিন

গেলাম সেইদিনই দেখলাম তাঁর লোকজন পুরনো বাড়িটা ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

আগেকার ঝড়ের মতন এবছরেও চোখের সামনে একটা ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটতে দেখলাম। বাংলা বিহার জুড়ে এক মর্মান্তিক মন্বন্তর হল। দরিদ্র লোকদের দুঃখের আর সীমা রইল না। কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা চাঁদা তুলে যতদূর সম্ভব দুঃস্থদের সেবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক টাকা চাঁদা তোলা হয়েছিল, কারণ সেই টাকা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অন্নদান করা হত। ছ'টি বিভিন্ন স্টেশন থেকে খাদ্যদ্রব্য বিলি করার ব্যবস্থা হয়েছিল, চাল ডাল আটা ঘি ইত্যাদি। প্রত্যেক স্টেশনের বিলিব্যবস্থা তদারক করার জন্য দু'জন করে ইংরেজ উপস্থিত থাকতেন। প্রায় চারমাস ধরে এই সেবাকর্ম করার পর দেখা গেল যে দুঃস্থের সংখ্যা না কমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং শহরে দলে দলে এসে তারা জমা হচ্ছে। অবস্থা দেখে গবর্ণমেণ্ট বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, দানধ্যান ও খাদ্য বিতরণ একেবারে বন্ধ করে দেবার হুকুম দিলেন, চতুর্দিকে সেই মর্মে 'নোটিশ' টাঙিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও ভীড় কমল না। কলকাতা শহরের মধ্যে ও আশেপাশে বুভুক্ষু জনতার আর্তনাদ বাড়তে লাগল, পথঘাট সব ভর্তি হয়ে গেল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেই তাদের ক্ষুধার আর্তনাদ ও মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি শুনতে হত। কত মানুষ, শিশু ও নারী যে পথের উপর মরে পড়ে থাকত তার ঠিক নেই। মোটামুটি একটা হিসেব থেকে জানা যায় যে কয়েক সপ্তাহ ধরে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন করে বুভুক্ষু মারা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে কলকাতার মতন শহরে পথের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিলে তিলে এরা মৃত্যু বরণ করেছে নিঃশব্দে মুখ বুজে, কোন

অভিযোগ করে নি, প্রতিবাদ করে নি, দোকানপাট লুট করে নি, বাড়িঘরে হানা দেয় নি, এমনকি দরজায় দরজায় ঘুরে চেঁচিয়ে ভিক্ষে করে নি পর্যন্ত। এ বোধ হয় এই ভারতবর্ষের মতন দেশেই সম্ভব! এদেশের শান্তশিষ্ট নিরীহ অহিংস লোক কেবল অজানা এক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে ও নীরবে কিভাবে যে তিলে তিলে মৃত্যুও বরণ করতে পারে, তা এই মন্বন্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলে বোঝা যায়।

জমাদারনীর সঙ্গে হিকির সংসার॥ ১৭৯১ সনের কথা। গরম পড়তে আমার ব্যারিস্টার বন্ধু শ সাহেব বললেন যে মার্চ, এপ্রিল, মে এই তিন মাসের জন্য গার্ডেনরীচে একটি বাগানবাড়ি দু'জনে মিলে ভাড়া নেওয়া যাক। এই তিন মাস কলকাতা শহরের মধ্যে বাস করতে সত্যিই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কাজেই বন্ধুর প্রস্তাবে আপত্তি করলাম না। বেশ বড় একটি বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, একেবারে গার্ডেনরীচের একপ্রান্তে, কলকাতা থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে, নদীর খুব কাছাকাছি। বাড়িটি দোতালা, নিচের তলায় ন'খানা বড় বড় ঘর এবং চারখানা ছোট ঘর, দোতালায় দু'খানা বিশাল বড় বড় ঘর। উপরে চারখানা ঘর আমার জন্য ব্যবস্থা করে নিলাম, যাতে আমার জমাদারনী দাসি-পরিবৃতা হয়ে নিরিবিলিতে বাস করতে পারে। বাকি দু'খানা ঘর শ'কে দেওয়া হল, তার সিঁড়িও ছিল আলাদা। নিচে থাকল প্রশস্ত ভোজনকক্ষ, চা-ঘর, বিশাল ড্রয়িংরুম এবং বিলিয়ার্ডরুম। সিডন্সের তৈরি চমৎকার একটি বিলিয়ার্ড টেবল একহাজার সিক্কা টাকা দিয়ে কেনা হল। অন্যান্য ঘরগুলি বন্ধুবান্ধব ও অতিথিদের ব্যবহারের জন্য খালি রাখা হল। এক শনিবার আমরা গৃহ-প্রবেশের দিন ঠিক করলাম এবং বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর

ক্লারেট মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হল। অতিথিরা পানের নেশায় মশগুল হয়ে বললেন, বাড়িটার একটা নামকরণ করা উচিত। 'Sportsman's Hall', 'Bachelor's Hall', 'Savoir Vivre' এবং এরকম আরও বহু নাম প্রস্তাব করা হল। নাম নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কও হয়ে গেল। অবশেষে অধিকাংশ অতিথি 'The White Lion' নামটি পছন্দ করলেন এবং বাড়ির সেই নামই রাখা হল। শনি-রবিবারের প্রমোদান্তে সোমবার সকালে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম।

বাড়ি দেখে আমার জমাদারনী খুশিতে আটখানা হয়ে গেল এবং আহ্লাদ করে বললে যে ও-বাড়ি ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না। সুতরাং তার বসবাসের জন্য সেখানে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হল। আমার বন্ধু শ রাতে প্রায় সেখানে ফিরে যেতেন, তা না হলে তাঁর নাকি ঘুম হত না। আমি অবশ্য কলকাতাতেই থাকতাম কাজকর্মের জন্য, সপ্তাহ অন্তে শনিবার রাতে যেতাম এবং রবিবার থাকতাম। দিন পনের আন্দাজ থাকার পর জমাদারনীর অসুখ হল। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম এবং তাকে টাউনে নিয়ে এলাম। ডাক্তার হেয়ার রুগী দেখে বললেন যে ঐ অঞ্চলের জোলো হাওয়ার জন্য এরকম অসুখ প্রায়ই হয়ে থাকে। ডাক্তারের মুখ থেকে এই কথা শোনার পর জমাদারনী জিদ ধরে বসল যে ঐ বাড়িতে সে আর রাত কাটাবে না। আমারও কেমন ভয় হয়ে গেল, তারপর থেকে ঐ বাড়িতে রাত কাটাতে পারতাম না। দিনের বেলা বন্ধুবান্ধব নিয়ে যেতাম, রাত হলে টাউনে ফিরে আসতাম। তিন মাস কেটে যাবার পর বন্ধু শ হিসেব করে বুঝিয়ে দিলেন বাড়ির জন্য আমার ভাগে পাওনা হয়েছে ৭৩০১৲ সিক্কা টাকা।

জুন মাসের গোড়ার দিকে আমার জমাদারনী হঠাৎ বায়না ধরে

বসল যে তাকে নৌকায় করে নদীতে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে আমাকে কয়েকটা নৌকা ভাড়া করে তাকে নিয়ে নদীপথে ভ্রমণে বেরুতে হল। চুঁচূড়া পর্যন্ত যাবার পর আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না, কারণ গঙ্গার তীর থেকে চুঁচূড়া শহরের চেহারা দেখে জমাদারনী চক্ষু বড় বড় করে বললে, 'কী সুন্দর! আমি এখানেই থাকব, আর কোথাও যাব না।' ডাচদের উপনিবেশ চুঁচূড়া। ঘাটে নেমে শহরের মধ্যে একটি বাড়ি ঠিক করলাম, বেশ ভাল শুকনো খটখটে বাড়ি, ড্যাম্প নেই। এর আগেও ১৭৭৮ সনে আমি একবার চুঁচূড়ায় এসেছি। কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়, মাইল পঁচিশ-তিরিশ হবে। চুঁচূড়ার বাড়ি দেখে জমাদারনী খুশি হল। আমি বললাম, একটু রঙ্গ করে, গার্ডেনরীচের বাড়ি দেখেও তো খুশি হয়েছিলে। তার উত্তরে সে তার হিন্দুস্থানী মাতৃভাষায় বেশ কড়া সুরে জবাব দিলে: "হ্যাঁ ঠিক কথা, গার্ডেনরীচের 'হোয়াইট লায়ন' আমার বেশ ভাল লেগেছিল, ড্যাম্প লেগে অসুখ-বিসুখ না হলে নিশ্চয় সেখানে থাকতাম। এখানে তা হবে না, কারণ বাড়িঘরের দিকে চেয়ে দেখ কত শুকনো এবং গঙ্গার হাওয়াও কত ভাল। এই জায়গা ছেড়ে আমাকে আর কোথাও যেতে হবে না।" তার কথাই ঠিক হল, বাস্তবিকই জায়গাটা স্বাস্থ্যের দিক থেকে বেশ সয়ে গেল দেখলাম। গার্ডেনরীচের বাড়ির জন্য যে সব ফার্নিচার কেনা হয়েছিল সেগুলি নিজে কিনে নিয়ে চুঁচূড়ার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। শ চুঁচূড়ার বাড়িতেও আমার ভাগীদার হতে চাইলেন, কিন্তু আমি আর ঝঞ্ঝাটে যেতে রাজী হলাম না। আমি বললাম, মধ্যে মধ্যে আমার বাড়িতে অতিথি হবেন, আমি খুব খুশি হব।

গার্ডেনরীচের হোয়াইট লায়নের চেয়ে চুঁচূড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাড়ি দুইই বেশ স্বাস্থ্যকর মনে হল। অল্পদিনের

মধ্যেই জমাদারনীর স্বাস্থ্যের অপ্রত্যাশিত উন্নতি হল এবং আমারও হাঁপের অসুখ অনেকটা কমে গেল। কলকাতার চেয়ে চুঁচূড়াতে আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকত। প্রতিদিন সকালে সেখানে অনেকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম। সাধারণত প্রত্যেক শুক্রবার রাতে, বিশেষ করে চাঁদনী রাতে, চুঁচূড়ায় যেতাম, অথবা শনিবার ভোরে রওনা হয়ে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় পৌঁছতাম, আবার সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আসতাম। বন্ধুবান্ধব অন্তত একজন কেউ সঙ্গে থাকতেন, ছুটির সময় শ গিয়েও তিন চারদিন করে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে ডাচ সাহেবদের ভোজে নিমন্ত্রণ করতাম এবং তার জন্য, অর্থাৎ প্রচুর শ্যাম্পেন-বার্গাণ্ডিসহ সেই ভোজের জন্য, বিলক্ষণ অর্থব্যয় হত।

কলকাতা থেকে পল্‌তার মাঝামাঝি কক্সের বাংলো পর্যন্ত আমি আমার নিজের চ্যারিয়ট গাড়িতে করে যেতাম এবং সেখান থেকে হয় কোন সঙ্গীর গাড়িতে অথবা বগি-গাড়ি ভাড়া করে পলতা যেতাম। পলতার ফেরীঘাটে নৌকায় পার হতাম। ওপারে আমার ফিটন-গাড়ি বা বগিতে করে চুঁচূড়ায় যেতাম। প্রায় ন'মাইল পথ যেতে হত। কলকাতা থেকে এইভাবে চুঁচূড়া পৌঁছতে প্রায় চারঘণ্টা সময় লাগত। বন্ধুদের, বিশেষ করে জাহাজের বন্ধুদের দেখা পেলে, চুঁচূড়ায় নিয়ে গিয়ে প্রাণখুলে অভ্যর্থনা করতাম।

ক্রমে চুঁচূড়া স্থানটির প্রতি বেশ অনুরাগী হয়ে উঠলাম এবং স্থির করে ফেললাম সেখানেই বসবাস করব। জিনিসপত্তর যা কেনাকাটার বাকি ছিল সব কিনে ঘরদোর গুছিয়ে ফেললাম। নিজস্ব একটি বোট তৈরি করারও বাসনা হল, গঙ্গায় বেড়াবার জন্য। কাস্টম হাউসের একটি সুন্দর পান্‌সি ছিল, আমার পছন্দ মতন। কলকাতার বিখ্যাত বোট-ব্যবসায়ী গিলেট সাহেবকে এইজন্য

একদিন ডেকে পাঠালাম এবং বললাম আমাকে একটি পান্‌সি বানিয়ে দিতে। তিনি রাজী হলেন, তবে বললেন যে বাঙালী কারিগরদের দিয়ে নৌকার হাল ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস তৈরি করিয়ে নিতে। তাঁর কথা অনুযায়ী কাস্টম হাউসের কারিগর দিয়ে নৌকা তৈরি করানো হবে ঠিক হল। দ্রুতগামিতার জন্য নৌকা কাস্টম হাউস বোটের চেয়ে চার-ছয় ইঞ্চি সরু করা হবে স্থির হল। যথাসময়ে বোট যখন তৈরি হয়ে গেল তখন দেখলাম গিলেট সাহেব তাঁর কথা ঠিক রেখেছেন। বোটের গড়নটি এমন সুন্দর হয়েছিল যে নদীর উপর পাল্লা দিয়ে কেউ তার সঙ্গে চলতে পারত না। একমাত্র ডাকাতদের নৌকার কাছে হার মানতে হত। এদেশের ডাকাতদের নৌকা সাধারণত ৭০-৮০ ফুট লম্বা হত এবং অন্তত জন চল্লিশ দাঁড়ি থাকত তাতে। আমার বোটটি ছিল ৪৮ ফুট লম্বা, সাড়ে-চার ফুট চওড়া। নদীতে খুব ঢেউ থাকলে নৌকা বাইতে বেশ ভয় করত। বারোজন দাঁড়ি ও দু'জন মাঝি নিয়ে চোদ্দজন লোক লাগত আমার নৌকা বাইতে।

প্রথম যেদিন কলকাতায় নদীতে আমার বোট ভাসানো হয় সেদিন চাঁদপাল ঘাটে লোকের বেশ ভিড় হয়েছিল। সাহেবের নতুন বোট দেখার জন্য নয় শুধু, পোশাক-পরিচ্ছদ সজ্জিত দাঁড়ি-মাঝিদের দেখার জন্যও। প্রত্যেকের পরনে সাদা ট্রাউজার ও জ্যাকেট, মাথায় লাল ও সবুজ রঙের পাগড়ি এবং মাজায় বাহারে কোমরবন্ধ। আমি যতটুকু জানি, আমার আগে আর কোন ইংরেজ এরকম সুসজ্জিত দাঁড়ি-মাঝি নিয়ে গঙ্গায় নৌকাবিলাস করেন নি। লর্ড ওয়েলেসলি এই সব ব্যাপারে বিলাসিতার কিঞ্চিৎ বহর দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সে আরও কিছুদিন পরের কথা।

আমার বোট গঙ্গায় ভাসানোর পর গিলেট সাহেব লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের জন্য, হিন্দুস্থানী ও ইয়োরোপীয় কায়দার মিশ্রণে একটি

বড় ছাব্বিশ-দাঁড়ি বোট তৈরি করেন। কলকাতা থেকে বারাকপুরের বাগানবাড়িতে যাতায়াত করার জন্য এই বোট তৈরি করা হয়। গিলেট বললেন, আমার বোটের চেয়ে লাট সাহেবের বোট বেশি দ্রুতগামী হবে, কিন্তু পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলে দেখেছি আমার বোট লাটের বোটের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। বোট তৈরি হল বটে, কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণে আমার অজস্র অর্থব্যয় হতে থাকল। বোটের দাম পড়ল দু'হাজার সিক্কাটাকা, দাঁড়ি-মাঝির জন্য প্রতিমাসে টাকা পঁয়ষট্টির কিছু বেশি, এবং আজ এটা কাল সেটা পরশু মেরামত ইত্যাদির খাতে নিত্য বেশ কিছু। বোট-বিলাসিতার বোঝা বেশ দুঃসহ হয়ে উঠল।

৮

বাঙালী কেরানীর কথা॥ একজন বাঙালী কেরানী গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমার আফিসে কাজ করছেন। হঠাৎ তিনি নাটোরে কোম্পানির একজন সিবিল কর্মচারীর কাছ থেকে দ্বিগুণ বেতনে চাকরির প্রস্তাব পান। তাঁর এই পদোন্নতিতে আমার বাধা দেবার ইচ্ছা না থাকলেও, এরকম একজন ভদ্র ও বিশ্বস্ত কেরানীকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। নাটোরে যাবার বছর খানেক পরে তাঁর কাছ থেকে আমি একখানি চিঠি পাই। চিঠিখানা সাধারণ চিঠি নয়, গদ্যভাষায় লেখাও নয়, আগাগোড়া একটি দীর্ঘ কবিতা। এতদিন তিনি আমার এখানে কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর এই সুপ্ত কাব্যপ্রতিভার আমি কোন হদিসই পাই নি। আশ্চর্য! কবিতার মধ্যে তিনি তাঁর নতুন কর্মস্থল যা লিখেছেন তা আশাপ্রদ নয়। কবিতাটি এই :

I have sat down with great regret to begin Nattore
treatise,
The reader must be arrested in concern and surprise !
Natural quality of Spring is in a far distance,
Never freshes our temper southern breeze and flowers'
fragrance
Or repetition of parrots, nightingales, and warbling
magpies,
Here we meet agony by screeching of owls and pariah
dogs' cries !

Summer treats us very hard in its turn,
Scarcely can find air to exhale until sun dives in west
cavern
When tempests not only arises to destroy every straw
cottage,
Also occasions great conflagration to consume them
with rage;
The daylight makes everyone's face distorted,
And the eyes being ready to start from the head !
All habitations are sunk down in water by Autumn.
Terrible noise of thunders, clouds with rain drops that
fall down
Neither sun nor moon with all her starry train be
perceived,
The day or night being consequently undistinguished.
Winter generally occupies a greater part of the year,
The whole Spring is considered a part of it here !
No full moon can make her brightness half so visible
As an Assembly Room illuminated with wax candle !
We are indeed at the borders of habitable sphere,
Among wild people and savages, under Polar Star.

RAMRUTTON CHUCKERBUTTY.

এর ভাবার্থ করলে এই দাঁড়ায়:

মনের দুঃখে নাটোর-কাহিনী লিখতে বসেছি,
পাঠকরা তা শুনে হতবাক হবেন বিস্ময়ে !
বসন্তের পদধ্বনি কান পেতেও শোনা যায় না এখানে,
দক্ষিনে হাওয়ায় ফুলের গন্ধ ভেসে আসে না,
শোনা যায় না পাখির কাকলি,
কেবল পেচকের আর খেঁকী কুকুরের কর্কশ চিৎকার চারিদিকে !
এদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অভিনন্দনে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
সূর্যাস্তের পরে মলয়ের মন্দগতি মুক্তি,
অতঃপর ঝড় ওঠে যখন, পর্ণকুটীর ছিন্ন করে,

আর লক্‌লকে অগ্নিশিখায় গ্রামকে গ্রাম ছাই হয়ে যায় ;
"দিবালোকে ঝলসানো বিকৃত সব মুখ দেখি আশে পাশে,
চক্ষু কপালে বিস্ফারিত !
বর্ষান্তের শরতে ঘরবাড়ি জলমগ্ন।
যেমন বজ্রধ্বনি, তেমনি বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ধারায়,
চন্দ্র-সূর্য-তারা মেঘের আড়ালে লুকায়,
কিবা দিন কিবা রাত বোঝা নাহি যায়।
শীতেরই প্রভুত্ব বেশি গোটা সাল জুড়ে,
বসন্ত পশ্চাতে তার ভয়ে লেজ নাড়ে !
পূর্ণিমার রাতেও চাঁদ অর্ধ-জ্যোতির্ময়
মিটমিটে বাতি-জ্বালা ঘর মনে হয়।
এলাম কোথায় ? মনে মনে ভাবি
একি মনুষ্যলোকের প্রান্ত ? বর্বরের বাসভূমি ?

রামরতন চক্রবর্তী

আমার এই বাঙালী কেরানীর কবিতাটি সযত্নে রক্ষা করে এসেছি এতদিন, তাই পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

কলকাতার থিয়েটার॥ এই সময় কলকাতায় আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ফ্র্যান্সিস রাণ্ডেলের (Francis Randell) মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। রাণ্ডেলের অকালমৃত্যুতে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীরা সকলেই খুব মর্মাহত হন। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি, কারণ এরকম বন্ধু কদাচিৎ ভাগ্যের জোরে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার থিয়েটার-রসিকদের যে ক্ষতি হয় তা প্রায় অপূরণীয়। একটা কথা আছে, দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন একা আসে না, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসে। রাণ্ডেলের মৃত্যুর অল্পদিন পরে পোলার্ড নামে একজন প্রতিভাবান

অভিনেতা হঠাৎ এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। পোলার্ড কেবল অভিনয়েই দক্ষ ছিলেন যে তা নয়, তিনি খুব চমৎকার দৃশ্যপট আঁকতে পারতেন এবং সংগীত ও সুর রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই পেশাতে তাঁর অভাব মিটত না বলে তিনি কলকাতার 'জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি ব্যাঙ্কে বেশ ভাল মাইনের একটি চাকরি করতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের ব্যয়বাহুল্যের নেশা তাকেও পেয়ে বসল, যেমন অধিকাংশ বিদেশীকেই পেয়ে বসে। রোজগারের কথা ভুলে গিয়ে দু'হাতে তিনি টাকা ওড়াতে আরম্ভ করলেন। তার ফল যা হবার তাই হল। ব্যাঙ্ক থেকে বেশ বৃহৎ পরিমাণ টাকা তছরুপের দায়ে তিনি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়লেন। অপরাধের দণ্ডের ভয়ে শেষ পর্যন্ত হঠাৎ একদিন চুপিসাড়ে একটি আমেরিকান জাহাজে করে ফিলাডেলফিয়াতে পলায়ন করলেন। সেখানে পৌঁছবার কয়েক-দিনের মধ্যে অসুখে তাঁর মৃত্যু হল।

ঠিকাদারদের কথা॥ ঘটনাচক্রে এমন একটি বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয় এই সময় যে আমার বৈষয়িক পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর্থার মেয়ার নামে (Arthur Mair) আমার এক বন্ধু ছিলেন, Bucks Society-র সেক্রেটারি। ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁর অদম্য উদ্যম ছিল, 'স্পেকুলেট' করতে তিনি ভালবাসতেন। আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন ঐ একই গোত্রের, যত বড় বড় 'স্পেকুলেটিভ' ব্যবসার ফন্দিফিকির তাঁর মাথায় অনবরত পাক খেত। নামটি যদিও তাঁর টমাস কটন, তাহলেও ইংলণ্ডে corn-এর ব্যবসায়ে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে মার্কামারা 'ইনসল্‌ভেন্ট' হয়ে যান। অবশেষে ভাগ্যের পাশাখেলায় শেষ চাল চালার জন্য তিনি প্রাচ্যদেশ ভারতবর্ষে আসেন।

সাফোকের (Suffolk) লোক হওয়াতে লর্ড কর্নওয়ালিশ তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুবই প্রীতির চোখে দেখতেন। কাজেই ভাগ্য ফেরাবার সুযোগের অভাব তাঁর হয় নি। কর্নওয়ালিস নিজে ছিলেন তাঁর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। বিলেত থেকে আসার সময় তিনি এখানকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের জন্য বহু পরিচয়পত্রও সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাতেও তাঁর কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। বুককিপিং ও অঙ্কে তিনি বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন বলে এদেশে আসা মাত্রই বেশ মোটা বেতনে 'জেনারেল ব্যাঙ্কের' কেশিয়ার ও চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিযুক্ত হন। মেয়ার সাহেবেরও এখানকার বড় বড় লোকের সঙ্গে খুব খাতির ছিল, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কটন সাহেবের ব্যবসাক্ষেত্রে ভালই যোগসাজস হল। উভয়ে চেষ্টা করলে যত খুশি টাকাও যোগাড় করতে পারতেন। ব্যবসায়ে দু'জনে পার্টনার হয়ে কাজ করতে লাগলেন। সরকারী মহলে স্বয়ং কর্নওয়ালিসের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকায় প্রথমেই তাঁরা এমন তিনচারটি জিনিসের কণ্ট্রাক্ট পেলেন যাতে রাতারাতি প্রচুর মুনাফা করে ভাগ্য ফিরে যাবার সম্ভাবনা।

তখনকার কালে কোম্পানির সঙ্গে যাঁরা ঠিকাদারি ব্যবসা করতেন তাঁদের দু'টি জামিন দিয়ে একটি বণ্ডে সই করতে হত চুক্তির শর্ত পালন না করতে পারলে কণ্ট্র্যাক্টের টাকা অনুপাতে ঠিকাদাররা দণ্ডিত হতেন। কিন্তু জামিনের ব্যাপারটা কাগজে-কলমেই থাকত, কার্যক্ষেত্রে কোন ঠিকাদারের চুক্তিভঙ্গের জন্য কোন গ্যারান্টরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে শুনি নি। অথচ কোম্পানির ঠিকাদারদের পক্ষে চুক্তিভঙ্গ করা একটা স্বাভাবিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন। যাই হোক, মেসার্স মেয়ার ও কটন একবার একটা বাণিজ্যচুক্তির ব্যাপারে আমাকে জামিন হতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন

হয়ে পড়ে, কারণ তাঁদের অ্যাটর্নি হিসেবে আমি বহু টাকাও তখন রোজগার করতাম। বাধ্য হয়ে তাই তাঁদের পাঁচলক্ষ টাকারও বেশি একটি বণ্ডের জামিন হতে হল আমাকে। এঁরা তিনটি বড় জাহাজ কিনে ভাড়া খাটাতে আরম্ভ করলেন। মালয় উপকূলে ও চীনে এই জাহাজে মাল বহন করা হত। স্থানীয় একজন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে এঁরা গোপনে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের 'ইনভেস্টমেণ্ট' চালান দেওয়ারও ব্যবস্থা করে নেন। টাকা দাদন দিয়ে এদেশের তুলা ও রেশমের বস্ত্রাদি যা কেনা হত কোম্পানির আমলে তাকেই বলা হত 'ইনভেস্টমেণ্ট'। বছর তিনেক এইভাবে তাঁদের ব্যবসাবাণিজ্য চলার পর অর্থের ব্যাপারে তাঁরা বেশ জড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের আর্থিক দুর্গতি আরও বেড়ে গেল একটা বিপর্যয়ের জন্য। চীনগামী তাঁদের একটি জাহাজ হঠাৎ ঝড়ে ডুবে যায় এবং তার ফলে প্রায় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জিনিসও নষ্ট হয়ে যায়। এর পরেই এদেশের লোকের মুখে শুনতে পেলাম, বাজারে নাকি মেয়ার-কটনদের বিল শতকরা কুড়ি ভাগ কম দামে বিক্রি হচ্ছে। কথাটা রটতে না রটতেই কয়েকদিনের মধ্যে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপনে আমাকে খবর দিলেন যে মেয়াররা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন এবং যে-কোন মুহূর্তে তাঁরা ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করতে পারেন।

এই কথা শোনার পর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। আমার সহকর্মী বন্ধু জন শ-এর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, আর দেরী না করে কোর্টে একটি বিল দাখিল করে আসামীদের আটকে ফেলতে। একদিনের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে, তা না হলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে বলে তিনি সাবধান করে দিলেন। পরদিন সকাল দশটায় কোর্ট

খোলা মাত্রই একটি বিল ফাইল করে এফিডেভিট করলাম এবং স্যার উইলিয়াম ডানকিনের কাছ থেকে আসামীদের আটকাবার জন্য একটি হুকুমও বার করে নিলাম। বেলা এগারটার মধ্যে কটন ও মেয়ার দু'জনেই হাজতে বন্দী হলেন। জামিনে মুক্তির জন্য দু'জন ভদ্রলোকের নাম করেন তাঁরা, কিন্তু শেরিফ তা অগ্রাহ্য করেন। পরে ক্যাপটেন ফেনউইক ঐ দু'জনের সঙ্গে জামিন হতে রাজী হলে আসামীদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। ছাড়া পেয়ে দু'জন জামিন-দারের সঙ্গে তাঁরা ব্রিটিশ এলাকা ছেড়ে বাইরে উধাও হয়ে যান। শেষে ফেনউইক সাহেবকেই ধরে হাজতে আটকে রাখা হয়। ক্যাপটেন ফেনউইক এক বিচিত্র চরিত্রের লোক। তিনি আর্কটের নবাবের একটি জাহাজের কর্ণধার ছিলেন। জাহাজটি প্রত্যেক বছর এখান থেকে মক্কাযাত্রীদের তীর্থ করতে নিয়ে যেত, ক্যাপটেন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সেই অবকাশে মালপত্তর বোঝাই করে নিয়ে কিঞ্চিৎ বাণিজ্যও করে নিতেন। যাত্রীদের মক্কা দেখাও হত, ফেনউইকও কিছু পয়সা পেতেন, নবাব তো পেতেনই।

ফেনউইক স্বভাবতঃই আমার উপর খুব বিরক্ত হলেন এবং নানাভাবে কটূক্তি করে, ভয় দেখিয়ে আমাকে মেয়ার-কটনের পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই যখন কোন ফল হল না তখন তিনি নিজেই আমার পরিবর্তে পাঁচলক্ষ টাকার জামিন হবার প্রস্তাব করলেন। গবর্ণর-জেনারেলের সম্মতিক্রমে আমার বণ্ড বাতিল করে দেওয়া হল। একটা বিরাট দায় থেকে আমি রেহাই পেলাম।

মেসার্স কটন-মেয়ারের বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের জন্য বহুলোক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। এর কিছুদিন পরেই টমাস গ্রাহাম নামে বিখ্যাত বাণিজ্যকুঠির আর্থিক পতন হয় এবং হঠাৎ তাঁরা টাকা লেনদেন বন্ধ করে দেন। এই হাউসের অংশীদার টমাস গ্রাহাম

(Thomas Graham) কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান ছিলেন ; এঁর ভাই রবার্ট গ্রাহাম (Robert Graham) ছিলেন আর একজন অংশীদার, লণ্ডনের একটি বড় ব্যাঙ্কিং হাউসে কাজকর্ম শিখে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ; জন মুব্রে (John Moubray) ও উইলিয়াম স্কিরো (William Skirrow) নামে আরও দু'জন অংশীদার ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে বাণিজ্যশিক্ষা পেয়েছিলেন। এই হাউস দেউলিয়া হবার পর কোম্পানির ডিরেক্টররা বেশ ঘাবড়ে যান এবং এই মর্মে এক নির্দেশ পাঠান যে কোম্পানির সিবিল বা মিলিটারী কোন কর্মচারী কোন মার্কেণ্টাইল হাউসের সঙ্গে অংশীদাররূপে অথবা কোন বাণিজ্য সংক্রান্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে কদাচ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন না।

ব্যবসাক্ষেত্রে এই হাউসের সুনাম ছিল যথেষ্ট। এর খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। কতজনের কত সঞ্চিত মূলধন যে এই হাউসে খাটত তা বলা যায় না। টমাস গ্রাহাম দেউলিয়া হবার পর তাই এদেশে পাবলিক ক্রেডিটের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। অংশীদার-দের মধ্যে স্কিরো সাহেব অল্পদিনের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যান। মুব্রে ও রবার্ট গ্রাহাম হতাশায় মুশড়ে পড়ে ডাচ উপনিবেশ চুঁচূড়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানে অত্যধিক মদ্যপান করে মাস পনেরোর মধ্যে মারা যান। একেই বলে বিপর্যয়!

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক॥ এদিকে আমার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকল। আগেকার হাঁপের যন্ত্রণা থেকে ডাক্তারবদ্যি করেও মুক্তি পেলাম না। মনে হতে লাগল বোধ হয় বেশিদিন আর বাঁচব না। অতএব বিষয়সম্পত্তির উইল করে একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার অনুভব করলাম। আমার নিজের সম্পত্তি রক্ষার

জন্য যতটা নয়, মক্কেলদের দলিলপত্রের নিরাপত্তার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি। ১৭৯২ সনের জানুয়ারি মাসে একটি উইল করলাম আমার তিনজন বন্ধু বেঞ্জামিন মী, জন রাইডার ও ডেভিড রসের সামনে। বন্ধুরা সকলেই তখন বেশ সুস্থ সবল লোক ছিলেন, এবং আমি ছিলাম রুগ্ন ও জীর্ণদেহ। অথচ আজ তাঁরা সকলেই পরলোকে, কিন্তু আমি বেঁচে আছি, আমার শরীরও আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

এই সময় কলকাতার আর্থিক জগতে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটল, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bengal Bank) দেউলিয়া হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, হঠাৎ তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব মুশড়ে পড়লাম। ফ্র্যান্সিস মিউর (Francis Mure) কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি ইয়োরোপ চলে গেলেন। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হবার সময় দু'জন মাত্র অংশীদার ছিলেন, জেকব রাইডার (Jacob Rider) ও বেঞ্জামিন মী (Benjamin Mee)। এঁরা দু'জন কেবল যদি ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করতেন তাহলে নিজেরাও যেমন বিত্তশালী হতে পারতেন, প্রতিষ্ঠানেরও তেমনি সমৃদ্ধি হত। কিন্তু দুর্মতি তাঁদের, তা তাঁরা করেননি। তার বদলে নানারকম স্পেকুলেটিভ ব্যবসায়ের দিকে তাঁরা ঝুঁকে পড়লেন, টাকাপয়সা নির্বিচারে নিয়োগ করতে লাগলেন, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা হবার তাই হল। তাঁরা নিজেরা ডুবে গেলেন, ব্যাঙ্কটিও দেউলিয়া হল।

কলকাতার লটারি॥ ১৭৯৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় বড় একটি লটারির পরিকল্পনা করা হয় এবং লটারির কর্তারা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন।

যেদিন লটারির ড্রয়িং হবে তার আগের দিন পর্যন্ত অনেক টিকিট অবিক্রীত থেকে যায়। প্রস্তাব করা হয়, কমিশনাররা মিলে সেই টিকিটগুলি কিনে নেওয়া হোক। আমি আপত্তি করি, কিন্তু জন রিচার্ডসন নামে মাত্র একজন কমিশনার ছাড়া বাকী সকলে উৎসাহিত হয়ে প্রস্তাবের পক্ষে মত দেন। কাজেই মতামতের ভোটে আমরা হেরে যাই এবং বাধ্য হয়ে আমাদের টিকিট কেনার জন্য টাকা দিতে হয়। উৎসাহীরা আশা দেন যে এতগুলি টিকিট যখন কেনা হচ্ছে তখন ভাগ্যে আমাদের লটারির শিকে ছিঁড়বেই ছিঁড়বে। আমি অবশ্য কোনদিনই এরকম ভাগ্য ফেরাতে বিশ্বাসী নই। অবশেষে আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হল। লটারির ড্রইং হল, কিন্তু মার্জারদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না, অথচ প্রত্যেকের ভাগে টিকিটের জন্য দু'টি হাজার করে টাকা দিতে হল। জীবনে অনেক টাকা অপব্যয় করেছি, কোনদিন তার জন্য আফশোস করিনি। কিন্তু এই টাকাটা দিতে বেশ গায়ে লাগল। স্কচ ভাষায় রিচার্ডসন বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—'The De'il damn all your cursed *Looteries*'। একটি বগি-গাড়ি কিনবেন বলে ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, এখন তাঁর বগিও গেল, টাকাও গেল। তাঁর অবস্থা দেখে সত্যিই দুঃখ হল। কলকাতার লটারির এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সারাজীবন মনে রাখার মতন।

ক র্ন ও য়া লি স ও শো র॥ ফেব্রুয়ারি মাসের ছয় তারিখে (১৭৯৩) কলকাতার সিবিলিয়ানরা কর্নওয়ালিসকে মহাসমারোহে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, সেরিঙ্গাপত্তমের রণকীর্তির বার্ষিক উৎসবে। সামরিক কায়দায় সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লেফ্‌টন্যাণ্ট-কর্নেল হেনরি ফক্স কলক্র্যাফ্‌টের উপর। ইনি একটু

অধিক মাত্রায় কেতাদুরস্ত এবং সর্বদাই আতিশয্যের পক্ষপাতী। অভিনন্দন-উৎসবে খরচ হয়েছিল সাতহাজার পাউণ্ডেরও বেশি, অর্থাৎ প্রায় একলক্ষ টাকা। একরাত্রির আমোদের জন্য এটা খুব বাড়াবাড়ি নয় কি ?

এই মাসেই স্যার্ জন শোর (John Shore) কলকাতায় এসে পৌঁছলেন, কর্নওয়ালিস বিদায় নিলে তাঁর স্থান অধিকার করার জন্য। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি শুনলেন, কর্নওয়ালিসের ভারত ত্যাগ করতে এখনও কিছুদিন দেরী আছে।

জমাদারনী-সহ চুঁচূড়া বাস॥ এর মধ্যে আমার নিয়মিত চুঁচূড়া যাতায়াত বন্ধ হয়নি, কারণ আমার জমাদারনী চুঁচূড়া ছেড়ে আর অন্য কোথাও যায়নি। মধ্যে তার শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি বদলে, চিকিৎসা করে, অনেক কষ্টে আবার তাকে সুস্থ করে তুলেছি। এখন আবার সে দিব্যি গাট্টাগোট্টা হয়েছে এবং হাসিখুশি ভাবও ফিরে এসেছে।

১৭৯৪ সনের কথা। ডেপুটি-শেরিফের কাজকর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত বলে কিছুদিন চুঁচূড়ায় নিয়মিত যাতায়াত করতে পারতাম না। সপ্তাহ অন্তে অবশ্য একবার যেতেই হত জমাদারনীকে খুশি করার জন্য। শনিবার বিকেলে গিয়ে রবিবারটা সারাদিন থেকে কলকাতায় ফিরে আসতাম। আমার যাতায়াত কমে যাওয়াতে জমাদারনী বলল, এতবড় বাড়ি অনর্থক ভাড়া করে রাখার প্রয়োজন নেই, একটা ছোট বাড়ি হলেই তার চলে যাবে। কথাটা মন্দ নয় ভেবে শহরে ঢোকার মুখে নদীর পাড়ের উপর একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করলাম। বাড়ির ছাদের উপর নিজের খরচে একটি ছোট বাংলো তৈরি করে নিলাম, হাজারখানেক টাকার মধ্যে। সারা বাংলাদেশের মধ্যে এত সুন্দর বাংলো

তখন ছিল কিনা সন্দেহ, থাকলেও এত ঠাণ্ডা ঘর বোধ হয় কোথাও ছিল না। বাংলো দেখে জমাদারনীর আনন্দ আর ধরে না।

কলকাতায় আমি যে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম তার বাড়িওয়ালা ছিলেন একজন পর্তুগীজ, নাম রবার্টসন। বাড়ি অনুপাতে তিনি আমার কাছ থেকে অনেক বেশি ভাড়া নিচ্ছেন একথা বন্ধুরা আমাকে বহুবার বলেছেন। একদিন তাই রবার্টসনকে ডেকে ভাড়া কমাবার জন্য অনুরোধ করলাম। এতদিন মাসে সাড়ে-চারশো টাকা করে ভাড়া দিতাম, এখন পুরো চারশো করতে বললাম। গত এগার বছর ধরে এই বাড়িতে ভাড়া আছি, টাকা নিয়ে কোন গণ্ডগোল হয়নি কোনদিন। রবার্টসন স্বীকার করলেন, আমার মতন নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রলোক ভাড়াটে পাওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু তবু তিনি ভাড়া কমাতে রাজী হলেন না। বিশেষ করে, হালে বহু টাকা খরচ করে তিনি কেবল আমার সুবিধার জন্য বাড়ি মেরামত করেছেন, কাজেই এখন ভাড়া কমানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না তখন আমি চীফ জাস্টিস স্যার রবার্ট চেম্বার্সের শরণাপন্ন হলাম। প্রসিদ্ধ আর্কিটেক্ট টমাস লায়নের (Thomas Lyon) তৈরি চেম্বার্সের একটি অনুপম ম্যানসন ছিল কোর্ট-হাউসের ঠিক পিছনে। যেহেতু কোর্টেই আমার কাজকর্ম বেশি, তাই কোর্টের পাশে থাকলে আমার খুব সুবিধা হবে এই কথা চেম্বার্সকে জানালাম। মাসিক সাড়ে-চারশো টাকায় তিনি আমাকে বাড়িটি দিতে রাজি হলেন। পাঁচ বছরের জন্য আমি বাড়িটা লীজ নিলাম, নিজের খরচে মেরামত করার শর্তে। ১৭৯৪ সনের পয়লা এপ্রিল আমি নতুন বাড়িতে উঠে এলাম দেখে পুরনো বাড়িওয়ালা রবার্টসন হতাশ হলেন এবং শেষে তাঁর বাড়িটি মাসিক চারশো টাকা

ভাড়াতেই দিতে রাজী হলেন। কিন্তু তখন আর মত বদলাবার সময় ছিল না।

সপ্তাহখানেক নতুন বাড়িতে থাকার পর আমার মনে হল দক্ষিণদিকে টানা বারান্দা করে নিলে বাড়িটা চমৎকার হবে। দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করে একদিন একজন বাঙালী আর্কিটেক্টকে ডেকে বললাম খরচের হিসেবসহ একটি প্ল্যান করে দিতে। হিসেবটি স্যার রবার্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলাম যে যদি তিনি এই নতুন বারান্দা নির্মাণের অর্ধেক খরচ বহন করেন, বাকি অর্ধেক আমি করব। বিষয়টি ভাবতে তাঁর বেশ কয়েকদিন সময় কেটে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর নিজস্ব গুরুগম্ভীর ভাষায় ও ভঙ্গিতে তার একটা দীর্ঘ উত্তর দিলেন। তাতে কতরকম যুক্তির যে অবতারণা করলেন তার ঠিক নেই। আশ্চর্য হল, খরচের অর্ধেক দিতে তিনি রাজী হলেন বটে, কিন্তু আইনজ্ঞের মতন যুক্তির প্যাঁচ কষে জানিয়ে দিলেন যে হিসেবের অতিরিক্ত খরচ হলে সেটা আমাকেই সম্পূর্ণ বহন করতে হবে। কেবল এইটুকু বলেই যদি তিনি থামতেন তাহলেও ভাল হত। কিন্তু সহজে থামবার পাত্র তিনি নন। সুদীর্ঘ চিঠির মধ্যে তিনি এই ধরনের বাড়ির 'বারান্দা' থাকলে কি সুবিধা ও অসুবিধা হতে পারে সে সম্বন্ধে গবেষণা করে একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। তা পাঠ করে অর্থোদ্ধার করতে রীতিমত গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যেতে হয়। মোটকথা, বারান্দার সুবিধার চেয়ে যে অসুবিধাই বেশি এই তাঁর প্রতিপাদ্য বোঝা গেল। তৎসত্ত্বেও প্রায় চোদ্দ পৃষ্ঠা ধরে বক্তব্য নিবেদন করার পর শেষকালে তিনি লিখেছেন : "কিন্তু তবু হিকি সাহেব, আমার সমস্ত বক্তব্য নিবেদন করার পরেও একথা আমি স্বীকার করব, এবং অনেকেই স্বীকার করবেন, আপনার পরিকল্পিত বারান্দা তৈরি করা হলে বাড়িটা সত্যই সবদিক দিয়ে অনেক ভাল হবে।"

সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস সামান্য একটা বারান্দা নিয়ে যে এতদূর বেসামাল ও বিচলিত হতে পারেন ভাবা যায় না। তথাপি আসল ব্যাপারে তিনি যে প্রধান বিচারক হিসেবে আমার মতন অ্যাটর্নির চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণ, এ সত্য আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম তাঁর টাকার হিসেব থেকে। প্ল্যানে যে 'এস্টিমেট' দেওয়া হয়েছে তার বেশি খরচ হলে তা বহনের দায়িত্ব তাঁর নয়, আমার। বিচক্ষণ বিচারক বিলক্ষণ জানতেন যে কোন বিল্ডারের হিসেবই শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকে না, টানতে টানতে রবারের মতন বেড়ে যায়। ঝানু অ্যাটর্নি হয়েও একথা আমার চিঠিতে আমি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি অ্যাটর্নি, আর তিনি চীফ জাস্টিস। তাঁর অনুমানই সত্য হল। হিসেব ছিল ন'হাজার টাকার, কাজ শেষ হবার পর হল সাড়ে-দশহাজারের কিছু বেশি। চেম্বার্স চুক্তি অনুযায়ী দিলেন সাড়ে-চারহাজার টাকা, আর বাড়তি খরচ ধরে আমাকে দিতে হল ছ'হাজারের কিছু বেশি। আগে বারান্দার রেলিং ও রঙের খরচের কথা মনে পড়েনি, হিসেবেও ধরা হয়নি। তার জন্যই বাড়তি খরচটা লাগল এবং আমাকে তা একাই দিতে হল। বারান্দা তৈরি হবার পর বাড়ির চেহারা একেবারে পাল্টে গেল, সকলেই দেখে চমৎকৃত হলেন। একটা মনের মতন সুন্দর বাড়িতে বাস করতে পারব ভেবে আমারও খুব আনন্দ হল। বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ভাল ভাল আসবাবপত্তর দিয়ে সাজালাম।

এদিকে শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে আরম্ভ হল। ভাবলাম, হঠাৎ কিছু হবার আগে জমাদারনীর জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত। তার ইচ্ছা অনুযায়ী চুঁচূড়াতেই জায়গা কেনা স্থির হল। নদীর তীর থেকে শ'খানেক গজ দূরে জমি কিনলাম, ডাচ গবর্ণরের বাড়ির যে সুন্দর পার্ক তার পাশে।

যে বাঙালী আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক আমার কলকাতার বাড়ির বারান্দা তৈরি করেছিলেন তাঁকেই ডেকে এখানকার বাড়ির প্ল্যান করতে দিলাম। তিনি আমাকে তিনরকমের তিনটি নক্‌শা দিলেন, তার মধ্যে আমার কলকাতার বসতবাড়ির মতন যেটি সেইটি আমি গ্রহণ করলাম। আকারে বাড়িটি ছোট, কিন্তু তিনতলা। ১৭৯৬ সনের পয়লা জানুয়ারি বাড়ির ভিত প্রতিষ্ঠা হল এবং ১৫ জুন থেকে বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করলাম। এত শীঘ্র বাড়ির কাজ শেষ হয়ে যাবার কারণ, টাকা নিয়মিত সরবরাহ করার ফলে অনেক বেশি লোকজন লাগিয়ে আমিনদের পক্ষে কাজ করানো সম্ভব হয়েছিল। বাড়িটিও এত সুন্দর হয়েছিল যে চুঁচূড়ার লোকেরা তো বটেই, আমি নিজে দেখেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আর জমাদারনী যে কী খুশি হয়েছিল তা বলা যায় না। চুঁচূড়ার এই বাড়িটি তৈরি করতে এবং আসবাবপত্তর দিয়ে সাজাতে আমার চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়।

গৃহপ্রবেশের মাস দুই আগে এপ্রিল মাসে জমাদারনী আমাকে জানায় যে সে অন্তঃসত্ত্বা। আমাকে সে আশা দিয়ে বলে যে একটি 'ছোটা উইলিয়াম সাহেব' পয়দা হলে সে খুব খুশি হবে।

জ ন সা হে বে র বা ণি জ্য ॥ এদিকে আমার বন্ধু জন শ বেশ ভালভাবেই কাজকর্ম করতে করতে হঠাৎ দুর্বিপাকে পড়েন। নিজের পেশা থেকেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করছিলেন, কিন্তু লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তিনি আরও বেশি অর্থের জন্য ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁকেন, এবং সেটি ছোটখাট ব্যবসা নয়, বিরাট একটি ব্যবসা। পূর্ব-উপকূলে মশলাপাতির একচেটে ব্যবসাটিকে তিনি সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। এই ব্যবসাতে একমাত্র কোম্পানিরই অধিকার ছিল এবং অন্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ

ছিল। সেইজন্য জন সাহেবকে গোপনে এই ব্যবসা করতে হত এবং জাহাজের অধ্যক্ষরা তারই সুযোগ নিয়ে যদৃচ্ছা প্রতারণা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। ফ্রাশার্ড নামে এক ব্যক্তি তাঁকে এই ব্যবসায়ের বুদ্ধি দিয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। আর তাঁর ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন যোগান দিতেন নিমাইচরণ মল্লিক নামে এক অতিশয় বিত্তশালী বাঙালী ভদ্রলোক। মল্লিকের মতন বুদ্ধিমান চতুর ব্যক্তিও তখন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

ব্যবসা আরম্ভ করতে না করতেই জন তার সাফল্যের সম্ভাবনায় এত উৎসাহী হয়ে উঠলেন যে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তিনি সেকথা বলতে শুরু করলেন। যাঁরা এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদূর ভবিষ্যতে লক্ষপতি হবেন, এ বিশ্বাস তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গেল। তাঁর আশা সফল হত কি না তা বলা যায় না, যদি ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ না বেধে যেত। ডাচদের সঙ্গে এই বিরোধের ফলে পূর্বাঞ্চলের ডাচ দ্বীপগুলি ব্রিটিশ রণতরী দখল করে নেয়। এই সময় জনের মশলাপাতির কয়েকখানি মালবোঝাই জাহাজও আটক করা হয়। দু'বছর ধরে সেগুলি তিনি খালাস করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং তাঁর লক্ষপতি হবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। জন শ একেবারে নিঃসম্বল হয়ে যান।

জাস্টিস হাইডের মৃত্যু॥ সুপ্রিমকোর্ট ও কলকাতার সমাজে এই সময় একটা বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিল। জাস্টিস হাইড এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে চিকিৎসকরা তাঁর বাঁচার আশা নেই বলে রায় দিয়ে দিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ইংলণ্ড থেকে স্যার জেমস ওয়াটসন কলকাতায় এসে পৌঁছলেন, উইলিয়াম জোনসের মৃত্যুর পরে তাঁর বিচারকের শূন্যস্থান পূরণ

করার জন্য। জোনসের সঙ্গে ওয়াটসনের কোনদিক থেকেই তুলনা হয় না। তাঁকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গকবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এই কবিতাটি আমার বেশ ভাল লেগেছিল :

At Folly's freaks ofttimes surprized we stare,
A Banks succeeding to great Newton's chair !
Reynolds whom genius with the graces blest,
Succeeded by that sweet Hist'ry painter West,
Now comes the wildest freak that folly owns,
Viz., Sergeant Watson, post Sir William Jones !!!

তিন সপ্তাহ কলকাতায় আসার পর তিনি যে বাড়িতে ছিলেন সেটা বদল করে চৌরঙ্গীতে নতুন একটি বাড়ি কিনে উঠে গেলেন। দুঃখের বিষয়, গৃহান্তরিত হবার দু'একদিনের মধ্যেই তাঁকেও দেহান্তরিত হতে হল। বিপদটা ঘটল এইভাবে। প্রথম প্রথম এদেশে এসে অনেকেই দেখেছি বাহাদুরি দেখিয়ে সূর্যের তাপটাকে অগ্রাহ্য করতে চান। ওয়াটসনও তাই করেন। নতুন বাড়িতে আসবাবপত্তর সরাবার সময় তিনি নিজে রোদে দাঁড়িয়ে তদারক করেন। তার জন্য বেশ কয়েকঘণ্টা তাঁকে রৌদ্রদগ্ধ হতে হয়। পরের দিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় হঠাৎ তাঁর শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে এবং তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। খাবার টেবিলে না বসে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডাক্তার ডাকার সময় হয়নি। সুপ্রিমকোর্টের কর্মচারীরা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকেই পরদিন তাঁর শবযাত্রায় যোগদান করেন। কেবল গোঁয়াতুর্মির জন্য বিচারক ওয়াটসনের, বিচারের আসনে ভাল করে বসার আগেই, হঠাৎ-মৃত্যু হয়।

পরের মাসে জাস্টিস হাইড মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে সকলেই

মর্মাহত হন। এরকম উদারহৃদয় বিচক্ষণ বিচারক এদেশে খুব কমই এসেছেন। কত অসহায় দীনদরিদ্র লোককে তিনি যে টাকাপয়সা, খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে নিয়মিত সাহায্য করতেন তার ঠিক নেই। এ-হেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেও মরণাপন্ন অবস্থাতে তাঁরই এক সহযোগী বিচারকের অবিবেচনার জন্য যে কি অমানুষিক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল তা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ঘটনাটি এখানে তাই উল্লেখ করছি। যিনি তাঁর দুর্ভোগের কারণ হয়েছিলেন তাঁর নাম স্যার রবার্ট চেম্বার্স।

জাস্টিস চেম্বার্সের সংকীর্ণতা॥ কলকাতা শহরের ইয়োরোপীয় অঞ্চলে, অর্থাৎ চৌরঙ্গীপাড়ায়, প্রায় একশত বিঘা একটি জমির মালিকানা নিয়ে কয়েকমাস ধরে সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলছিল। এই জমিটাতে একটি বড় বাজার বসানো হয়েছিল, তাতে মাংসের দোকান থেকে নানারকমের পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল অনেক। বাজারটি বেশ ভাল চলত, এবং যাঁদের বাজার তাঁরা বেশ মোটা মুনাফা করতেন। বাজারের কাছাকাছি ইয়োরোপীয়দের ভাল ভাল বসতবাড়ি থাকার জন্য বাসিন্দারা অনেকে বাজার তুলে দেবার চেষ্টা করেন। জমির প্রকৃত মালিক যিনি, তাঁকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জোর করে উচ্ছেদ করে বাজার বসানো হয়েছিল বলে তিনিও বাসিন্দাদের পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু স্যার রবার্ট নিজে বাজারের অন্যতম অংশীদার বলে জোর করে বাজার বসানো হয় ও চালানো হতে থাকে। চেম্বার্সের এই স্বার্থের কথা সকলেই জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ মামলার প্রধান বিচারক হয়ে রীতিমত পক্ষপাতিত্ব করতে আরম্ভ করেন। মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, বিচার আর শেষ হয় না। চেম্বার্সই এই জের

টেনে চলতে থাকেন, কারণ তিনি জানতেন যে মামলার রায় দিলেই তাঁর সহযোগী বিচারক উইলিয়াম ডানকিন বিরোধিতা করবেন। অবশেষে অধৈর্য হয়ে অভিযোগকারীরা বলেন যে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি না করলে তাঁরা প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করবেন। চেম্বার্স তখন চীফ জাস্টিস। এ অবস্থায় রায় দিতে হবেই জেনে তিনি শুধু তাঁর সহযোগী ডানকিনের উপর ভরসা না করে জাস্টিস হাইডকে কোর্টে হাজির করার সিদ্ধান্ত করেন। হাইড তখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁর নড়াচড়া নিষেধ। তা সত্ত্বেও, প্রাণ হাতে নিয়ে তাঁকে কোর্টে উপস্থিত হতে হল, শুধু চেম্বার্সের খেয়ালের জন্য নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। চেম্বার্স ভাবলেন, হাইড তাঁকে সমর্থন করবেন, এবং তিনজন বিচারক থাকলে শুধু ডানকিনের মতভেদের জন্য চীফ জাস্টিস হিসেবে তাঁকে আর অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে না।

বিচারের দিন সুপ্রিমকোর্ট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। প্রধান বিচারপতির এই চারিত্রিক অধঃপতন ও স্বার্থের খেলা দেখে সকলের মন অশ্রদ্ধায় ভরে উঠল। মরণোন্মুখ হাইডকে তিনজন বন্ধু মিলে ধরাধরি করে কোর্টে নিয়ে এলেন এবং অনেক কষ্টে কোনরকমে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। যে-কোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে জেনেও তাঁকে কোর্টে আনা হয়েছে বলে আদালত-সুদ্ধু লোক যেমন ক্ষুব্ধ তেমনি ক্রুদ্ধ হল চেম্বার্সের উপর। চেম্বার্স এসে প্রধান বিচারপতির আসনে বসলেন এবং তাঁর স্বাভাবিক লঘু ভঙ্গিতে পাশে হাইডের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, "জাস্টিস হাইড দেখছি অসুস্থ। সেইজন্য প্রথমে আমি তাঁকেই মামলার রায় দিতে অনুরোধ করছি।" কোর্টের ভিতর থেকে এই কথা বলা মাত্রই তুমুল প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা গেল। এবারে চেম্বার্স নিজে হাইডকে অনুরোধ করলেন রায় দিতে। জাস্টিস ডানকিন

আপত্তি জানিয়ে বললেন যে এত অসুস্থ শরীর নিয়ে ব্রাদার হাইড কোর্টে এসেছেন, তাঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত, এখনই কথা বলতে দেওয়া অন্যায় হবে। কোন কথায় চেম্বার্স কর্ণপাত করলেন না। বাধ্য হয়ে হাইড কথা বলার চেষ্টা করলেন, এবং অতিকষ্টে দু'তিনটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ কথা বলে ক্লান্তিতে চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। প্রত্যেকে ভাবল তিনি বোধ হয় মারা গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু যাঁর জন্য ঘটল তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। হাইডকে বাড়ি পাঠানোর পর চেম্বার্স তাড়াতাড়ি মামলার রায় দিয়ে দিলেন এবং ডানকিন কিছু বলার আগেই তা রেকর্ড করবার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য, বাজারের পক্ষেই তিনি রায় দিলেন, তবে ডানকিনকে নিরস্ত করার চেষ্টা তাঁর সফল হল না। ডানকিন উঠে তাঁর বিপরীত রায় ঘোষণা করে বললেন, চেম্বার্সের সঙ্গে এই মামলার কোন বিষয়ে তিনি একমত নন। জাস্টিস হাইডের উপর এরকম জুলুম করার জন্যও তিনি চেম্বার্সের আচরণের কঠোর সমালোচনা করলেন।

জমাদারনীর মৃত্যু॥ এই বছর (১৭৯৬) আগস্ট মাসে আমার ব্যক্তিগত জীবনেও একটি দুর্ঘটনা ঘটল। আমার স্ত্রী শার্লতের মৃত্যুর পর এরকম ঘটনা আর ঘটেনি। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর জমাদারনীর শরীর বেশ ভালই ছিল, ক্রমে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল এবং আমিও তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম। ৩০ জুলাই তারিখে আমি তাকে চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় নিয়ে গেলাম প্রসবের সুবিধার জন্য। ডাক্তার হেয়ার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, যে-কোন সময় তার সন্তান-প্রসবের সম্ভাবনা আছে।

কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট—১৭৮৭ টমাস ড্যানিয়েল অঙ্কিত
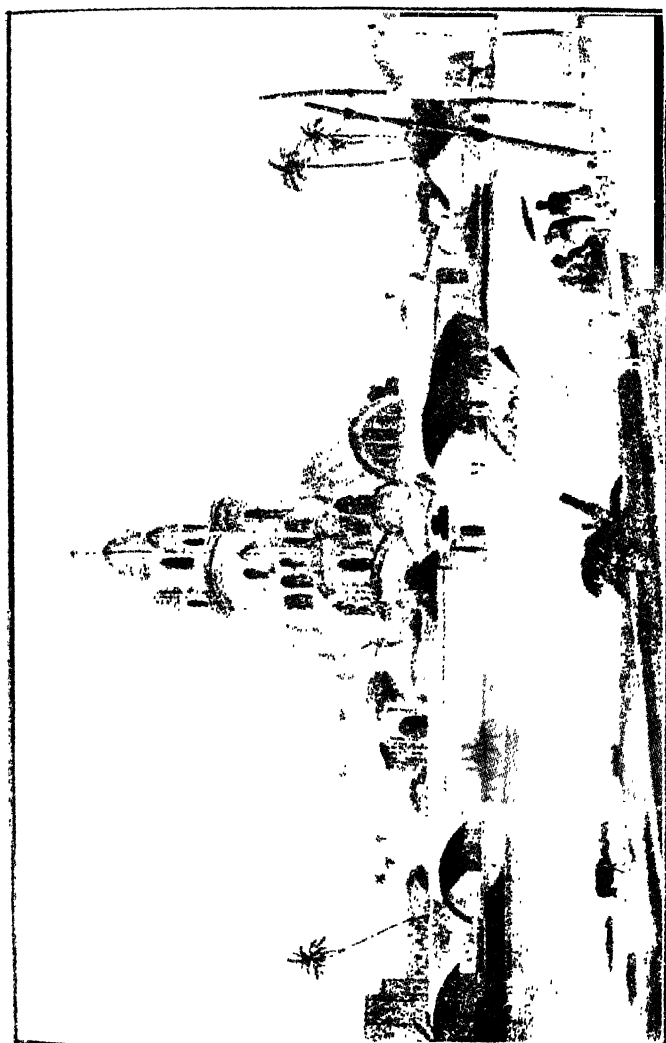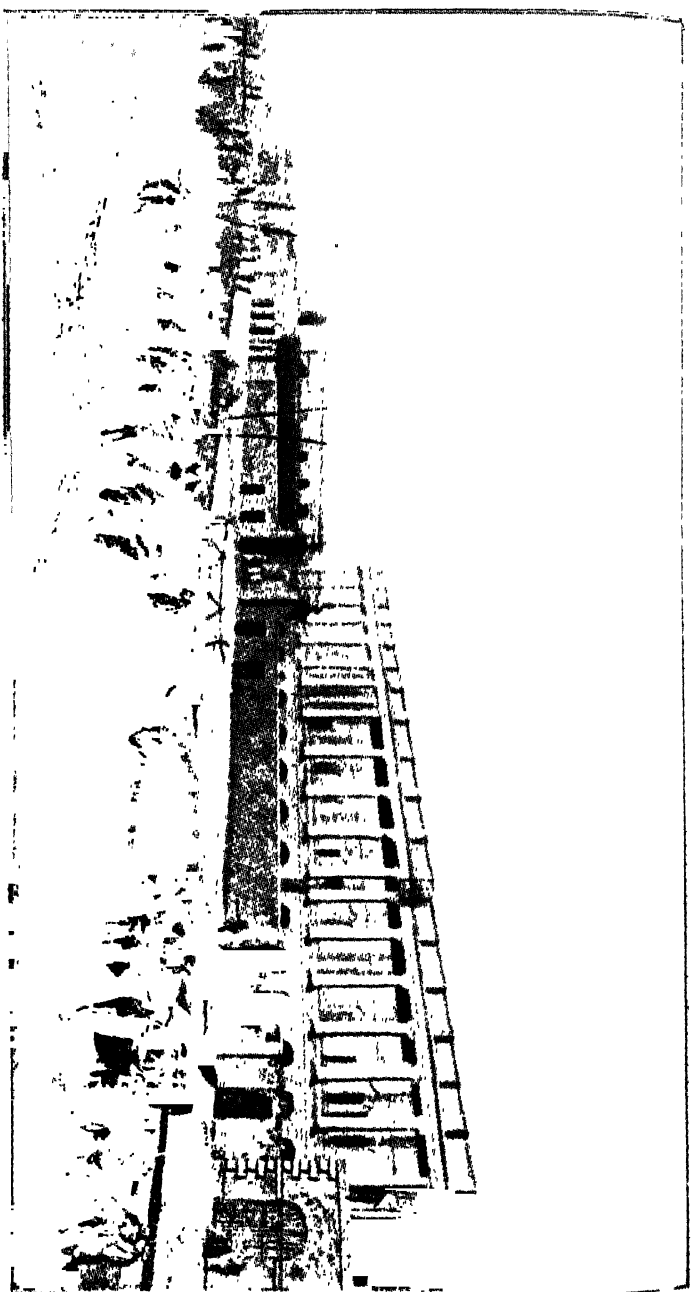
৪ আগস্ট তারিখে সকালে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খেলাম, জমাদারনী বেশ কথাবার্তা বলল, তার কোন উপসর্গ কিছু বুঝতে পারলাম না। সেদিন খুব জরুরী কাজ ছিল বলে কোর্টে আসতে হল। কোর্টে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভৃত্যরা এসে খবর দিল, বিবিসাহেব মৃত্যুর মুখে। তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলাম, জমাদারনী অচৈতন্য অবস্থায় দাঁতকপাটি লেগে সটান শুয়ে রয়েছে, এবং একটি সুন্দর পুত্রসন্তান হয়েছে তার। পাঁচ-মিনিটের মধ্যে ডাক্তার হেয়ার এলেন, প্রসূতির অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, এবং বেশ কড়া ওষুধ দিলেন খেতে। ওষুধ খেয়ে জমাদারনীর জ্ঞান ফিরে এল এবং আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল যে কোন ভয় নেই, সে ঠিক ভাল হয়ে উঠবে। ডাক্তারও তাই বললেন। কাজেই আমি কোর্টে ফিরে গেলাম। ফিরে যাওয়া মাত্রই আবার ভৃত্যরা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি জমাদারনী আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, ডাকাডাকিতে কোন সাড়া দিচ্ছে না। এবারে আর তার জ্ঞান ফিরল না, সেইদিনই রাত ন'টার সময় তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পরে খোঁজ করে জানলাম, এদেশী যে ধাত্রীকে প্রসব করানোর ভার দেওয়া হয়েছিল সে যমজ সন্তান হবে ভেবে প্রসবের পর জমাদারনীকে জোর করে ধরে চিৎ করে শুইয়ে রেখেছিল। তার ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে তার মৃত্যু হয়। হিন্দুস্থানের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে এরকম বুদ্ধিমতী, শান্তশিষ্ট অথচ সপ্রতিভ মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। তাই আমার বন্ধুবান্ধবরা সকলে তার মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।

ছোট শিশুটিকে নিয়ে আমার মহা সমস্যা হল। সমাধান করে দিলেন বন্ধুপত্নী শ্রীমতী টার্নার। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে অনেক, তাদের মধ্যে আর একটি বাড়লে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না বলে

তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন। শিশুটিকে তিনি নিয়ে গেলেন এবং একটি নার্স রেখে তাকে মানুষ করতে লাগলেন। ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বড় হচ্ছিল, কিন্তু ১৭৯৭ সনের মে মাসের গোড়ায় হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে মারা গেল। জমাদারনীর শেষ স্মৃতি-টুকুও নিশ্চিহ্ন হল।

৯

ওয়েলেসলির নবাবি ॥ লর্ড ওয়েলেসলি মারকুই ও ক্যাপটেন-জেনারেল উভয়ের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে এদেশে গবর্ণর-জেনারেল হলেন। মহীশূরে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি এই সম্মান অর্জন করেন।

ওয়েলেসলির মতন অকৃপণভাবে কোম্পানির অর্থব্যয় করতে আর কাউকে দেখা যায়নি। তাঁর আমলে লাটপ্রাসাদের ভৃত্য-বাহিনী যেমন বিশাল আকার ধারণ করল, তেমনি তাদের সাজপোষাকের বাহার ও বৈচিত্র্য সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। লাটবেলাটী করতে হলে যে এদেশের নবাবদেরও টেক্কা দিতে হবে, এ-সত্য তিনি যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, অর্থাৎ লিডেনহল স্ট্রীটের সিন্দুকরক্ষীরা। কেবল বিলাসিতার বহর দেখিয়ে তিনি ক্ষান্ত হলেন না, কলকাতা শহর ও তার চারিদিকের উন্নতির জন্যও তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। পরিপার্শ্বের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রথম কীর্তি হল, কলকাতা শহর বেষ্টন করে একটি ষাট ফুট চওড়া পাকা রাস্তা গঠন করা (সার্কুলার রোড)। কেবল হুগলী নদীর তীরবর্তী প্রায় আট মাইল পথ এই পরিকল্পনা থেকে বাদ রইল। এই রাস্তা তৈরি হবার ফলে শহরবাসীদের সুবিধা হল খুব, বিশেষ করে ইয়োরোপীয়দের ঘোড়ায় চড়ে চক্কোর দেওয়ার আর কোন অসুবিধা রইল না। তারপরেই লাটবাহাদুরের মনে হল, যে-প্রাসাদে তিনি বাস করেন

তা ঠিক লাটোপযুক্ত নয়, অতএব তার আশপাশের জায়গা-জমি দখল করে এবং লোকজনদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গেচুরে বিশাল চৌহদ্দির মধ্যে মধ্যমণির মতন অট্টালিকা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হল। লর্ডের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হতে দেরী হল না বেশি। চারিদিকের ঘরবাড়ি থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হল এবং সেগুলি নিশ্চিহ্ন করে খালি মাঠ করে ফেলা হল। বিশাল জায়গা ঘিরে চমৎকার উত্থান রচনা করে তার মধ্যে তৈরি করা হল নতুন লাটপ্রাসাদ।

লিডেনহল স্ট্রীটের ম্যানেজারদের অর্থের এই অপব্যয়েও তাঁর মনটা তেমন খুশি হল না। পরিকল্পনার বহর ক্রমেই তাঁর বাড়তে লাগল। তিনি ঠিক করলেন ফোর্ট উইলিয়ামের কোল থেকে একেবারে কলকাতার উত্তরসীমানা পর্যন্ত আগাগোড়া নদীর পাড়টি সলিড কংক্রীটে বাঁধিয়ে ফেলবেন। এই কংক্রীটের পাড়ের ধারে ধারে থাকবে বড় বড় মালগুদাম, কাস্টম হাউস এবং আরও অন্যান্য আফিস যা নদীতীরের কাছাকাছি থাকা উচিত। প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ এই শানবাঁধানো পাড়টির এই পরিকল্পনাও খসড়া করা হয়ে গেল।

কিন্তু এতেও লর্ডের তৃপ্তি হল না। তিনি ব্যারাকপুরে দ্বিতীয় একটি লাটপ্রাসাদ বানাবেন স্থির করলেন। তারও একটি বিরাট পরিকল্পনা খসড়া করা হল এবং সেটি সম্পূর্ণ বাস্তবে রূপ দেওয়া তাঁর লাটত্বকালে সম্ভব হবে না জেনেও তিনি অগ্রসর হলেন। ভবিষ্যতের বড়লাটরা যাতে অন্তত শহর থেকে দূরে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি মনোরম বাগানবাড়িতে বাস করার আরাম উপভোগ করতে পারেন, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করলেন। নামে বাগানবাড়ি বটে, কিন্তু কলকাতার লাটপ্রাসাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করা হবে তাকে স্থির হল। তাছাড়া অতিরিক্ত যা করা হল তাও কম নয়। বাগানের

মধ্যে একটি রঙ্গমঞ্চ এবং একটি বৃহৎ আস্তাবল তৈরি করা হল। দেশ-বিদেশ থেকে বাছাই করে উৎকৃষ্ট সব ঘোড়া নিয়ে এসে আস্তাবলে রাখা হল। সারা পৃথিবীর ফলফুল ও গাছপালা দিয়ে বাগানটিকেও ছবির মতন সাজানো হল। হরেকরকমের পশুপক্ষী ও জীবজন্তু নিয়ে এসে বিচিত্র একটি পশুশালাও তৈরি করা হল। চিন্তাক্লিষ্ট বড়লাট বাহাদুরের আরাম, বিরাম ও বিলাসিতার উপকরণের কোন অভাব যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই ওয়েলেসলি ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন।

ফো র্ট উ ই লি য়া ম ক লে জ॥ ওয়েলেসলি আরও একটি পরিকল্পনা করেন যা তাঁর অন্যতম কীর্তিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। তিনি কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করবেন স্থির করেন। কোম্পানির জুনিয়ার কর্মচারীরা এই কলেজে এদেশী ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা করবে, এই তাঁর ইচ্ছা। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন এই কলেজেও প্রোভোস্ট, ভাইস-প্রোভোস্ট ও প্রফেসার নিযুক্ত করা হবে ঠিক হল। কলেজের জন্য তিনি গার্ডেনরীচের প্রথম থেকে পর পর পাঁচখানি বাড়ি দখল করে নিলেন, অর্থাৎ কিনে ফেললেন। তার মধ্যে একটি বাড়ি ছিল পরলোকগত উইলিয়াম বার্কের। বাড়িটি বন্ধক ছিল বলে তখনও পর্যন্ত বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। কোম্পানির অনুরোধে আমাকেই বাড়িটি বিক্রির সব ব্যবস্থা করতে হল, এবং তার মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে বন্ধক ও সুদ বাবদ বত্রিশ হাজার একশো টাকা পাওনাদারদের শোধ করে দিলাম। গার্ডেনরীচের বাড়ি ছেড়ে ওয়েলেসলি কলকাতার মধ্যস্থলে কলেজের জন্য বড় একটি বাড়ি লীজ নিলেন। বাড়িটি ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ব্যবসায়ী নাচের মাস্টার 'পাবলিক এক্সচেঞ্জ'-এর জন্য তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির

কোন আশা নেই দেখে তিনি সেটি কোম্পানির মতন একজন ভাল ভাড়াটেকে লীজ দিতে সম্মত হন। বাড়িতে কলেজের কাজ আরম্ভ হবার পর প্রত্যহ ছাত্রদের খাবার টেবিলে প্রোভোস্ট অথবা ভাইস-প্রোভোস্ট উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু কলেজের কাজকর্ম বেশিদিন চলল না, কারণ কোম্পানির কর্মকর্তারা হঠাৎ জানিয়ে দিলেন যে কলেজ চালানোর কোন প্রয়োজন নেই এবং তার জন্য টাকা খরচ করাও অর্থহীন। ওয়েলেসলি এই আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন এইজন্য যে কোম্পানির অর্থের অপব্যয় তাঁর হাত দিয়ে এত হয়েছে যে কোন কথা বলার মুখ আর তাঁর ছিল না।

ক কা রে ল কো ম্পা নি ॥ ১৮০১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে আমি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বেশ বুঝতে পারলাম, স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, আয়ু আর বেশিদিন নেই। অবশ্য ডাক্তার হেয়ারের অক্লান্ত চেষ্টায় এবারও কোনরকমে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। ওঠার পরেই বড় একটি মামলায় জড়িয়ে পড়লাম। 'ককারেল, ট্রেল অ্যাণ্ড কোম্পানি' নামে একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী তহবিল তছরূপের দায়ে ধরা পড়েন। কর্মচারীর নাম রাউল্যাণ্ড স্কট, জাতিতে পর্তুগীজ, দীর্ঘকাল কোম্পানির প্রধান বুক-কিপার ও সহকারী কেশিয়ারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। টাকার পরিমাণ এত বেশি যে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি জানতে পেরে স্কটকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাটি আদায় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মোট টাকার চারভাগের একভাগের বেশি আদায় করা সম্ভব হয় না। কোন উপায় না দেখে শেষে স্কটকে জেলখানায় বন্দী করা হয়। ককারেল কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন নিমাইচরণ মল্লিক।

কোম্পানির কর্তারা তাঁকে তলব করে বললেন যে স্কট যে টাকা চুরি করেছে তা তাঁকেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে, কারণ বেনিয়ান হিসেবে কর্মচারীদের জামিন হলেন তিনি। নিমু মল্লিক এই দায়িত্ব অস্বীকার করে বলেন যে বেনিয়ান হিসেবে তিনি কেবল 'নেটিভ' বা এদেশী কর্মচারীদের জন্য দায়ী, অন্যদের জন্য দায়ী নন। বিশেষ করে স্কট সাহেব তাঁর বেনিয়ান নিযুক্ত হবার অনেক আগে থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, কাজেই স্কটের কোন জাল-জুয়াচুরির জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নেই।

মল্লিক মশায়ের জবাবে ককারেলের কর্তারা মোটেই প্রীত হলেন না। তাঁরা নিমাইচরণ, তাঁর দুই ছেলে ও একটি ভাইপোর (যিনি খুড়োর কেরানীর কাজ করতেন) বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন। এই মামলায় আমি আসামী মল্লিকদের পক্ষে দাঁড়াই এবং আসামীদেরই জয় হয়। তাঁরা খরচাসহ ডিক্রি পান। কিন্তু ককারেল কোম্পানির কৌঁসুলি দাম্ভিক বারোজ প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করলেন সুপ্রিমকোর্টের রায় নাকচ করার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না, কেবল ককারেলকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হল। ককারেলের বিরুদ্ধে মামলায় নিমু মল্লিকের জয় হবার পর থেকে আমার পসার হু হু করে বাড়তে লাগল। মক্কেলের জায়গা হয় না ঘরে এমন অবস্থা হল। ১৮০১ সন নিজের পেশাগত কাজকর্মের চাপে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না।

১৮০২ সনের কথা। চুঁচূড়ার বাড়িতে মধ্যে মধ্যে যাই বটে, কিন্তু এত ঝামেলা পোহাতে আর ভাল লাগে না। বাড়ির জন্য কতকগুলি চাকর-বাকর অনর্থক পুষতে হয়, তা ছাড়া সেই সখের বোটটির জন্য চোদ্দজন দাঁড়িমাঝি তো আছেই। এই কারণে বাড়িটা বেচে দেব ঠিক করলাম। জনৈক সার্জেন প্লেস্কেট মাত্র দশ হাজার টাকা মূল্য দিতে চাইলেন, কিন্তু মূল্যটা এত কম

এবং ক্রেতার লাভটা এত বেশি বলে মনে হল যে আমি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম। মাস খানেক পরে তিনি আবার ঐ মূল্যের কথা জানিয়ে লিখলেন যে তিনি কেবল বাড়িটি চান, আসবাবপত্র, সিডনের বিলিয়ার্ড টেবিল, ডিস-প্লেট, মেহগেনি বুককেস বা অন্যান্য কোন জিনিস চান না। এইসব আসবাবের মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হবে। কাজেই কিছু অন্তত বাঁচল মনে করে আমি দশ হাজার টাকাতেই বাড়িটা তাঁকে বেচে দিলাম। এতে আমার হাজার চল্লিশ টাকার মতন ডাহা লোকসান হল।

পার্টনারশিপ বিচ্ছেদ ॥ পরবর্তী দু'টো বছর কোনরকমে কেটে গেল। ১৮০৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ব্যবসায়ের পার্টনার বেঞ্জামিন টার্নার হঠাৎ ইয়োরোপ ফিরে যাবেন বলে হিসেব চুকিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবেন ঠিক করেন। একটা হিসেবও চটপট করে ফেলে দিয়ে তিনি আমার কাছে দাখিল করলেন। সেই হিসেবের দিকে চেয়ে, এবং আমার কাছে তাঁর যে-খাতে যে পাওনার অঙ্ক বসানো হয়েছে তা দেখে আমার চক্ষু কপালে উঠল। আমি নাকি আমার লভ্যাংশের অতিরিক্ত টাকা প্রায় আমাদের কোম্পানির তহবিল থেকে নিয়েছি, এবং তার সুদ বাবদ আমার পার্টনারের একটা মোটা টাকা পাওনা হয়েছে। এ সত্য আবিষ্কার করে এবং পার্টনারের হিসেবের বাহাদুরি দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে জানালাম যে কোনদিন তাঁর ব্যক্তিগত একটি টাকাও আমি নিইনি, অতএব তাঁর কোন সুদ আমার কাছে পাওনা হয়নি। যে টাকা তিনি দাবি করেছেন তা ন্যায্য নয় এবং আমি তা কিছুতেই দেব না, তার জন্য তিনি যা খুশি করতে পারেন। কিছুদিন এইভাবে কড়া চিঠিপত্র লেখালেখি চলতে লাগল। টার্নার

অবশ্য মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন, আমার পক্ষে তা রাখা একেবারেই সম্ভব হয়নি। অবশেষে বন্ধুবান্ধবরা ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করার পর ঠিক হল যে আমরা আদালতে না গিয়ে সালিশী মেনে নেব। সালিশীতে আমার খুব বেশি লাভ হল না, কেবল সুদের হার থেকে রেহাই পেলাম। তবে পার্টনারশিপ ব্যবসা চুকিয়ে ফেলা হল।

বিপদের সময় বিপদ বাড়ে। এই সময় স্যার হেনরি রাসেল একটি ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কয়েকমাস তাঁর পক্ষে কোন কাগজপত্র দেখা বা সই করা সম্ভব হয়নি বলে আমিও তাঁর ক্লার্ক হিসেবে কোন বেতন পাইনি। তাতে আমার বেশ আর্থিক অসুবিধা হয়েছে।

হি দা রা ম ও র ঘু না থ ব্যা না র্জি ॥ আমার পার্টনার টার্নারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর একদিন নিমাইচরণ মল্লিক আমার কাছে নানাবিষয়ে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে এলেন। আমি জানতাম, টার্নারকে আমার পার্টনার হয়ে ব্যবসা না করার সৎ পরামর্শও তিনিই দিয়েছিলেন। তবু তিনি এসে সদিচ্ছা জানিয়ে বললেন যে ব্যবসার খাতিরে আমিও তাঁর কাছে যা, টার্নারও তাই, এবং উভয়েরই মঙ্গলচিন্তা সর্বদাই তিনি করে থাকেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিমাইবাবু আমাকে বললেন যে হিদারাম ব্যানার্জি ও তাঁর ভাই রঘুনাথ ব্যানার্জির কাছে বিভিন্ন সময়ে বণ্ড দিয়ে আমি যে টাকা লেনদেন করেছি, সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিছু সুপরামর্শ দিতে চান। বিশেষ করে রঘুনাথের কাছে আমার নাকি অনেক টাকা ঋণ আছে এবং সে বিষয়ে আমার এখনই সচেতন হওয়া উচিত। একথার উত্তরে আমি বললাম, হিদারাম ও রঘুনাথ এই দুই ভাইকে আমি একনম্বরের শঠ ও প্রবঞ্চক

(হিকির ভাষা হল 'errant knaves and scoundrels') বলে মনে করি। দুই ভাই মিলে মতলব করে কত রকম কৌশলে যে টাকাপয়সার ব্যাপারে আমাকে ঠকিয়েছে তার ঠিক নেই। যদি দু'জনকে, অথবা একজনকেও আরও কিছুদিন আমার কাজে বহাল রাখতাম তাহলে ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিয়ে পথের ভিখিরী হয়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হত। রঘুনাথ কিছুকাল আমার বেনিয়ানের কাজ করেছিল। আমি নিমাইবাবুকে বললাম, যেহেতু হিদারাম ও রঘুনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে সেই কারণে আমি যে তাদের কোনরকম মর্যাদা দেব তা নয়। একথা ঠিক যে অনেক সময় বাধ্য হয়ে আমি রঘুনাথকে বণ্ড লিখে দিয়েছি, একটি টাকাও তার পাওনা নেই জেনেও। পরে যখন দেখলাম এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবেক বলে কোন পদার্থ নেই, এবং টাকার জন্য যে-কোন অপকৌশল অবলম্বন করতে তারা প্রস্তুত, তখন তাদের ডেকে আমি পরিষ্কার বলে দিই যে একটি টাকাও আমি তাদের দেব না, সুদ বা আসল কোন বাবদেই নয়। তার জন্য তারা যা খুশি করতে পারে, আইন-আদালত পর্যন্ত।

হিদারাম ও রঘুনাথের জুলুমের কথা শুনে আমার প্রাক্তন পার্টনার টার্নার আমাকে একজন বাঙালী বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠান যে আমি যদি হিসেবের যাবতীয় খাতা ও কাগজপত্র তাঁর কাছে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিই তাহলে তিনি সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এবং তার গরমিল ও জুয়াচুরিও ধরে দিতে পারেন। ব্যবসার পার্টনারশিপ নিয়ে গণ্ডগোল হবার পরেও যে টার্নার আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল থাকতে পারেন, আমি তা ভাবতে পারিনি। তাঁর সহৃদয়তায় সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হিসেবের সমস্ত খাতাপত্র পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। এদেশী হিসেবপত্রের কায়দাকানুন কিছুই আমার

জানা ছিল না। টার্নার জানতেন, এবং যে-কোন ঘুঘু বাঙালী হিসেবনবীশকে তিনি ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে ঘোল খাওয়াতে পারতেন। আমরা যখন একসঙ্গে ব্যবসা করেছি তখন এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা আমি দিনের পর দিন দেখেছি। হিসেবের খাতা খুঁটিয়ে দেখে তিনি 'ডবল এন্‌ট্রি' প্রভৃতি নানারকমের জুয়াচুরি হাতে-নাতে ধরে ফেলতেন। কাজেই টার্নার চেষ্টা করলে যে হিদারাম-রঘুনাথের প্রতারণার ফন্দি অনেকটা ফাঁস করে দিতে পারেন, সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তাই টার্নারকে আমার পূর্বের রূঢ় ব্যবহারের জন্য, বিশেষ করে চিঠি-পত্রের কড়া ভাষার জন্য, ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখলাম। চিঠির সুন্দর জবাবও দিলেন তিনি। উভয়ের মধ্যে যে মনকষাকষি চলছিল, এই উপলক্ষে তা কেটে গিয়ে আবার আমরা পরস্পর বন্ধু হিসেবে মিলিত হলাম।

টার্নারের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ ব্যবসা চুকে যাবার পর আর কারও সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে হাত মেলাইনি। অথচ আমার অ্যাটর্নির কারবার তখন এতদূর ফেঁপে উঠেছিল যে আফিস-এস্টাব্লিশমেণ্ট দ্বিগুণ বাড়াতে পারতাম। কিন্তু আমি তাও করিনি। আমার হেড কেরানী রামধন ঘোষ পর্যন্ত আমার ভাবগতিক দেখে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। ১৭৮৩ সন থেকে এই ১৮০৬ সন পর্যন্ত প্রায় তেইশ বছর তিনি আমার অ্যাটর্নির আফিসে কাজ করছেন, কিন্তু কোনদিন আমার টাকাপয়সার উদারতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। তিনিও একদিন ধৈর্য হারিয়ে বললেন, আমিও নাকি ক্রমে নিমু মল্লিকের মতন ইহুদী-মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠছি। আমাদের যখন হিকি-টার্নার নামে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল তখন গৌর দে, একজন ধনকুবের বাঙালী, আমাদের উভয়েরই বেনিয়ান ছিলেন। পরে টার্নার

আলাদা হয়ে গেলে গৌরবাবু তাঁর সঙ্গে চলে যান। তারপর আমিও আর কোন নতুন বেনিয়ান নিয়োগ করিনি। তার ফলে অবশ্য আমার লাভের অঙ্ক ক্রমেই ফেঁপে উঠছিল।

এই সময় রামমোহন মজুমদার নামে শেরিফের আফিসের হেড কেরানীর আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হই। ১৭৮৪ সনে রবার্ট মর্সের অধীনে আমি যখন আণ্ডার-শেরিফ ছিলাম তখন মজুমদারকে একজন সাধারণ কেরানী হিসেবে আমি শেরিফের আফিসে ঢুকিয়ে দিই। তারপর থেকে এই ১৮০৬ সন পর্যন্ত এই আফিসে কাজ করে তিনি হেড কেরানী হয়েছেন এবং কাজকর্ম অনেক শিখেছেন। ডেপুটি-শেরিফের অধিকাংশ কাজ তিনিই করে দিতেন, তার জন্য তাঁকে যেতে হত না। তাঁর মৃত্যুও হল আশ্চর্যভাবে। আমার চোখের সামনে ডেস্কের কাছে বসে একমনে তিনি লিখছিলেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমি আমার পাল্‌কি করে তাড়াতাড়ি তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই। বাড়ি পৌঁছে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তিনি মারা যান।

নি মা ই চ র ণ ম ল্লি ক॥ ১৮০৭ সনের কথা। অর্থের সমাগম অনর্গল ধারায় হচ্ছে, স্বাস্থ্যের ক্ষয় হচ্ছে দ্রুত গতিতে। মক্কেল অনেক, কাজও অনেক, একটানা দীর্ঘ সময় ডেস্কে বসে তা শেষ করতে হয়, তবেই টাকা পাওয়া যায়। এই সময় কয়েকটি জটিল মামলা পরিচালনায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তার মধ্যে একটি হল নিমাইচরণ মল্লিকের পারিবারিক বিষয়সম্পত্তির মামলা। নিমাইচরণ বা নিমু মল্লিকের কথা একাধিকবার বিবিধ প্রসঙ্গে আগে উল্লেখ করেছি। বাঙালীদের মধ্যে তাঁর মতন অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক তৎকালে হাতে গোনা যেত। বেনিয়ানি ও

অন্যান্য কাজকর্ম করে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর অর্থ রোজগারের আরও একটি উপায় ছিল যা অনেকেরই জানা নেই। অ্যাটর্নি, অ্যাডভোকেট ও আদালতের সংস্রবে দীর্ঘদিন থাকার ফলে, এবং নিজেরও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে, তিনি আইনের মারপ্যাঁচ অনেক ঝানু উকিল-ব্যারিস্টারের চেয়ে ভাল বুঝতেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য লোকজন অ্যাটর্নি-উকিলের কাছে যাবার আগে তাঁর কাছে যেত। বিবাদের বিষয় শুনে এবং কাগজপত্র দেখে তিনি পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন, মামলায় হার হবে না জিত হবে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কথা ফলে যেত। বাস্তবিকই এ-সব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। দেখতে দেখতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, এবং বাড়িতে লোকজনের ভিড়ও হতে লাগল খুব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাড়ির একটি ঘরে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য বসতেন, মক্কেলদের মামলার বিষয় মনযোগ দিয়ে শুনতেন এবং কি করতে হবে না হবে সে বিষয়ে যুক্তি-পরামর্শ দিতেন। এর জন্য অ্যাটর্নি-ব্যারিস্টারদের মতন তাঁরও একরকমের 'ফি' ধার্য ছিল, সেটা হল মামলার মোট টাকার উপর কমিশন। এই কমিশন থেকে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন।

এরকম একজন ধুরন্ধর লোক যে নিজের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে প্রকাণ্ড ভুল করে ফেলবেন, এবং সেই ভুলের জালে নিজেরই জীবনসায়াহ্নে জড়িয়ে পড়বেন তা কেউ ভাবতে পারেন কি ? অনেক আগে থেকে নিমু মল্লিক তাঁর বিশাল বিষয়-সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে উইল করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভোগদখল নিয়ে ঝগড়া করে ছেলেরা যাতে পারিবারিক অশান্তি না ঘটায়, এবং মামলা করে অনর্থক অর্থের অপব্যয় না করে, তার জন্য অনেক ভেবেচিন্তে তিনি উইল

করে রেখেছিলেন। শেষবার পীড়িত হবার পর দীর্ঘদিন ভুগে তিনি মারা যান। রোগশয্যায় তাঁর আটটি ছেলেকে কাছে ডেকে তিনি উইলের কথা বলেন। ছোট ছেলেটির বয়স তখন বছর আঠার হবে। উইলের কথা বলে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তি বিভাগ নিয়ে ভাইদের মধ্যে কোন বিবাদ না হয়, এবং যে ছ'জন নাবালক রয়েছে তারা যেন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে কোন ওজর-আপত্তি না করে। এই কথা বলার পরেই সেই ছ'জন নাবালক ছেলে তাদের মুমূর্ষু পিতার মুখের উপরে জবাব দেয় যে কোন অনুরোধ বা উপদেশ শুনতে তারা রাজী নয়, কারণ তাদের উপর তিনি বিষয়-বণ্টনের ব্যাপারে অবিচার করেছেন এবং বড় দুই ভাইকে অন্যায়ভাবে বেশি অংশ দিয়েছেন। বৃদ্ধ নিমাইচরণ মৃত্যুশয্যায় নাবালক পুত্রদের মুখ থেকে এইকথা শুনে পরলোকের চিন্তা করতে লাগলেন। বড় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে নাবালক ছয় ভাই বিষয়ের সমান অংশ দাবী করে আদালতে মামলা করলেন। মামলার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়লাম, পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। কলকাতায় বাকি যতদিন ছিলাম ততদিন এই মামলাও চলেছিল। যদি আরও কিছুকাল কলকাতায় থাকতাম, মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত, তাহলে টাকার দিক থেকে হয়ত আমারও ভাগ্য ফিরে যেত। তবু যে পরিমাণ টাকা এ মামলা থেকে আমি পেয়েছি তা যথেষ্ট, বাকি যা পাইনি তার জন্য কোন দুঃখ নেই।

১৮০৭ সনের গোড়ায় ডাক্তার হেয়ার আমাকে বললেন যে যদি কিছুদিন বাঁচার ইচ্ছা থাকে তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে। তারপর থেকে আমার মন গৃহাভিমুখী হয়ে উঠল। সম্পত্তি বলতে তখন আমার হাজার সত্তর টাকা ছিল এবং তাই দিয়ে শতকরা আট টাকা সুদের কোম্পানির

কাগজ কিনে রেখেছিলাম। শেষদিকে এই টাকাটা বাড়াবার জন্য খুবই চেষ্টা করছিলাম, বাজে খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে ও সঞ্চয় করে।

নী ল ক র সা হে ব॥ এই সময় আমার এক বন্ধু ফ্রেডারিক মেটল্যাণ্ড আর্নট শোচনীয়ভাবে মারা যান। ১৭৭৭ সনে তিনি ক্যাডেট হয়ে একই জাহাজে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন এবং পরে সেনাবিভাগে ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ক্যাপটেনের কাজ ছেড়ে দিয়ে টাকা রোজগারের আশায় তিনি নীলের (indigo) ব্যবসা করবেন ঠিক করেন। তার জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী তিনি চাষীদের টাকা দাদন দিয়ে নীলচাষ করাতেন। চাষীরা এবারে নাকি তাঁর কাছ থেকে দাদন খেয়ে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে গাছ সরবরাহ করেনি, অন্য কোন নীলকরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। চাষীদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে আর্নট গ্রামে গিয়ে তাদের উপর চড়াও হন এবং দু-একজনকে টেনে-হেঁচড়ে ধরে আনার চেষ্টা করেন। আইনের প্রয়োগ আর্নট নিজেই করার জন্য উদ্যত হন, কিন্তু তা করতে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে যান। কয়েকশত চাষী দলবদ্ধ হয়ে বাঁশ লাঠি ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে এবং জবরদস্তির জবাব চায়। জবাব না পেয়ে তারাও অপরাধের বিচারক হয় নিজেরা, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই আর্নট সাহেবকে বাঁশপেটা করে ধরাশায়ী করে। এমনভাবে তাঁকে পেটানো হয় যে জড়পিণ্ডের মতন তিনি দলা পাকিয়ে যান। কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয় সবই তাঁর ব্যর্থ হয়। ফাটা মাথা, হাড়গোড় ও পাঁজর সুদ্ধু তাঁকে বাড়িতে বয়ে আনা হয় এবং সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন। আশ্চর্য হল, এরকম একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কোন তদন্ত করা প্রয়োজন বোধ করলেন না গবর্ণমেণ্ট। বরং ইংরেজ মহলে বলাবলি হতে শুনেছি যে দোষ আর্নটের এবং দোষের উপযুক্ত দণ্ড তিনি পেয়েছেন। ছু'জন চাষীকে তিনি নাকি আগে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিলেন। কাজেই চাষীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বেঁচে গেছেন, তা না হলে বিচারে তাঁর দুষ্কৃতির জন্য আরও বেশি দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হত।

হি কি র স ম্প ত্তি র হি সে ব॥ ডাক্তার হেয়ার আমার ভগ্নস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর একবার সাবধান করে দিলেন। সুতরাং নতুন কাজকর্ম নেওয়া বন্ধ করে দিয়ে ইংল্যণ্ডে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। ১৮০৮ সনের পয়লা জানুয়ারি লোহার সিন্দুক খুলে দেখলাম তাতে একলক্ষ বাইশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রয়েছে। সকলকেই ইংল্যণ্ড যাবার কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে, কিন্তু অনেকেই তার কোন উত্তর দেননি। আমি জানতাম বাজারে আমার কিছু ধার-দেনা আছে, কিন্তু সেটা এত ছড়ানো যে পাওনাদাররা না জানালে আমার পক্ষে খোঁজ করে তা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। আমার অনুপস্থিতিতে এইসব দেনাপাওনার দায়িত্ব তাই কারও উপর না দিয়ে গেলে অন্যায় হবে মনে হল। কিন্তু কার উপর এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া যায়? সুপ্রিমকোর্টের অ্যাটর্নি ডোনাল্ড ম্যাকনাবের কথা মনে হল। ম্যাকনাব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী। রবার্ট চেম্বার্সের উইল ও টেস্টামেণ্টের এক্সিকিউটার তিনি এবং লেডী চেম্বার্সেরও এজেণ্ট-রূপে কাজ করেন গত চার বছর ধরে, চেম্বার্সের মৃত্যুর পর, এই দায়িত্ব পালন করে তিনি বেশ

সুনাম অর্জন করেছেন। সেইজন্য তাঁকেই আমার এজেণ্টের কাজ করার জন্য অনুরোধ করলাম এবং তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

চারটি বড় বড় সেগুনকাঠের সিন্দুক, একটি লেখার ডেস্কসহ ব্যুরো, শোবার জন্য একটি ছোট খাট, একটি টেবিল এবং আরও কয়েকটি ছোটখাট কাঠের জিনিস একজন ইয়োরোপীয় ছুতোর-মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করালাম আমার কেবিনের জন্য। এক বাক্স ক্ল্যারেট এবং এক বাক্স মদিরা কিনলাম। ঠিক করলাম এইসব জিনিসপত্র নিয়ে নৌকা করে জাহাজ পর্যন্ত গিয়ে আমার কেবিনটা আগে থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে আসব। দু'একজন বন্ধু এই কাজে আমাকে সাহায্য করবেন কথা দিলেন। যেদিন যাওয়া হবে স্থির হল তার আগের দিন রাতে আমার এমন পেটের যন্ত্রণা হতে লাগল যে বিছানা ছেড়ে আমি উঠতেই পারলাম না। শেষে নিরুপায় হয়ে ভাবলাম আমার যে বাঙালী ভৃত্যটি আছে তাকেই কেবিন সাজাতে পাঠাব।

ভৃত্য চাঁদের কীর্তি॥ এই বঙ্গদেশীয় ভৃত্যটির নাম চাঁদ। বন্ধু-মহলে সকলেই জানে চাঁদ আমার পিয়ারের ভৃত্য। যখন সে ছোট্ট শিশু ছিল তখন থেকে তাকে আমি পালন করেছি। এখন সে আঠার বছরের সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক, কাজকর্মে ও কথাবার্তায় রীতিমত স্মার্ট। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে আদর ও আস্কারা পেয়ে তার ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমিও তাকে সখের পোষা জীবের মতন নিজের খেয়ালখুশি চরিতার্থের জন্য এত আবদার দিয়ে মানুষ করেছি যে কিছু বলবার নেই। নিজের খুশি মতন তাকে নানারকমের পোষাক দিয়ে সাজিয়েছি, তার সবরকমের অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করেছি, এবং তারই ফলে

আমার বহু পুরাতন ভৃত্য চাঁদ আজ একটি আস্ত বাঁদর ও বুলবুলি বাবুটি তৈরি হয়েছে। আমার বন্ধুবান্ধবরাও সব সময় তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করে তার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে।

চাঁদ যখন বার-তের বছরের হল তখন সে বেশ সিঁদেল চোর হয়ে উঠল দেখলাম। ঐ আস্কারাই তার একমাত্র কারণ। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম তখন সে সোজা আমার ঘরে ঢুকে, পকেট থেকে ড্রয়ারের চাবি বার করে দু'চারটে সোনার মোহর নিয়ে আবার আমার পকেটে চাবি রেখে চলে যেত। কয়েক মাস ধরে তার এই মোহরচুরি অবাধে চলতে থাকে। তার কারণ চাঁদ জানত টাকাপয়সার কোন হিসেব আমার থাকে না, এবং দু'চারটে মোহর তা থেকে সরিয়ে ফেললে আমি কোনদিনই ধরতে পারব না। বাস্তবিক ধরতে আমি পারতাম না, যদি না চাঁদের লোভ ক্রমে বেড়ে যেত এবং চুরিটা তার নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াত। দু'একদিন মনে একটু খট্‌কা লাগতে আমি টাকার হিসেব রাখতে আরম্ভ করলাম। হিসেব যে ক'দিন রেখেছি সকালে উঠে দেখেছি কিছু টাকা উধাও হয়েছে। চাঁদের ওপর তখনও কোন সন্দেহ হয়নি। ব্যাপারটা যখন প্রতিদিন ঘটতে লাগল তখন আমার পুরনো কেরানী রামধন ঘোষকে সব খুলে বললাম। আদ্যোপান্ত শুনে তিনি বললেন, আমার খানসামা নাকি তাঁকে বলেছে যে চাঁদ আজকাল দামী দামী বাহারে পোষাক পরছে এবং ঘড়ি ও অন্যান্য বাবুগিরির জিনিসও কিনছে খুব। এত পয়সা সে পাচ্ছে কোথা থেকে? সে যা বেতন পায় তা থেকে এসব করা সম্ভব নয়। কেরানীবাবু পরিষ্কার ইঙ্গিত করলেন যে চাঁদই সব চুরি করছে।

এই ইঙ্গিত পেয়ে চাঁদকে ডেকে আমি বললাম যে কিছুদিন হল আমার ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি যাচ্ছে, এবং সে এই টাকা

চুরি করছে। শুনে সে গাছ থেকে পড়ার মতন ভাব দেখাল। তখন আমি চালপড়ার ওঝা ডাকব বলে ভয় দেখালাম। ওঝা এসে সমস্ত ভৃত্যকে ডেকে শুকনো চাল চিবোতে দেবে এবং নানারকম কুৎসিত মুখভঙ্গিমা করে কি সব মন্ত্রপাঠ করতে থাকবে। তারপর সে সকলকে যখন চিবনো চাল উগরে ফেলতে বলবে তখন দেখা যাবে, যে অপরাধী বা চোর তার মুখের চাল লালাতে ভেজেনি, শুকনোই রয়েছে। অর্থাৎ এই জাদুর আসল রহস্য হল এই যে অপরাধী হলেই ভয়ে তার গলা ও মুখ শুকিয়ে যাবে, চাল আর লালাতে ভিজবে না। অতঃপর ওঝা অপরাধীর দিকে চেয়ে আরও বীভৎস মূর্তিতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকবেন এবং তাকে এই বলে ভয় দেখাবেন যে অপরাধ মুখে স্বীকার না করলে এখনই ভূতে কিলোতে থাকবে। এই অবস্থায়, বলা বাহুল্য, অপরাধী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই চালপড়ার জাদুতে চোর যে ধরা পড়ে না তা নয়, তবে নির্দোষ লোককেও বেশ নাজেহাল হতে হয়। তার কারণ অপরাধের ভয়ে যেমন চোরের গলা শুকিয়ে যায়, তেমনি ওঝার ভয়েও অনেক নির্দোষ লোকের গলা কাঠ হয়ে আসে। মুখের চাল তাদেরও ভেজে না। যাই হোক, এদেশের লোকদের, বিশেষ করে চোর-ছ্যাঁচোড়দের চালপড়া সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভয় আছে। ওঝার কথা বলাতেই আমার কাজ হল, তাকে আর আসতে হল না। চাঁদ তার অপরাধ স্বীকার করল।

অপরাধ স্বীকার করার পর চাঁদ ভাবল এবারে নিশ্চয় তার চাকরি যাবে। আমি অবশ্য সেরকম কিছু ভাবিনি, কারণ নিজের হাতে মানুষ করে তার ওপর এমন একটা মমতা হয়েছিল যে তাকে ছাড়াবার কথা ভাবতে পারতাম না। আমি কিছু বলার আগেই চাঁদ আমাকে না বলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বোম্বাইগামী এক জাহাজের ক্যাপটেনের ভৃত্য হয়ে সে পালাল।

বোম্বাই থেকে চীন কয়েকবার জাহাজে যাতায়াত করে এবং ক্যাপটেনের কাছে প্রায় পনের মাস কাজ করে, চাঁদ আবার কলকাতায় ফিরে এল। ফিরে এসেই আমাকে জানাল যে তার আগের স্বভাব এখন শুধরে গেছে এবং তার অপরাধের জন্য সে অনুতপ্ত। আমি যদি তার অপরাধ ক্ষমা করে আবার তাকে ভৃত্যের কাজে নিয়োগ করি তাহলে সে কৃতার্থ হবে। আমি তাকে আগেও ছাড়াতে চাইনি, বরং সে ছেড়ে যাওয়াতে দুঃখ পেয়েছি। কাজেই সে যখন ফিরে এসে নিজেই আবার কাজ করতে চাইল তখন খুশি হয়েই আমি রাজী হলাম। তারপর থেকে গত তিন বছর সে আমার সাজঘরের ভৃত্য হিসেবে কাজ করছে। এ ছাড়া আমি যখন বাইরে কোথাও গাড়ি করে বেড়াতে বেরোই তখন সে ঘোড়ায় চড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে যায়। ঘোড়ায় চড়াও তাকে আমি নিজে শিখিয়েছিলাম, এবং সে চমৎকার ঘোড়ায় চড়তে পারত। সংক্ষেপে এই হল আমার পিয়ারের ভৃত্য চাঁদের জীবনবৃত্তান্ত।

আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাব শুনে চাঁদও আবদার করে বসল যে সেও আমার সঙ্গে যাবে। এতদিন করতে পারিনি, আজও তার আবদার উপেক্ষা করতে পারলাম না। চাঁদও আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবে ঠিক হল।

আমার জাহাজের নাম হল 'ক্যাসল ইডেন'। সাগরদ্বীপের ওপারে নোঙর করা আছে, সেখানে গিয়ে কেবিন সাজাতে হবে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য সঙ্গে যাঁদের যাবার কথা ছিল তাঁদেরও যাওয়া হল না। কিন্তু আমার স্লুপ ভাড়া করা হয়ে গিয়েছে, এক-আধ টাকা নয়, পাঁচশোটি টাকা ভাড়া। সুতরাং চাঁদকে মালপত্র দিয়ে পাঠাব ঠিক করলাম। আমার অসুস্থতার

খবর পেয়ে জাহাজের ক্যাপটেন কলনেট সাহেব খবর পাঠিয়েছেন যে স্টিফেন গ্রেগ নামে একটি লোককে কেবিন সাজাবার কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি দিতে পারবেন। একাজে গ্রেগের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও আছে। গ্রেগ যথাসময়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে চাঁদ ও দীনু নামে আর একটি ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম। আসবাবপত্রের সঙ্গে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়, ক্ল্যারেট মদিরা পেরী বিয়ার ব্র্যাণ্ডি যা ছিল সবই তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চাঁদকে ডেকে বলে দিলাম, খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না, ভোজন ও পান যত খুশি তারা করলেও ক্ষতি নেই, কারণ প্রত্যেক জিনিস প্রচুর পরিমাণে মজুত করা হয়েছে।

বারোদিন পরে স্লুপটি কলকাতায় ফিরে এল। গ্রেগ আমার কাছে এসে খবর দিলেন যে তিনি আমার কেবিন খাট, টেবিল, ড্রেসিং-স্ট্যাণ্ড, চেয়ার, ব্যুরো ইত্যাদি দিয়ে যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়েছেন এবং লকারের মধ্যে মদিরাদি পানীয় ভর্তি করে রেখেছেন। জাহাজে পৌঁছলে আমার কোন অসুবিধা হবে না। গ্রেগ সাহেব এলেন বটে, কিন্তু চাঁদের দেখা নেই, অথচ সকলের আগে চাঁদেরই আসা উচিত। অন্যান্য ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলাম চাঁদের খবর কি? তারা বললে যে চাঁদ তার মাকে দেখতে বাড়ি গেছে। এই কথা বলে ভৃত্যরা চলে যাবার পরেই খানসামা এসে আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। জাহাজে ব্যবহারের জন্য আমার যে বিছানাটি পাঠিয়েছিলাম, দেখলাম সেটি নোংরা অবস্থায় ঘরের মধ্যে জড়ানো রয়েছে। বিছানা, বালিশ, লিনেন চাদর, পর্দা অধিকাংশই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কতকগুলি বমিতে ভিজে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দূর করে ফেলে দিতে বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলি আমাকে এভাবে প্রদর্শনের মতন দেখাবার কারণ কি? বুঝলাম, এসব চাঁদের কীর্তি বলে আমাকে ভাল করে দেখানো হল।

কীর্তির বিবরণ যা শুনলাম তা এই। কলকাতা থেকে নৌকা ছেড়ে ফলতা পর্যন্ত যাবার পর চাঁদ নাকি সারেঙ্গকে নৌকা বাঁধতে বলে। তখনও প্রায় ঘণ্টা তিনেক বেলা ছিল এবং চমৎকার হাওয়াও ছিল, নৌকা বাঁধার কোন কারণই ছিল না। সারেঙ্গ সেকথা চাঁদকে বুঝিয়ে বলতেও চাঁদ রাজী হল না, নৌকা বাঁধার জন্য জোর করতে লাগল। গ্রেগ ও সারেঙ্গকে বলল, আমি নাকি তাকে বলে দিয়েছি ফলতায় নৌকা বেঁধে সেখান থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য। গ্রেগ নাকি বলেছিলেন যে অনর্থক কোন জিনিস কেনার দরকার নেই, প্রচুর জিনিস আছে, ফলতায় এইভাবে সময় কাটালে তারা নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজে পৌঁছতে পারবে না। এত সব কথা ও যুক্তি চাঁদের এ-কান দিয়ে ঢুকে সে-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে সে বলল যে ফলতার মেসার্স গ্যামেজ অ্যাণ্ড সণ্ডার্সের দোকান থেকে কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য আমি তাকে হুকুম দিয়েছি। অবশেষে চাঁদের জোর-জবর-দস্তিতে ফলতার ঘাটে নৌকা ভেড়াতেই হল। ঘাটে নেমে চাঁদ গ্রেগকে বলল, "চল একটু ঘুরে-ফিরে আসি, দেখি একটা মেয়ে-টেয়ে পাকড়াও করা যায় কিনা! রাতটা তাহলে ভালই কাটবে।" প্রস্তাব শুনে গ্রেগ ঘাবড়ে গিয়ে আপত্তি করলেন। কিছু পরোয়া নেই, চাঁদ একলাই চলে গেল এবং ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে একটি নয়, তিনটি বারাঙ্গনা বালিকাকে নিয়ে ফিরে এল নৌকায়। গ্রেগ তাকে বুঝিয়ে বললেন, "এসব কাণ্ডবাণ্ড করো না, তোমার মাস্টার হিকি সাহেব যদি জানতে পারেন তাহলে সর্বনাশ হবে! তোমার চাকুরিও যাবে, আর তার সঙ্গে ইংলণ্ডে যাওয়াও পণ্ড হবে।" চাঁদ হেসে জবাব দিল, "আরে রেখে দাও তোমার ওসব কথা, ভীতু সাহেব কোথাকার! আমার মাস্টার তোমার মতন নপুংসক নন, জানতে পারলেও তিনি আমাকে কিছু বলবেন না। আর তাছাড়া

জানবেনই বা কি করে?" গ্রেগের মনে এইভাবে সাহসের সঞ্চার করার চেষ্টা করে চাঁদ বলল যে সে তিনটি মেয়ে নিয়ে এসেছে, একটি তার নিজের জন্য, একটি গ্রেগের জন্য, আর একটি দীনুর জন্য। ভাবা যায় না! দীনুর বয়স বছর তের হবে, তার জন্যও চাঁদ মেয়ে জুটিয়ে এনেছে। মেয়ে তিনটির সঙ্গে কি রফা হয়েছে তাও সে বুক ফুলিয়ে জানিয়ে দিল। ফলতা থেকে তারা সাগরদ্বীপ পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে কলকাতায় ফেরার পথে আবার ফলতায় তাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। এত কথাবার্তায় গ্রেগ সাহেব প্রায় অর্ধেক গলে গেলেন, বাকি অর্ধেক গলতে বেশি দেরী হল না। দু'একবার গাঁইগুঁই করে গ্রেগ শেষে চাঁদের ধমকানি ও প্রলোভনে ভুলে গেলেন। সেই রাতটি ফলতায় মহা উল্লাসে কাটল। প্রাণ খুলে ভোজন ও মদ্যপান করে সারারাত ধরে হুল্লোড় করা হল। অবশেষে মদে চুর হয়ে গুণধর চাঁদ আমার অত্যন্ত সখের শয্যাটি পেতে দু'পাশে দু'টি মেয়েকে নিয়ে বিশ্রাম করতে গেল। অতঃপর সেই শয্যা এই অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এ কেবল এক রাতের ঘটনা নয়। পরে প্রতিটি দিন ও রাত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। গ্রেগ অবশ্য পরে ভয় পেয়ে বেশি মদ্যপান করেন নি, কেবল মাত্রা রেখে কিঞ্চিৎ বিয়ার পান করেছেন। চাঁদের সে চেতনাও হয়নি। খাদ্য ও মদ্য কিছুরই অভাব ছিল না। অতএব সে তার দু'টি মেয়েকে নিয়ে যত ইচ্ছা তা খেয়েছে এবং বেলেল্লাপনা করেছে। কলকাতায় পৌঁছে মনে হয় তার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়েছে, তাই আমার সামনে এসে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারেনি। এর পর আমার সঙ্গে তার ইংলণ্ডে যাওয়া তো দূরের কথা, এখানে চাকরি করার প্রশ্নই ওঠে না। একথা বুঝতে পেরেই চাঁদ গা-ঢাকা দিয়েছে। ভালই করেছে, আমাকে

আর কোন দুর্ব্যবহার করতে হয়নি। তারপর আমাকে আর চাঁদের মুখদর্শন করতে হয়নি।

চাঁদের কুকীর্তির কথা কেবল যে গ্রেগের মুখ থেকে শুনলাম তা নয়, দীনু ছেলেটিও বলল এবং সারেঙ্গ ও লস্কররা একবাক্যে তা সমর্থন করল। নিজেই আস্কারা দিয়ে একটা অপদার্থ কুলাঙ্গার তৈরি করেছি চাঁদকে, ভেবে লজ্জিত হলাম। ঘটনা-চক্রে যে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, এবং তাকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়িনি, নেহাৎ ভাগ্যের জোরে। মন্নু নামে আমার আর একটি তের বছরের বালক-ভৃত্য ছিল, চার বছর ধরে আমার কাছে কাজ করছে, চাঁদের বদলে তাকেই ইংলণ্ডে নিয়ে যাব ঠিক করলাম। মন্নু কোন কাজকর্ম বিশেষ করত না, নানারকমের ভঙ্গিমা করে খেলা দেখিয়ে লোকজনকে হাসানোই ছিল তার কাজ। আর খাবার টেবিলে আমার চেয়ারের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকত। অল্প বয়স বলে তার মা কিছুতেই তাকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে রাজী হয়নি। শেষে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে তাকে রাজী করাতে হয়।

মহীশূরের রাজকুমার॥ ইংলণ্ড যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, আমার ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুরা তত যেন পরস্পর পাল্লা দিয়ে আমার প্রতি বন্ধুত্ব দেখাতে উৎসুক হলেন। সকলের কাছ থেকে বিচিত্র সব উপহার আসতে আরম্ভ হল। পাটনা থেকে উইল্টন পাঠালেন একটি আরামকেদারা, মিসেস ল্যাপ্রিমোদে পাঠালেন সুন্দর একটি কার্পেট। তরুণ বন্ধু টমাস দিলেন একটি সুন্দর সোনার পেন্সিল-কেস। যখন ডেপুটি-শেরিফ ছিলাম এবং শেরিফের সব কাজকর্ম করতাম তখন কারাবন্দী টিপু সুলতানের পুত্র ময়জুদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

হয়েছিল। তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর অভাব-অভিযোগ নিবেদন করতেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার খুবই কষ্ট হত, কিন্তু কিছুই করবার ছিল না, মধ্যে মধ্যে কেবল কথার সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া। আমার ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে গেলাম তখন তিনি পাগলের মতন হাত-পা ছুড়ে বলতে লাগলেন, "আপনি চলে গেলে এদেশে বন্ধু বলে আমার আর কেউ থাকবে না। কে-ই বা তখন আমার কাছে আসবে, আমার দু'টো দুঃখের কথা শুনবে এবং মানুষের মতন ব্যবহার করবে! আমি আর তাহলে বাঁচব না।" দ্বিতীয় দিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতন আমার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, এবং মিনতি করে বললেন, "হিকি সাহেব, আপনার সঙ্গে আমাকেও দয়া করে ইংলণ্ডে নিয়ে চলুন। এদেশে আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই, এখানে আমি কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না।" টিপু সুলতানের পুত্রের মুখ থেকে এই কথা শুনলে নিতান্ত নিষ্ঠুর লোকের মনেও করুণার উদ্রেক হবে। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, "আপনাকে সঙ্গে করে ইংলণ্ড নিয়ে যেতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। কিন্তু আমার ইচ্ছায় তো আপনি যেতে পারবেন না। কোম্পানির কর্তারা অথবা এখানকার গবর্নমেণ্ট আপনাকে বাইরে কোথাও যাবার অনুমতি দেবেন না।"

কথাটা শুনে রাজকুমার ময়জুদ্দিন লোহার গরাদের ভিতরে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "কেন? কেন অনুমতি দেবেন না? আমাদের উপর এত অত্যাচার করেও কি ইংরেজদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি? আমার পিতাকে

তাঁরা হত্যা করেছেন, আমাদের সমস্ত রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন, পরিবারের সকলকে নানা জায়গার জেলখানায় বন্দী করে রেখেছেন, তাতেও কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাগ যায়নি? আমাকেও কি তাঁরা জেলখানায় বন্দী করে দগ্ধে দগ্ধে মেরে ফেলতে চান? সকলে বলাবলি করছিল যে নতুন গবর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো নাকি মানুষ হিসেবে উদারচরিত্র, তাই ভেবেছিলাম তিনি আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু গতিক দেখে মনে হচ্ছে তা দুরাশা মাত্র। আপনি আমার কথা তাঁর কাছে গিয়ে বলুন, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। আমার কোনো দাবি নেই, দৈনিক একমুঠো ভাত আর একটু জল পেলেই চলবে। বিলেতে গিয়ে আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব, যা হুকুম করবেন তাই করব, আমাকে এদেশের এই কারাগার থেকে মুক্ত করে দিন, দোহাই আপনার!"

কথাগুলো এমন উন্মত্তের মতন প্রাণপণে চেঁচিয়ে তিনি বলতে লাগলেন যে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। জেলার গর্ডন সাহেবকে ডেকে বললাম তাঁকে সামলাবার জন্য। পরে তাঁকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে এই বলে বিদায় নিলাম যে তাঁর জন্য যথাসাধ্য কিছু করার আমি চেষ্টা করব। তারপর আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, গিয়ে কোন লাভ নেই বলে।

কলকাতার কারাগারেই টিপু সুলতানের এই পুত্রের মৃত্যু হয় পরে। সংবাদপত্রে তার বিবরণ পড়েছি।

শি ল্পী চি না রি ॥ প্রসঙ্গত একজন শিল্পীবন্ধুর কথা এখানে বলতে হচ্ছে। তাঁর নাম জর্জ চিনারি (George Chinnery)। আমার বিলাত যাত্রার কয়েক মাস আগে চিনারি মাদ্রাজ থেকে বাংলা-দেশে আসেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়।

সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার হেনরি রাসেলের একটি প্রতিকৃতি আঁকার জন্য কলকাতার স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাঁকে নিয়ে আসেন। ফার্সী ভাষায় রাসেলকে একটি আবেদনপত্র মারফত অনুরোধ করা হয় প্রতিকৃতির জন্য শিল্পীর কাছে 'সিটিং' দিতে। রাসেল তাতে সম্মত হন। কথা হয় যে তাঁর এই পোর্ট্রেটটি টাউনহলে টাঙিয়ে রাখা হবে। কলকাতার টাউনহল নির্মাণের কাজ তখন পুরোদমে চলছে। চিনারি এই প্রতিকৃতি অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যতদিন তাঁর ক্যানভাসের একটি টুকরোও থাকবে ততদিন তাঁর প্রতিভার ছাপও থাকবে তার উপর।

চিনারি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাগলামি ও খামখেয়ালের অন্ত ছিল না। মনে হয়, মানসিক দৌর্বল্য তাঁর একটা ব্যাধির মতন ছিল, স্বাস্থ্যও মোটেই ভাল ছিল না। অথচ অহমিকাবোধও তাঁর অত্যন্ত প্রবল ছিল। রাসেলের ছবি আঁকার জন্য তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে বলে চীফ জাস্টিস নিজের মাননীয় অতিথি হিসেবেই তাঁকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দু'টি বড় বড় ঘরের একটি অ্যাপার্টমেণ্ট তাঁর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। রাসেল তাঁকে নিজ পরিবারের লোকের মতনই আপনার মনে করতেন এবং ডিনার-টেবিলে একসঙ্গে বসে খেতেন।

কি কারণে জানি না, আমার প্রতি চিনারি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বোধ হয় আমার শিল্পরুচিবোধ সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ছিল। রাসেলের পোর্ট্রেট আঁকার সময় তিনি পর্বে পর্বে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, ছবির 'কম্পোজিশন' দেখিয়ে সমালোচনা করতে বলেছেন, এবং প্রয়োজন হলে একাধিকবার পেন্সিল-স্কেচ করে আবার তা সংশোধন করেছেন। শেষ পর্যন্ত যে স্কেচটি আমার পছন্দ হয়েছে সেইটিকে তিনি তুলি দিয়ে রূপায়িত

করেছেন ক্যানভাসের উপর। সাধারণত কোর্টরুমে বসেই তিনি প্রত্যহ ছবিটি আঁকতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা করে থেকে ছবি আঁকা দেখতাম। কিছুটা উৎকেন্দ্রিক হলেও, তাঁর মতন একজন প্রতিভাবান শিল্পীর সাহচর্য পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ছবি আঁকার কাজ করতেন। মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য আঁকতে একটু বেশি সময় লেগেছে। প্রায় তিন মাসে ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। ক্যানভাসের উপর শেষ আঁচড় দেবার পর রাসেলের মূর্তিচিত্রের দিকে চেয়ে সত্যিই আমার খুব আনন্দ হল। আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা! আমি খুশি হয়েছি জেনে চিনারিও খুব আনন্দিত হলেন।

দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ গভীর হল। ছবি আঁকা শেষ হবার পর একদিন তিনি বললেন যে তাঁর জন্য আমাকে একটি কাজ করতে হবে। কি কাজ না জেনেই আমি বললাম, নিশ্চয় করব, খুশি হয়ে করব। পরে শুনলাম, কাজ আর কিছুই না, তাঁর ইচ্ছা হয়েছে আমার একটি ছবি আঁকবেন, তার জন্য তাঁর কাছে বসতে হবে। নিজের ছবি আঁকানোর জন্য এই ধরনের বসাবসিতে আমি কখনই রাজী হতাম না, যদি অনুরোধটা চিনারির মতন কেউ না করতেন। আমি রাজী হলাম, আমার ছবিও আঁকা হল। কলকাতার কোর্ট-হাউসে স্যার হেনরি রাসেলের ডাইনিংরুমের একটি কোণে এই ছবিটি টাঙানো আছে।

ইংলণ্ড যাত্রা॥ কলকাতা থেকে বিদায় নেবার দিন এগিয়ে এল। যে স্লুপটি পাঁচশো টাকা দিয়ে ভাড়া করেছিলাম জাহাজে মালপত্র পৌঁছে দেবার জন্য, কলকাতা থেকে যাবার জন্য সেইটাই আবার ঠিক করলাম। ৯ ফেব্রুয়ারি (১৮০৮) কলকাতা থেকে যাত্রা

করার দিন স্থির হল। হাতে মাত্র কয়েকটা দিন, টুকিটাকি কাজকর্ম অনেক বাকি। সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটের কাজ হল এখানকার আসবাবপত্তর নিলেমে বিক্রির ব্যবস্থা করা। মেসার্স টুলো, ড্রিং অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে বিখ্যাত অকৃশনিয়ারকে নিলেমের ভার দেওয়া হল। নিলেমের একমাস পরে টাকা দেওয়ার প্রচলিত নিয়ম থেকে তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দিলেন। বিক্রির পর আমি মোট ১৮,৩৫০ সিক্কাটাকা পেলাম, যা আশা করেছিলাম তা থেকে প্রায় দশহাজার টাকা কম। তার কারণ জিনিসগুলি জলের দরে বিক্রি হয়ে গেল নিলেমে। একজোড়া বিরাট আকারের আয়না, পাঁচ-ছ'হাজার টাকায় কেনা, বিক্রি হল মাত্র আটশো টাকায়। প্রায় দশহাজার টাকা দামের কতকগুলি ভাল ভাল ছবি মাত্র বারশো টাকায় বিক্রি হল। অন্যান্য জিনিসের তো কথাই নেই। কেবল প্লেট বিক্রি হয়েছিল মোটামুটি ন্যায্য দামে, বাকি সব জলের দরে গেল।

৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি দু'দিন আমার পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যদের টাকাপয়সা মিটিয়ে দিলাম। তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে চলে যেতে হবে একথা ভেবে মনটা বিষণ্ণ হয়ে ছিল। এতদিন তারা যে অকাতরে আমাকে সেবা করেছে, শুধু টাকা দিয়ে তার প্রতিদান দেওয়া যায় না। তবু টাকা ছাড়া কি-ই বা আমি দিতে পারি। সাধ্য মতন যা পারলাম তাদের টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় নিলাম। সর্বসাকুল্যে আমার তহবিলে টাকা ছিল তখন একলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো সাতাশী টাকা, তা থেকে এখানে সব দিতে-থুতে প্রায় তিনভাগের একভাগ খরচ হয়ে যাবে। পুরনো একটি অ্যান্যুইটি নতুন করে চালু করতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হল। মোট পুঁজি থেকে বাকি যা খরচ হল তার হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—

মোট পুঁজি	১৪৯,১৮৭৲
তা থেকে খরচ হল :	
অ্যানুইটির জন্য	৫০০০৲
কেবিন ও জাহাজ ভাড়া	৮০০০৲
মদিরাদি সুরা বাবদ	১২৩৫৲
ফার্নিচার, কাপড় চোপড় ইত্যাদি	২০,৮০০৲
কেরানী রামধন ঘোষকে উপহার ও গৌরচরণ দে'র কাছে তাঁর ঋণ বাবদ	১৮০০৲
ভৃত্যদের (৬৩ জন) তিন মাসের বেতন	২০০০৲

ভৃত্যদের বিবরণ :

১ খানসামা	১ দর্জি
১ বাটলার	২ দ্বারোয়ান
৮ খিদমৎগার	২ ধোপা
১ হেয়ারড্রেসার	১ টিনার
২ আবদার	২ মেথর
১ কম্প্রাডোর	১ ডুরিয়া
২ বেকার	৪ সহিস
২ রাঁধুনি	৩ ঘাসকাটা
৯ বেয়ারা	১ কোচম্যান
৫ হরকরা	২ ভিস্তি
৩ মশালচি	৫ চাকর (গোলাপ ও টিপি দাসীর জন্য)
৪ মালি	

মোট ৬৩ জন

জর্জ টাইলার বাবদ	৬২৩০৲
গোলাপ দাসীর জমি ও বাড়ি বাবদ	৩৫৪২৲
টিপি দাসীর জমি ও বাড়ি বাবদ	১৫০০৲
মন্নুর মা'কে মন্নুর জন্য	৫০০৲
স্লুপ ভাড়া	৫০০৲

ইংলণ্ডের উপর বিলের জন্য	৪০৮০৲
সেণ্ট হেলেনার খরচের জন্য	২০০০৲
	মোট ৫৭,১৮৭৲
	বাকি রইল মোট ৯২,০০০৲

এই বিরানব্বুই হাজার টাকা সম্বল নিয়ে ইংলণ্ড যেতে হবে, অর্থাৎ এই টাকার আয় থেকে সেখানে চালাতে হবে। শতকরা আট টাকা হারে স্নুদে কলকাতায় কোম্পানির ট্রেজারিতে টাকাটা জমা দিয়ে ছ'মাস অন্তর লণ্ডনে আমার নামে স্নুদটা পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলাম। এই হারে বাৎসরিক স্নুদ হয় প্রায় ৯২০ পাউণ্ড, বার-তের হাজার টাকার মতন। তাতেই আমার জীবনের বাকি দিনগুলো কোনরকমে চলে যাবে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। তাছাড়া ইংলণ্ডে পৌঁছে আগে 'বিল' কিনে জমানো প্রায় ১৭০০ পাউণ্ড পাবার কথা। তাতেও অনেক খরচ কুলিয়ে যাবে।

৯ ফেব্রুয়ারি স্যার হেনরি রাসেলের সঙ্গে শেষ ডিনার খেলাম। আজকেই যাত্রা করার কথা ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ জরুরী কারণে ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালের আগে জাহাজ ছাড়বে না বলে খবর পেলাম। ভালই হল, আরও দিন দুই সময় পাওয়া গেল, দেখা-সাক্ষাতের কাজ কিছু সেরে নেওয়া যাবে। ১০ ফেব্রুয়ারি মাস্টার-অ্যাটেণ্ডেণ্ট ক্যাপটেন্ থর্নহিলের বাড়ি আমার 'কাসল ইডেন' জাহাজের ক্যাপটেন কলনেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং আমরা একসঙ্গে অনেকে মিলে ডিনার খেলাম। কলনেট বললেন যে গবর্নমেণ্টের অর্ডার অনুযায়ী এবার থেকে সমস্ত জাহাজের কমাণ্ডারদের চব্বিশ ঘণ্টা আগে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেজন্য তিনি একটি ছোট বোট ভাড়া করেছেন, তাতে করে কাল সকালেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন

এবং ফলতায় গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। ফলতায় আমি পৌঁছলে একসঙ্গে সাগরদ্বীপ যাওয়া হবে। ১০ তারিখ দুপুর বেলা স্লুপে করে আমি খানসামা, রাঁধুনি ও ভৃত্যদের জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। তাদের বলে দিলাম ফলতায় পৌঁছে আমি না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

১১ ফেব্রুয়ারি দুপুর বেলা বন্ধু লেডলি ভাল করে টিফিন খাওয়ালেন। কিন্তু আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে সমস্ত মনটা এমন একটা অব্যক্ত বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে একটি খাবারও গলা দিয়ে নামল না। কেবল দু'তিন গ্লাস ক্লারেট পান করলাম। লেডলির গাড়ি দরজাতেই মোতায়েন ছিল, বিদায়কালীন কোন ভণিতা না করে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরে, আটমাইল দূরে লেডলির বাগানবাড়ির দিকে রওনা হলাম। সেখানে আমার সেই শখের পুরনো পান্‌সিটি ঘাটে বাঁধা ছিল। যদিও পান্‌সিটি বিক্রি করে দিয়েছিলাম, তাহলেও আমার বিদায়যাত্রার জন্য মালিক সেটি পাঠাতে কুণ্ঠিত হননি। পান্‌সিতে আমার ইংলণ্ডের সঙ্গী বালক-ভৃত্য মন্নু, সর্দার-বেয়ারা ও আরও তিনজন ভৃত্য অপেক্ষা করছিল। তাদের নিয়ে গার্ডেনরীচের ঘাট থেকে পান্‌সি ছেড়ে দিলাম।

দীর্ঘকাল বাংলাদেশে থাকার পর আজ তার কোল ছেড়ে যেতে কষ্ট হল।

লেডলির বাগানবাড়ি থেকে ফলতা মাইল পঁচিশ দূর, ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগে পৌঁছে যাব। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা হাওয়া বইতে আরম্ভ হল যে ফলতা পৌঁছতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেল। ফলতায় পৌঁছে ঘাটের কাছাকাছি কোথাও আমার ক্যাপটেনের বোট দেখতে পেলাম না। আমার ভৃত্যদের নৌকাও দেখা গেল না। হরকরা পাঠিয়ে গ্যামেজ অ্যাণ্ড সণ্ডার্সের ট্যাভার্ন

চারিদিকে জলের উপর, দূরে সবুজ মাঠের উপর আলো ঝলমল করছে। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছা হল মাঝিদের বলি, চল আবার কলকাতায় ফিরে যাই। কথাটা যেন বলতে গিয়েও বলা হল না। মনের যে অবস্থা হয়েছিল, তাতে ক্যাপটেন সঙ্গে না থাকলে সত্যিই হয়ত কলকাতায় ফিরে যেতাম।

যথাসময়ে সাগরদ্বীপে জাহাজের কাছে এসে পৌঁছলাম। মন্নুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কেবিনে ঢুকলাম। দাঁড়িমাঝি ও ভৃত্যদের নিয়ে স্লুপটি কলকাতায় ফিরে যাবে। ভৃত্যরা বিদায় নিতে এল। প্রত্যেকের চোখে জল, কয়েকজন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি নিজেও যে তাদের সামনে এরকম অসহায় দুর্বলের মতন কেঁদে ফেলব ভাবতে পারিনি। তাদের স্লুপ ছেড়ে দিল। আমরা কেবিনে বসে রইলাম, কালাপানি পাড়ি দেবার অপেক্ষায়।

বালক মন্নুর গাল বেয়ে টস্‌টস্‌ করে চোখের জল পড়তে লাগল। কেবিনের জানলা খুলে একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল ভৃত্যদের সেই নৌকার দিকে, যতদূর দেখা যায়। নৌকা মিলিয়ে গেল দূরে, মনে হল যেন গার্ডেনরীচে—আরও একটু দূরে বাংলাদেশের কলকাতায়।

চিঠিপত্র

এলিজা ফে

১৭৮০-৮২ খ্রীষ্টাব্দ

১

কলকাতা, ২২ মে ১৭৮০

প্রিয় বন্ধু,

তোমরা শুনে নিশ্চয় আনন্দিত হবে, অবশেষে প্রায় বারো মাস আঠারো দিন পরে আমি কলকাতা শহরে এসে পৌঁছেছি। কলকাতা আমার কল্পনার শহর, কতদিন কত দীর্ঘশ্বাস যে ফেলেছি এই শহরের কথা মনে করে তার ঠিক নেই। আমার কত কামনা-বাসনা, কত ভয়-ভাবনা, ভবিষ্যতের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত বিলাস-ব্যসনের স্বপ্ন যে এই মহানগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেই কলকাতার বিবরণ দেবার আগে মাদ্রাজের কথা একটু বলে নিয়ে আরম্ভ করব।

মিস্টার ফে ও মিঃ পপহাম দু'জনেই আমাকে বলেছিলেন যে সমুদ্রতীরে আলাদা নৌকা আমাদের জন্য ঠিক থাকবে, কিন্তু তীরে পৌঁছে দেখলাম কিছুই ঠিক নেই। নিরুপায় হয়ে তাই একটি মালবাহী নৌকায় আমরা যাত্রা করলাম। নৌকাটিতে যাত্রীদের জন্য একটুও জায়গা ছিল না, আমি কোনরকমে একটা খুঁটির পিঠে বসবার একটু ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। যে-কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, মিস্টার ফে অনেক কষ্টে আমাকে সামলে রেখেছিলেন। ঢেউয়ের আঘাতে মধ্যে মধ্যে নৌকাটি এমন টলমল করছিল যে আমাদের বাঁচবার কোন আশা ছিল না। সহযাত্রীদের মধ্যে মি ও'ডনেল

ও মিস্টার মুর নানাভাবে আমাদের জমিয়ে রেখেছিলেন। ক্রমে বিপদের উদ্বেগ আমাদের মন থেকে কেটে গেল, নৌকাও বেশ বেগে চলতে থাকল ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে, এবং দূর থেকে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরীর জগন্নাথের মন্দির। তিনটি বড় বড় পিরামিডের মতন অট্টালিকা, হিন্দুদের বিখ্যাত দেবালয়।

মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁর পূজার্চনার জন্য বিরাট পুরোহিতবাহিনী নিযুক্ত। শুনেছি, বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে মূর্তিগুলিকে মন্দিরের বাইরে আনা হয় এবং বিশাল একটি রথের উপর বসিয়ে হাজার হাজার লোক তার দড়ি ধরে টানতে থাকে। ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জগন্নাথের রথের চাকার তলায় প্রণিপাত হয়ে আত্মোৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস দেবতার উদ্দেশে এইভাবে জীবন দান করলে সশরীরে স্বর্গবাসের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। খ্রীস্টধর্মের অমর বাণী এদের কর্ণকুহরে এখনও প্রবেশ করেনি, তাই আজও এরা কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায় ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন সমস্ত মানুষ জ্ঞানের আলোকস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এবং মানবজাতির মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয়ে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হবে। আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান হব।

গঙ্গার শাখা হুগলী নদীর তীরে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত। তার ন' মাইল দক্ষিণে গার্ডেনরীচে নৌকা ভিড়লে শহরের চমৎকার রূপ দূর থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নদীর তীর ধরে মনোরম অট্টালিকা গড়ে উঠেছে, মাদ্রাজের মতন কলকাতাতেও এগুলিকে 'বাগানবাড়ি' বলা হয়। প্রত্যেকটি বাড়ির চারিদিকে বাগান, সামনে সবুজ ঘাসের 'লন' নদীর পাড় দিয়ে জলের কিনার

পর্যন্ত নেমে গেছে। তীর ধরে বরাবর এরকম একটার পর একটা বাড়ি, বাগান ও লন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চোখ মেললে দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, সবুজের ঢেউয়ের উপর দিয়ে দুলতে দুলতে গিয়ে কলকাতার কোল স্পর্শ করে। বাগানবাড়িগুলি কলকাতা শহরের সমৃদ্ধি ও সুরুচির সাক্ষী হয়ে যেন তীরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নদীর দৃশ্যও অপূর্ব। লণ্ডনের টেম্‌স নদীর চেয়ে অনেক প্রশস্ত। নদীর বুকের উপর অসংখ্য নৌকা ভাসছে, সারি সারি নোঙর করা রয়েছে, কতরকম গড়নের, কত বিচিত্র আকারের সব নৌকা যে তা বলা যায় না। এত বিচিত্র নৌকার সমাবেশ কোন নদনদীর বুকে দেখিনি কখনও। নদীর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য নৌকাগুলির জন্য আরও বেড়েছে। সাপমুখো (হাঙ্গরমুখো) নৌকাগুলো কী সুন্দর! কতকগুলি নৌকা ছিপছিপে গড়নের, জলের সঙ্গে মিশে তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলেছে (জেলেডিঙ্গি)। বজরা-নৌকাগুলো বেশ বড়, একটি পরিবারের সকলে মিলে তাতে আরামে যাওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের নানারকমের সব বাণিজ্যতরী, তার পাশে রণতরী, এবং তার সঙ্গে রঙবেরঙের সুসজ্জিত বাহারে সব বিলাস-বজরার বিচিত্র সমাবেশে নদীর উপর চমৎকার একটি নয়নাভিরাম চিত্রপট রচিত হয়েছে। সুন্দর উজ্জ্বল আবহাওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটি যেন ঝল্‌মল করছে মনে হয়।

হুগলী নদীর পূর্বতীরে কলকাতা শহর। তীর থেকে ফোর্ট উইলিয়াম ও এসপ্লানেড পার হয়ে এলে শহরের রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফোর্টের সামনে জায়গাটিকে ‘এসপ্লানেড রো’ বলা হয়। বড় বড় প্রাসাদে ভরা জায়গাটি। গবর্নমেণ্ট হাউস ও কাউনসিল হাউস ছাড়া বাকি সমস্ত বাড়িঘর শহরের সেরা ভদ্র-লোকদের বাসগৃহ। ফোর্টের মধ্যে সামরিক বিভাগের লোকজন

ছাড়া আর কাউকে বাস করতে দেওয়া হয় না। মাদ্রাজের সঙ্গে কলকাতার পার্থক্য হল, ফোর্ট সেণ্টজর্জে সবরকমের লোক বাস করে, কলকাতার ফোর্টে তা করে না। সেইজন্য মাদ্রাজের ফোর্ট অনেকটা শহরের মতন দেখতে, কলকাতার ফোর্ট দেখতে সামরিক তুর্গের মতন। তা ছাড়া কলকাতার ফোর্ট এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত, সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে চারিদিকে এমন সুন্দর করে সাজানো, ঢালু জমি, বাঁধ, পাড় সব—যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, সামরিক রুক্ষতার কথা মনেই পড়ে না। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশই মনোরম। উত্তাপ বেশি হওয়া সত্ত্বেও (দিনের বেলা ৯০ ডিগ্রীর কম থাকে না) পরিপার্শ্বের সবুজতার হানি হয় না। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশ যেমন নীরস রুক্ষ মূর্তি ধারণ করে, ফাটাচোরা মাটির দিকে চেয়ে মনে হয় যেমন গাছপালা কোনদিনই জন্মাবে না, এদেশে কখনও তা মনে হয় না। দিনের উত্তাপ রাতের হিমে শীতল হয়ে যায়, শুক্‌নো মাটিতে রস সঞ্চারিত হয়, প্রাণের স্পন্দনের মতন তার উপর তৃণগুচ্ছ গজিয়ে ওঠে। এদেশের গরু-মহিষ ছাগলভেড়া এই সবুজ তৃণ খেয়ে বেঁচে থাকে। বাংলাদেশের 'মাটন' তাই খেতে খুব সুস্বাদু এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলকাতার কাছে সুন্দর একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে, শহরের শৌখিন লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বেড়াতে যান।

কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ পরিবারে আমরা অতিথি হলাম। ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন, কিন্তু থাকতেন তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে। কলকাতা থেকে বিশ-তিরিশ মাইল দূরে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে তাঁর জন্ম এবং দীর্ঘকাল অনভ্যাসের জন্য নিজের দেশী ভাষায় (ফরাসী) কথা বলতে অক্ষম, যদিও অন্যে কথা বললে বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধা হত না। আমি অনেক কষ্টে পর্তুগীজ ভাষা কিছুটা শিখেছিলাম, কথা বললে বুঝতে পারতাম। অতএব

আমাদের দু'জনের কথাবার্তা হত পর্তুগীজ ও ফরাসীতে, তিনি পর্তুগীজে বলতেন, আমি ফরাসীতে উত্তর দিতাম। এই ভাব-বিনিময়ের ফলে এদেশের অনেক রীতিনীতিপ্রথা সম্বন্ধে আমি বেশ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য থেকে আরম্ভ করে প্রাত্যহিক জীবনের বহু প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করেছি।

সমস্ত বিপদ-আপদ ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও আমাদের পরিচয়-পত্রগুলি আমরা যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার স্বামী ওকালতি করবার জন্য এসেছেন, জজদের কাছে ভাল প্রশংসাপত্র না দেখাতে পারলে তাঁর ওকালতির অনুমতি পাওয়ার কোন আশা নেই। অল্পদিনের মধ্যেই স্যার রবার্ট চেম্বার্সের সঙ্গে আলাপ হল এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেরই বিশেষ প্রীতির পাত্র হয়ে উঠলাম আমরা। অসুস্থতার জন্য আমি তাঁর অভ্যর্থনা-উৎসবে যেতে পারব না বলে তাঁরা কোন ব্যবস্থাও করেননি। কিন্তু এত ভদ্র তাঁরা যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আমার সঙ্গে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীর গৃহে দেখা করতে এসেছিলেন। মিসেস চেম্বার্সের মতন সুন্দরী মহিলা আমি কখনও চোখে দেখিনি। তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। তার উপর তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টি কথাবার্তার জন্য তাঁর সৌন্দর্য আরও শত-গুণ বেড়ে যায়। একবার তাঁর কাছে এলে আর দূরে সরে যাওয়া যায় না। আমাদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা তাই প্রতিদিন বাড়ছে। মিসেস চেম্বার্স প্রতিদিন যত আমার দুঃখের কাহিনী শুনছেন তত তাঁর কোমল হৃদয় গভীর সহানুভূতিতে আরও কোমল হচ্ছে।

কলকাতা, ২৯ মে ১৭৮০

মিসেস হেস্টিংসের কাছেও আমাদের পরিচয়পত্র পাঠিয়েছি। অনেক আগেই তাঁর কাছে গিয়ে আমার পরিচয় করা উচিত ছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তা পারিনি। হেস্টিংস বেলভেডিয়ার হাউসে

থাকেন, শহর থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। গ্রীষ্মকালে এতটা পথ যাতায়াত করা কষ্টকর, বিশেষ করে আমার মতন পঙ্গুর পক্ষে। সৌভাগ্যবশত মহিলা বাড়িতে ছিলেন এবং সেদিন তাঁর তিনজন বান্ধবীও এসেছিলেন বেড়াতে। তাঁদের মধ্যে একজন, মিসেস মট (Mrs. Motte), চমৎকার মহিলা। মিসেস হেস্টিংসের অসাধারণত্ব প্রথম নজরেই চোখে পড়ে, বোঝা যায় যে সাধারণ মেয়েদের থেকে তিনি একেবারে ভিন্ন জাতের। কিন্তু তাঁর বাইরের চেহারায় একটা উদ্‌ভ্রান্তের ছাপ আছে। তার কারণ, তাঁর অঢেল সোনালি কেশরাশি এমন আলুথালু অবস্থায় গোল-গোল করে জড়িয়ে মুখের দু'পাশে কাঁধের উপর তিনি ফেলে রেখে দেন, যে প্রথমে দেখলেই কেমন যেন উদাস উদ্‌ভ্রান্ত বলে মনে হয়। অবশ্য এই বিচিত্র কেশবিন্যাসের ফলে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের সারল্য এমন দর্শনীয় হয়ে ভেসে উঠত চোখের সামনে (মনে হয় সেই রূপটাই দেখানো তাঁর ইচ্ছে) যে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হত না। তাঁর বেশভূষা ছিল আরও বিচিত্র; চল্‌তি ফ্যাশানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁর। অন্য মহিলারা যা কল্পনা করতে পারতেন না, এরকম বেশে তিনি সেজেগুজে থাকতেন এবং বাইরের সমাজেও চলে ফিরে বেড়াতেন। বেশভূষার এই উৎকট স্বাতন্ত্র্যটাও তাঁর ইচ্ছাকৃত মনে হয়, নিজেকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কেশগুচ্ছ বলছে 'আমাকে ছাখ', বেশভূষা বলছে 'আমাকে ছাখ'। গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী তিনি, শহুরে সমাজে সম্ভ্রমের সর্বোচ্চ শিখরে সসম্মানে অধিষ্ঠিত, কাজেই বেশ ও কেশ যদৃচ্ছা বিন্যাস করে থাকার ও বেড়াবার অধিকার তাঁর আছে। সমাজের প্রচলিত ফ্যাশানে তাঁর খেয়াল চরিতার্থ হবে না, বরং খেয়ালের জন্য নতুন ফ্যাশান চালু হবে সমাজে।

মিসেস হেস্টিংস এমন একটি উচ্চাসনে বসে সকলের দিকে চোখ নামিয়ে চেয়ে দেখতেন যে অনেক সময় তাঁকে নিষ্ঠুর বলে মনে হত। সকলের কাছ থেকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান দাবী করতেন, কিন্তু তার বদলে তাঁর কাছ থেকে সকলে সমবেদনা বা অনুকম্পা প্রত্যাশা করত না। আমাকে তিনি ভদ্রভাবেই অভ্যর্থনা করলেন, রাত্রে খেতেও বললেন, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণও করলাম, কিন্তু আমার দৈবদুর্বিপাকের কথা শুনে তিনি বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। আমি যখন সব কাহিনী বললাম তখন গম্ভীর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, 'কেবল কৌতূহল মেটানোর জন্য এত দূর দেশে না আসাই আপনাদের উচিত ছিল'।

হায় অদৃষ্ট! কে কার দুঃখ বোঝে! আমি যে শখ করে কৌতূহল মেটানোর জন্য এদেশে আসিনি, আমার স্বামীকে বেহিসেবী অপব্যয়, বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছি, সেকথা বললে মিসেস হেস্টিংস কি বিশ্বাস করবেন বা বুঝতে পারবেন? আমি না এলে আমার স্বামীর বাংলাদেশে আসা হত না এবং তাঁর জীবনটাও নষ্ট হয়ে যেত। এসব কথা কাকে বলব, কে-ই বা বুঝবে! মিসেস হেস্টিংসের কথাবার্তায় আমি খুশি হতে পারিনি, তাঁর উদাসীনতায় মনে কষ্ট পেয়েছি। ভাগ্য যাঁদের উপর প্রসন্ন তাঁরা বোধ হয় কখনও ভাগ্যহীনদের বেদনা উপলব্ধি করতে পারেন না, মনে করেন তাঁরা ভিন্ন একজাতের মানুষ। এই বোধ হয় সমাজের ও সংসারের নিয়ম।

এবারে আমার বাসাবাড়ি সম্বন্ধে কিছু বলব। অতি সুন্দর বাড়ি, দেখলে মনে হয় নিখুঁত। আসবাবপত্তর যা যেখানে দরকার সব সাজানো আছে, বড়লোকের বাড়ি যে তা বলে দিতে হয় না। অর্থ থাকলে যতরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের ব্যবস্থা করা যায়

তার ত্রুটি নেই কোথাও। কিন্তু অর্থ থাকলেই রুচি থাকবে এমন কোন কথা নেই। বাড়িটাতে ঐশ্বর্যের জাঁক আছে, আড়ম্বর আছে, কিন্তু ছিম্‌ছাম রুচির পরিচয় নেই। বিত্তবান যাঁরা, ছিম্‌ছাম থাকার ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন। মধ্যবিত্তরা বরং এদিক দিয়ে অনেক বেশি রুচিবান। বাড়ির বাগানটি বেশ সুবিন্যস্ত, কিন্তু সব বাড়ি সম্বন্ধে একথা কতদূর সত্য জানি না। জানলার শার্শি, খড়খড়ি সবই বন্ধ থাকে, বাইরে খসখসের টাটি ঝুলনো থাকে ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য। দরজা-জানলায় এইরকম খসখসের পর্দা ঝুলিয়ে রাখলে নাকি গরম হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারে না। এই বস্তুটি এর আগে দেখিনি কখনও। সন্ধ্যা না হলে বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমাকে বাইরে বেরুতে দিতেন না, এবং বেরুবার সময় নানারকমের উপদেশ দিতেন।

আগামীকাল সকালে এখানে আমাদের রাজার জন্মতিথি উৎসব পালন করা হবে। আমরা দু'জনেই উৎসবে নিমন্ত্রিত। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমার যাবার উপায় নেই। মিস্টার ফে সাধারণত এই ধরনের উৎসবে কিছুতেই যেতে চান না।

কলকাতার সুপ্রিমকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার এলিজা ইম্পের সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় হয়েছে। তিনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন এবং পরিচয়পত্রগুলি বেশ খুঁটিয়ে পড়েছেন। পত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সকলকেই প্রায় তিনি চেনেন, কারণ বিলেতে Bar-এর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। মিস্টার ফে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের অনুমতি নিয়ে আসেন নি বলে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে হয়তো স্যার এলিজা তাঁকে এখানকার আদালতে ঢুকতে নাও দিতে পারেন। কিন্তু সন্দেহটা প্রকাশ করা মাত্রই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "না মশায় না, আপনার কোন চিন্তা নেই। এইসব কাগজপত্র নিয়ে আপনি যদি ইংলণ্ড থেকে

না এসে একেবারে উপরের মেঘলোক থেকেও সোজা কলকাতায় নেমে আসতেন, তা হলেও আপনাকে কোর্টে ওকালতি করার অনুমতি আমি দিতাম। মনে রাখবেন, সুপ্রিমকোর্ট সর্বব্যাপারে স্বাধীন, কারও হুকুম মেনে চলে না। তা তিনি যত বড় কর্তা-ব্যক্তিই হন না কেন। আপনি কোম্পানির ডিরেক্টরদের অনুমতি নিয়ে এসেছেন কি না তা আমাদের জানার দরকার নেই। আমরা দেখব, আপনি একজন যোগ্য শিক্ষিত ব্যারিস্টার কি না। অতএব আমাদের Bar-এ আপনাকে প্রবেশ করতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

জাস্টিস হাইডের সঙ্গেও মিস্টার ফে-র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্যার এলিজা। এই সব কথাবার্তার মধ্যে এলিজার যে বলিষ্ঠ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। এখানে দেখছি গবর্নমেণ্ট ও সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধের ভাব আছে। উভয়েরই চিন্তা, কেউ কারও স্বাধীন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করছে কি না। কোম্পানির অ্যাটর্নি মিস্টার নেলর আদালতের অবমাননার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে সরকার ও বিচারবিভাগের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রসঙ্গত আমি বিষয়টির উল্লেখ করলাম, কারণ সরকার-আদালতের বিবাদে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। কোর্টের কাজ চললেই আমরা খুশি। মিস্টার ফে এর মধ্যেই অনেক মামলা পেয়েছেন। এখন সব সময় তাঁকে এই মামলার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আমার মনে হয় তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য সফল হবে।

•

কলকাতা, ২০ জুলাই ১৭৮০

অবশেষে হায়দার আলি তাঁর মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে বিপুল উদ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। আমরা যে ঠিক

সময় মতন নিরাপদে চলে আসতে পেরেছি, সেটা নেহাত অদৃষ্টের জোরে বলতে হবে। সম্প্রতি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি আরবের বিশাল মরুভূমির ভিতর দিয়ে, আলেপ্পোর পথে এদেশে এসেছেন। তিনি বললেন যে এপথে কোন ইয়োরোপীয় মহিলা যাত্রীর পক্ষে নিরাপদে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং যাত্রাপথে আমরা আরও অনেক বেশি বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারতাম। কর্ণাটকে হায়দারের সৈন্যদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী অনেক শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তা এত মর্মান্তিক যে চিঠিতে বিস্তারিত না লেখাই ভাল।

কাজকর্মে আমি যে কত ব্যস্ত থাকি তা তোমরা ভাবতে পারবে না। লেডী চেম্বার্স অনুগ্রহ করে তাঁর কয়েকটি পোশাক ধার দিয়েছেন। সেগুলি দেখে আমি আমার প্রয়োজনীয় পোশাক তৈরি করে নেব। এর মধ্যে গৃহস্থালীও আরম্ভ করে দিয়েছি। একাজ যে কত কঠিন এদেশে তা তোমাদের জানা নেই। ভৃত্যরা এখানে কাজ করতে চায় না, বিশেষ করে যে-কাজের জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়, সে-কাজে সব সময় তারা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। তাদের উপর প্রহরীর মতন নজর না রাখলে সংসার চালানো যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুক্ষণ আগে একটি ভৃত্যকে একটা ছোট টেবিল নিয়ে আসতে বলেছিলাম। তখন থেকে দাঁড়িয়ে সে যে হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করছে, এখনও থামেনি। অর্থাৎ অন্য চাকরকে সে হুকুম করছে টেবিলটা আনার জন্য। আমি বললাম, তুমি নিজে আনতে পার না? আমি তাকে সাহায্য করতে গেলাম। সে বলল, 'ও, আই নট্ ইংলিশ, আই বেঙ্গলম্যান!' ভৃত্যটি আমাকে মিশ্র ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলে, 'ইংলিশম্যানের' মতন 'বেঙ্গলম্যানের' গায়ে জোর নেই। তু-তিন-জন 'বেঙ্গলম্যান ইক্যুয়াল টু একজন ইংলিশম্যান'। এই হল এখানকার অবস্থা।

আজকে এইখানেই চিঠি শেষ করে বিদায় নিচ্ছি। মনে রেখো, এখানকার প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বসে তোমাদের এত বড় চিঠি লিখতে আমি ক্লান্তিবোধ করিনি। সুতরাং এর উত্তরে তোমরা যদি বেশ বড় চিঠি আমাকে না লেখো, তা হলে আমি সত্যি খুব দুঃখিত হব। আমাদের ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ
ই. এফ.

২

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ১৭৮০

প্রিয় বন্ধু,

গতকাল তোমাদের চিঠি পেয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ! বাইরে থেকে ডাকহরকরার 'বিলেতের চিঠি' হাঁক শুনে আমি ড্রেসিংরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি, মিস্টার ফে-ও তাঁর স্টাডি থেকে দৌড়ে এসেছেন। স্নেহ-ভালবাসার সাড়া পাবার জন্য মানুষের অন্তর বোধ হয় এরকমই আকুল হয়ে থাকে।

অন্য কথা ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরের কথা বলি। ঘরবাড়ির কোন খুঁত নেই কোথাও। কিন্তু তা না থাকলে কি হবে, চারিদিকের চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রবে তিষ্ঠবার উপায় নেই। ইংলণ্ডে ভৃত্যরা বদমায়েস হলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, অথবা কর্মচ্যুত করা হয়। অন্যান্য ভৃত্যরা তাই দেখে শিক্ষালাভ করে এবং সাবধান হয়ে যায়। এদেশের ভৃত্যদের মানুষ হিসেবে কোন মর্যাদাবোধ নেই। কটু কথা বললে বা অপমান করলে তারা লজ্জা পায় না। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমার এই ভৃত্য-বেষ্টিত শোচনীয় অবস্থাটা তোমরা বুঝতে পারবে।

আমার খানসামা সেদিন এক গ্যালন দুধ ও তেরটা ডিম এনেছিল দেড় পাঁইটের মতন কাষ্টার্ড তৈরি করার জন্য। লোকটা যে কত বড় নির্লজ্জ চোর তা হিসেব দেখেই বুঝতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা ইঙ্গিত করতে সে আমাকে ভয় দেখাল। বাধ্য হয়ে

তাকে তাড়িয়ে অন্য একজন খানসামা নিযুক্ত করলাম। সাবধান করার জন্য গোড়াতেই নতুন লোকটিকে বলে দিলাম, 'ছাখো বাপু, সব জিনিসের বাজার-দর আমি জানি, সুতরাং বেশ বুঝেসুঝে কেনা-কাটা করবে এবং আমাকে হিসেব বুঝিয়ে দেবে।' একথার উত্তরে সে আমাকে বলল, 'তা হলে আমাকে ডবল মাইনে দিতে হবে।' এই কথা বলার পর তাকে আমি বিদায় করে দিলাম। আগের খানসামাটি একদিন এসে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল, আবার তাকে কাজে নিযুক্ত করলাম। পায়ে হাত দিয়ে 'সেলাম' করতে এরা খুব অভ্যস্ত। কিন্তু এতটা দৈন্য ও দাসত্ব স্বীকার না করে যদি তারা সততা সম্বন্ধে একটু সচেতন হত তা হলে ভাল হত। লোকটা যে ধূর্ত তা আমি জানি। তবু সে পুরনো লোক, আমার রুচি-প্রকৃতি জানে, সুতরাং ঠকাবার আগে অন্তত একটু চিন্তা করবে ও সাবধান হবে। এই কথা ভেবে পুরনো খানসামাকেই কাজে বহাল করা সাব্যস্ত করলাম। আমার অনুমান খুব মিথ্যা হল না। আগে সে আমাদের প্রত্যেকের জন্য ১২ আউন্স করে মাখনের হিসেব দিত, এখন সে নিজেই স্বীকার করে যে ৪ আউন্সের বেশি লাগে না।

আমার মনে হয়, এইসব বিষয় নিয়ে ইংলণ্ডে তোমাদের যে চিঠি লিখি সে খবর ভৃত্যরা জানে। তা না হলে ওদের নিজেদের এত কথা আমি শুনতে পেতাম না। সম্প্রতি আমার বাজার-সরকার চাকরি ছেড়ে চলে গেছে, এবং যাবার সময় নাকি ভৃত্যদের কাছে বলে গেছে যে আমার মতন মানুষের কাছে তাদের মতন গরীবদের নোক্‌রি করা পোষায় না। অন্য বাড়িতে কাজ করলে কম্‌সে-কম্‌ একটাকা করে তার দৈনিক উপ্‌রি থাকে, মাইনে ছাড়াও। কিন্তু আমার কাছে কাজ করলে দৈনিক দু'এক আনা থাকে কিনা সন্দেহ, এবং তাও আবার আমার বক্‌বকানিতে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তাহলে বুঝতে পারছ, কিরকম হিসেবী গৃহিণী

আমি। তোমরা বোধ হয় একথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। বাজার-সরকার আর আমি রাখব না ঠিক করেছি, কারণ খানসামারই এই কাজ করা উচিত। এত চাকরবাকর নিয়ে সংসারের খরচ কুলানো অসম্ভব। সামান্য দু'চার আনা পয়সা রোজগার করার জন্য এদেশের লোক যে কি করতে পারে বা পারে না তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। এখানে এখন আইনসম্মত সুদের হার হল শতকরা ১২৲ টাকা, কিন্তু ছোট ছোট দোকানদাররা তার দ্বিগুণ হারে টাকা সুদ খাটায়। প্রতিদিন অল্প টাকা লেনদেন করে তারা কড়ায়-গণ্ডায় সুদ কষে আদায় করে নেয়। এদেশে এখনো কড়ির প্রচলন আছে বলে একটা কানাকড়িও সুদ তারা ছাড়ে না। ৫১২০ কড়িতে একটাকা হয়। এখানকার সবচেয়ে মারাত্মক প্রথা হল বেনিয়ান রাখা। এই বেনিয়ানরা হাজার রকম প্রতারণা-কৌশলের উদ্‌ভাবক। টাকাপয়সার সমস্ত লেনদেন বেনিয়ানদের হাত দিয়ে করতে হয় বলে পদে পদে তারা মুনাফা আদায় করে নেয়।

এবারে আমার সংসারের খরচপত্তর এবং এখানকার দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে কিছু বলব। আমাদের বাড়িভাড়া হল মাসে ২০০৲ টাকা। কলকাতার খুব অভিজাত পাড়ায় থাকলে ভাড়া ৩০০৲ থেকে ৪০০৲ টাকা হত। এখন আমরা যে পাড়ায় থাকি সেখানে ভাড়া একটু কম। অন্য জায়গায় আরও একটু ভাল বাড়িতে উঠে যাব ভাবছি। ইংলণ্ডে থাকতে শুনেছি যে বাংলাদেশের অত্যধিক গরমের জন্য ক্ষিদে পায় না, কিন্তু এখানে এসে তার বিশেষ কোন প্রমাণ পাচ্ছি না। গরম বেশি বটে, কিন্তু ক্ষিদেও বেশ প্রচণ্ড, খাদ্যও প্রচুর দরকার হয় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। বেলা দু'টোর সময় ভর দুপুর বেলায় আমরা মধ্যাহ্নভোজন করি। এখন আমাদের খাবার সময় হয়েছে। মিস্টার ফে বাজপাখির মতন লুব্ধ দৃষ্টিতে খাবার

টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। আমি অসুস্থ হলেও খাবার ইচ্ছা আমারও বেশ প্রবল। কি কি খাদ্য আমরা খাই জান? একটা সুপ, মুর্গীর রোস্ট, ভাত ও মাংসের ঝোল, ভাল চীজ, টাটকা মাখন, চমৎকার পাউরুটি, মটনের তরকারী, কচি ভেড়ার রাং, পায়েস, টার্ট এবং এর সঙ্গে উপাদেয় পানীয় মদিরা। খাদ্যের বাহুল্য দেখে মনে হবে, ভোজনটা বুঝি এদেশে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ঠিক তা নয়, কারণ একটা গোটা ভেড়ার দাম দু'টাকা, একটা বাচ্চা ভেড়ার দাম এক টাকা। ছ'টা মুর্গী বা হাঁস বা পায়রা এক টাকায় পাওয়া যায়। বারো পাউণ্ড পাউরুটির দাম এক টাকা, দু'পাউণ্ড মাখনের দাম এক টাকা। ভাল চীজের দাম আগে কলকাতায় খুব বেশি ছিল; তিন-চার টাকা করে পাউণ্ড, কিন্তু এখন অর্ধেক দামে দেড় টাকায় পাওয়া যায়। বিলেতী ক্ল্যারেটের বোতল ষাট টাকায় এক ডজন। দাম ও তালিকা দেখে মনে করো না যে প্রতিটি খাদ্য আমরা প্রত্যহ খাই। মধ্যে মধ্যে খেতে হয়, তবে কদাচিৎ এরকম ভূরিভোজনের সুযোগ ঘটে।

বেশ সাবধানে ভেবেচিন্তে এদেশে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। তা না হলে লোভে পড়ে বেশি খরচের সম্ভাবনা থাকে, এবং দরকার হলেই অতি সহজে যেহেতু টাকা ধার পাওয়া যায়, তাই খরচের লোভও সামলানো যায় না। আমরা কল্পনা করিতে পারিনি যে টাকা ধার পাওয়া এখানে এত সহজ ব্যাপার হতে পারে। কলকাতার ইয়োরোপীয় দোকানদাররা সব সময় জিনিসপত্তর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, এবং বেনিয়ানরাও টাকা ধার দেবার জন্য নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিতে থাকে। কেউ বলে, 'সাহেব, আমাকে তোমার বেনিয়ান রাখ, আমি পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেব।' কেউ বলে সাত হাজার,

কেউ দশ হাজার। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যয়বিলাসিতার সুযোগ এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি, কারণ বাবুগিরির খরচ যোগানোর জন্য বেনিয়ান বা টাকা ধার পাওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কোম্পানির 'রাইটার'দেরও তাই দেখা যায়, চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই চরম বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। বয়সে যুবক বলে তাঁদের বিলাসিতা অতি দ্রুত শৃঙ্খলহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। এরকম কয়েকজনকে আমি দেখেছি, শহরে আসার দু'তিন বছরের মধ্যে মাথার চুল পর্যন্ত ঋণে ডুবে গেছে। তাঁদের পরিত্রাণের আর কোন পথ আছে বলে মনে হয় না। সুদের হার এখানে শতকরা ১২৲ টাকা। বেনিয়ানরা মুচলেখা নিয়ে টাকা ধার দেয়। বছরের শেষে সুদ কষে আসলের সঙ্গে যোগ করে, সুদে-আসলে মিলে বছরে বছরে ঋণের সংখ্যাটি ফুলে-ফেঁপে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বেনিয়ানের 'মাস্টার' (মাস্টার হলেও আসলে তিনি বেনিয়ানের দাস) ক্রমে এই ঋণের তলায় অসহায়ের মতন ডুবতে থাকেন, ঋণ দ্বিগুণ তিনগুণ হতে থাকে। একটি কথাও তিনি বলতে পারেন না, কারণ ঋণ থেকে মুক্তি পাবার তাঁর সাধ্য নেই বলে কেবল গভীরে, আরও গভীরে ডুবে যাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তরও নেই।

আমি তোমাদের আগের চিঠিতে লিখেছি যে মিস্টার ফে গত ১৬ই জুন তারিখে (১৭৮০) সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে প্র্যাক্‌টিস করার অনুমতি পান। তারপর থেকে অনেক মামলা পরিচালনার কাজে তিনি প্রায় সব সময় নিযুক্ত আছেন, এবং মক্কেলরাও তাঁর কাজে খুব খুশি। সকলেই তাঁকে খুব উৎসাহ দেন। এইভাবে যদি তিনি মামলা পেতে থাকেন তা হলে আমাদের দিনগুলো ভালই কাটবে মনে হয়। সোনার মোহরও প্রচুর পাওয়া যাবে, বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরও অভাব হবে না।

ইংলণ্ডের তুলনায় কলকাতায় অ্যাডভোকেটদের ফি (fee) অনেক বেশি।

কয়েক সপ্তাহ আগে স্যার রবার্ট চেম্বার্স তাঁর গাড়িতে করে যাবার সময় একটি দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েন। ঘোড়া ক্ষেপে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবার্ট রীতিমত আহত হন এবং অনেকদিন তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। সম্প্রতি তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, আমি কিন্তু স্যার রবার্টের ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হতে পারিনি, কারণ আমার স্বামী তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাননি। বহুদিন হল মিসেস চেম্বার্সের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ আজকাল তিনি খুব কমই স্বামীকে ছাড়া বাইরে বেরোন। যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে সেইদিনই দুপুরে তাঁদের বাড়ি আমাদের খাবার কথা ছিল। এখন তাঁরা কলকাতার বাইরে চলে গেছেন, কয়েকমাস পরে ফিরবেন।

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ১৭৮০

আর একদফা চিঠি পেলাম তোমাদের এবং তোমরা সকলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ জেনে খুশি হলাম। খবর পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি জাহাজ ছাড়বে, অতএব চিঠি লেখা শেষ করে এখনই এগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে। এখানকার রাজনৈতিক খবরাদিতে চিঠির পৃষ্ঠা ভর্তি করা অর্থহীন, কারণ তার জন্য তোমাদের 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবো ঠিক করেছি। আমার বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই হায়দার আলি বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

মিস্টার হেয়ার অনেকবার আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন। মিস্টার ফে-র ব্যাপারে এখন তাঁর কোন আগ্রহ নেই। এই হল দুনিয়ার নিয়ম, বিশেষ করে হেয়ারের মতন যাঁরা পরিপার্শ্বের দাস,

কেবল সুসময়ের বন্ধু হিসেবেই তাঁদের দেখা যায়। হেয়ার সাহেব আমাদের এইরকমের বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিবরণ শুনে মনে হয়, আমরা যে কষ্ট পেয়েছি তা নাকি আমাদের শাপে বর হয়েছে! তা না হলে হয়ত আমরা সকলে জাহাজডুবি হয়ে মারা যেতাম। ঈশ্বর যে কত কারণে কি ইচ্ছা করে মানুষকে নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য করেন তা বলা যায় না। তাই অনেক সময় দেখা যায়, সবচেয়ে কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে না গেলে জীবনের সুখ ও শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায় না। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর মানুষের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে তোমাদের কি মত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব, পত্রোত্তরে জানিও।

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৭৮০

আর নতুন কথা কিছু লেখবার নেই। আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। এই সময়টা খুব একঘেয়ে মনে হয়, কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। যাঁরা নিয়মিত কাজকর্মের লোক, ছুটির দিনগুলো এখানে তাঁদের বড্ড ক্লান্তিকর মনে হয়। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন! আশা করি আবার আমরা সুখে মিলিত হব। আমাদের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়, এবং যদি অপ্রত্যাশিত কোন অঘটন না ঘটে তা হলে তা মন্দ-হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি।

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ

ই. এফ.

৩

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮০

প্রিয় বন্ধু,

কিছুদিন আগে যে দুঃসংবাদ দিয়েছিলাম তার জের কেটে গেছে। তারপর আরও একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। তাই নিয়ে এখন সকলে আলাপ-আলোচনায় মত্ত। স্বয়ং গবর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের প্রথম সদস্য মিস্টার ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে ডুয়েল লড়াই হয়ে গেছে। দুই পক্ষের গুলি ছোঁড়ার পর গবর্নর ছুটে গিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত ধরে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ রকম অবাঞ্ছিত ব্যাপারের জন্য সত্যিই তিনি আন্তরিক দুঃখিত বলে মনে হয়। শুনেছি গবর্নর-জেনারেল হেস্টিংস খুব ভাল মানুষ। ফ্র্যান্সিস আহত হলেও খুব তাড়াতাড়ি পিস্তলের গুলি তাঁর দেহ থেকে বার করে ফেলা হয়েছিল। তার জন্য তাঁর জ্বর হয়নি, এবং মনে হয় শীঘ্রই তিনি সেরে উঠবেন।

উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার কারণ এই : কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে মিস্টার ফ্র্যান্সিস একটি প্রস্তাব হেস্টিংসের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করেন, এবং কিছুতেই তা প্রত্যাখ্যান করতে চান না। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কি তা সঠিক আমি জানি না, তাই সে-বিষয়ে চিঠিতে মন্তব্য করা থেকে বিরত রইলাম। তা ছাড়া এই সব রাজনৈতিক বিবাদে মাথা গলানোর কোন আগ্রহ আমার নেই, এমন কি কানে শুনতেও আমার বিরক্তি বোধ হয়। ডুয়েলিং

ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা অসভ্য প্রথা মনে হয়। অবশ্য মানুষের জীবনে এমন সব অপ্রত্যাশিত ঘটনার উদ্ভব হয় যে তাতে ডুয়েল লড়ে সমস্যার সমাধান করা ছাড়া উপায় থাকে না। সমাজের যা বর্তমান রীতিনীতি তাতে এছাড়া উপায়ও থাকে না। ভাল বন্ধু-বান্ধবরা এই সব ব্যক্তিগত বিবাদের নিষ্পত্তি করতে পারেন, কিন্তু সে রকম বন্ধু পাওয়াও সহজ নয়। কলকাতার ইংরেজ-সমাজ ফ্র্যান্সিসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি এখন গবর্নমেণ্টের বিরোধীপক্ষের নেতা; সুতরাং ডুয়েলের পিস্তলের গুলিতে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে অনেকেই খুব দুঃখিত হবেন।

গত চিঠি লেখার পর থেকে আমার মুসলমান ভৃত্যদের নিয়ে বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। তার কারণ, কয়েকটি ব্যাপারে তাদের গোঁড়ামি এত প্রবল যে তাতে কোন কাজ চলে না। যেমন মুসলমান খানসামা বা বেয়ারারা শুয়োরের মাংস স্পর্শ করে না। তার ফলে কোনদিন এই খাদ্যটি আমাদের খানাটেবিলে উঠলে তারা টেবিল বা প্লেট কিছুতেই পরিষ্কার করে না। রাঁধুনি বা অন্য ভৃত্যদের তা করতে হয়। এই সংস্কারটা তাদের ধর্মের অঙ্গ বলে আমি বিশেষ আপত্তি করিনি। এ অসুবিধা দেখলাম শহরের সকল ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের ভোগ করতে হয়। কেবল সেনা-বিভাগের লোকরা এই দায় থেকে একরকম মুক্ত বলা চলে। সকলের একই সমস্যা দেখে অবশেষে শহরের ইয়োরোপীয় অধি-বাসীরা মনস্থ করেন যে মুসলমান ভৃত্যদের তারা হয় এই সংস্কারটি ছাড়তে, না হয় চাকরি ছাড়তে বাধ্য করবেন। প্রথমে তারা চাকরি ছেড়ে দেবে ঠিক করল, কারণ সামান্য চাকরির জন্য ইহকাল-পরকালের ধর্ম জলাঞ্জলি দিতে তারা রাজি নয়। তাদের এই সিদ্ধান্তে আমরা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিনচারেক পরে তারা ফিরে এসে পুনরায় চাকরি করার ইচ্ছা জানাল। নিষিদ্ধ

খাদ্যটি স্পর্শ করতে তাদের আর আপত্তি হল না, কারণ তারা বলল যে পরে স্নান করে ফেললে স্পর্শদোষ কেটে যায়। এই স্নান করার আলসেমির জন্য তারা টেবিল বা প্লেট সাফ করতে চাইত না। যাই হোক, এখন সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে, এবং কোন কাজকর্ম করতে তাদের আর কোন সংস্কার বা ওজর-আপত্তি নেই।

প্রথমে যে গুরুতর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি (হায়দার আলির যুদ্ধ), তা হল কর্নেল বেলির সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্নভাবে সংহারের ঘটনা। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আমরা এই দুর্ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পারব। জবরদস্ত সেনাধ্যক্ষ স্যার আয়ার কুট কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন; এবং প্রতিপক্ষের অসংযত সেনাদলকে প্রচণ্ড আঘাত করে শায়েস্তা করবেন। এই যুদ্ধের ব্যাপারে সম্প্রতি সত্যিই আমার কৌতূহল খুব বেড়েছে।

এখন সবচেয়ে অস্বস্তিকর হল এখানকার আবহাওয়া। অত্যন্ত গরম পড়েছে, এবং বাইরের প্রকৃতি মনে হয় যেন দমবন্ধ করে আছে, একটুও হাওয়া নেই কোথাও। কতরকমের পোকা-মাকড় যে সব সময় ঝঙ্কার করছে তার ঠিক নেই। সবচেয়ে অসহ্য হল এখানকার ছারপোকা ও মাছি। ছারপোকার দুর্গন্ধে ঘর যেন ভরে থাকে সব সময়। আমাদের দেশে ইংলণ্ডেও ছারপোকা আছে, কিন্তু এরকম বিকট দুর্গন্ধ তাদের নেই। মধ্যে মধ্যে বাতাসে কীটপতঙ্গ উড়িয়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু বর্ষা না কাটা পর্যন্ত এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। অর্থাৎ আগামী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদের উপদ্রব সহ্য করতে হবে।

কালিকাটে একজন ক্যাপ্টেন আমাদের দেখাশুনা করতেন। কয়েকমাস আগে তিনি পালিয়ে এসে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এখন এদিকে তিনি একটা চাকরির খোঁজ করছেন। মিস্টার ফে তাঁকে একতলায় একটি ঘর দিয়েছিলেন থাকার জন্য,

কয়েক সপ্তাহ তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর নাম ওয়েস্ট। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের সমস্ত খবর আমরা পেয়েছিলাম। ওয়েস্ট বেশ হৃষ্টপুষ্ট লোক, খুব পরিশ্রমী। এখানকার আবহাওয়া তিনি বেশ ধাতস্থ করে নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পাটনায় গেছেন কয়েকটি বোটের দায়িত্ব নিয়ে এবং সেখানে কিছুদিন থাকবেন মনস্থ করেছেন। শোনা যায় মিস্টার আয়ার্স তাঁর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁকে নাকি গোপনে হত্যা করারও চক্রান্ত হয়েছিল। তার কারণ হল, জন ছয়-আট বদমায়েস সেপাই নিয়ে আয়ার্স স্থানীয় ধনী গৃহস্থদের ধনসম্পত্তি লুট করতে চেয়েছিলেন, এমন কি প্রয়োজন হলে তাদের খুন করারও তিনি মতলব করেছিলেন। স্বভাবতঃই মিস্টার ওয়েস্ট এই বীভৎস চক্রান্তে কোন সহযোগিতা করতে চাননি, এবং তার জন্য আয়ার্সের দল তাঁর উপর খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পাছে ওয়েস্ট তাঁদের এই হীন চক্রান্ত বাইরে ফাঁস করে দেন সেইজন্য তাঁকেই হত্যা করার ভয় দেখিয়েছিলেন আয়ার্স। অবশেষে ওয়েস্ট রাতারাতি একটা ক্যানোতে (canoe) করে কোচিনে পালিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে সুবিধামতো সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। আমি ভাবছি, কি সাংঘাতিক লোক এই আয়ার্স! ধরা পড়লে ইংরেজরা নিশ্চয় তাঁকে পলাতক বলে গুলি করে মারবে।

৩ নবেম্বর ১৭৮০

ইংলণ্ড থেকে এর মধ্যে আবার কিছু চিঠিপত্র পেয়েছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ জেনে খুশি হয়েছি। গত কয়েক মাস অত্যন্ত বোকার মতন দিনগুলো কাটিয়েছি, কিন্তু এখন শহরে বেশ লোকজনের সমাগম হতে আরম্ভ হয়েছে। শুনেছি এই সময় শীতকালে কলকাতা শহরে লোকজনের বেশ ভিড় হয়।

মিস্টার ফে'র ওকালতি ব্যবসাও বেশ ভাল চলছে। কয়েকদিন হল লেডী ও স্যার রবার্ট চেম্বার্স ভ্রমণ সেরে শহরে ফিরে এসেছেন এবং ৬০০ পাউণ্ড দিয়ে কলকাতায় চমৎকার একটি বড় বাড়ি কিনেছেন। শ্রীমতী এখন নতুন বাড়ি আসবাবপত্তর দিয়ে সাজাতে খুব ব্যস্ত। সেইজন্য তাঁর সঙ্গে আজকাল খুব কম দেখাসাক্ষাৎ হয়। অবশ্য আজকাল দেখা হলে উনি আমাদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেন।

১৯ ডিসেম্বর ১৭৮০

মিস্টার ফে'র সঙ্গে সম্প্রতি এখানে ডঃ জ্যাক্‌সন নামে এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছে। ইনি আয়ারল্যাণ্ডের লোক এবং অনেক খ্যাতনামা লোকের সঙ্গে পরিচিত। পরিচয় হবার পর দু'জনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও হয়েছে। ডঃ জে হলেন কোম্পানির চিকিৎসক, তাঁর নিজের প্রাইভেট প্র্যাকটিসও বেশ ভাল। মোটা টাকা তিনি রোজগার করেন। সপরিবারে ওঁরা একদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। বড় ছেলেটি বেশ সুশ্রী ও সুপুরুষ দেখতে, সেনাবাহিনীর লেফটন্যাণ্ট। কিছুদিন হল তার বিবাহ হয়েছে। জাহাজে আসার সময় একটি মেয়ে তারই মায়ের সঙ্গে আসছিল, নাম মিস্ চ্যান্ট্রি। তার সঙ্গে পরিচয় হবার পর দু'জনের বিবাহ হয়। এখন তারা মা-বাবার সঙ্গেই এক পরিবারে আছে। খুব বেশিদিন তারা এদেশে আসেনি। ডাক্তারের স্ত্রী হলেন জামাইকার মেয়ে এবং তা বলে দিতে হয় না, কারণ জায়গার গুণ তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত। সূর্যালোকে উজ্জ্বল যেমন তাঁর দেশ, তেমনি উদার ও উন্মুক্ত তাঁর মন ও স্বভাবচরিত্র। তাঁর আতিথেয়তা সত্যিই দুর্লভ। পার্টি দিতে তিনি খুব ভালবাসেন, কিন্তু একটু সেকেলে ধরনের পার্টি,—রাত্রে খাবার পর একটু গানবাজনা আমোদ-আহ্লাদ না হলে তাঁর ভাল লাগে না। ডিনার পার্টি এঁরা সাধারণত

দেন না, তবে শীতকাল আরম্ভ হবার পর ডিনারের নিমন্ত্রণ অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি। এখানে ডিনারের সময় হল বেলা ছুটো, এবং অনেকক্ষণ সময় ডিনার-টেবিলে বসে থাকতে হয়, বিশেষ করে শীতকালে। কারণ এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা দেখেছি গ্রিল, স্টু ইত্যাদি খাদ্য খুব ভালবাসেন এবং খুব গরম গরম টেবিলে না দিলে খান না। 'বর্ধমান স্টু' (Burdwan Stew) নামে একরকমের স্টু আছে যা মাছ, মাটন ও মুর্গী একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয়, কতকটা স্পানিশ 'ওল্লা পোত্রিদার' মতন। অনেকে মনে করেন যে সিলভার সসপ্যানে রান্না না করলে এই বস্তুটি নাকি সুস্বাদু হয় না। হতে পারে হয়ত, কিন্তু তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, কারণ সাদাসিদে খাবার খেতেই আমি ভালবাসি, বড়লোকি ভোজ্য আমার সহ্য হয় না। তাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন মতামত দেবার আমার অধিকার নেই।

ডিনার খাবার সময় পর্যাপ্ত সুরাপানও করা হয়, কিন্তু কাপড় সরিয়ে নিয়ে যাবার পর পান করার রীতি নেই। কেবল অবিবাহিতদের পার্টিতে এই রীতি মানা হয় না শুনেছি। ডিনার খাবার পর এখানে বিশ্রামের নামে নিদ্রার অভ্যাসটাও এত প্রবল যে তার হাত থেকে কেউ মুক্ত নন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এই দিবানিদ্রার অভ্যাসের জন্য বিকেলে কলকাতার রাস্তাঘাটে ইয়োরোপীয়দের একেবারেই দর্শন পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন মাঝরাতের মতন সব নিস্তব্ধ ও ফাঁকা। সন্ধ্যার পর সাহেবরা রাস্তায় একে-একে বেরুতে থাকেন, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে সান্ধ্যভ্রমণে যান। রাস্তা-ঘাট ধুলোয় ভরে থাকে, দম ফেলতেও কষ্ট হয়। ভ্রমণান্তে বাড়ি ফিরে সকলে নিয়মিত চা-পান করেন। চা-পানে এখানে সকলেই অভ্যস্ত, শীত গ্রীষ্ম কোন সময়েই তা বাদ দেওয়া হয় না। চা-পান শেষ হলে রাত দশটা পর্যন্ত তাস-

খেলা বা গানবাজনা চলতে থাকে, তারপর 'সাপার' খাবার সময় হয়। পাঁচতাসের 'লু' (Five Card Loo) খেলাই বেশি চলে এবং একটাকা থেকে দশটাকা পর্যন্ত বেটিং চলে। তোমাদের হয়ত মনে হবে যে বেটিং-এর মাত্রা খুব বেশি, কিন্তু এখানকার প্রথানুযায়ী কিছুই নয়। ট্রিডিল ও হুইস্ট খেলারও চলন আছে, কিন্তু শেষোক্ত খেলায় মহিলারা সাধারণত যোগদান করেন না। খেলার ঝক্কি কম হলেও ভদ্রলোকেরা এত বেশি বেটিং করেন যে প্রত্যেকের ভয় হয় হারজিতের কথা ভেবে।

বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার সময় হল সন্ধ্যাবেলা। অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচয় করতে হলেও এই সময় সাক্ষাৎ করার রীতি। অর্থাৎ সামাজিক পরিচয়াদির ব্যাপারটা সন্ধ্যার পরেই শুরু হয়। খুব বেশি সময় কেউ একজনের বাড়িতে এসে থাকেন না, কারণ একদিনে তাঁকে একাধিক বাড়িতে যেতে হয়, আবার নিজের বাড়িতেও অতিথি আসার সম্ভাবনা থাকে। এই সামাজিকতা রক্ষার ব্যাপারটা প্রধানত মহিলাদের। ভদ্রলোকেরাও এইসময় আলাপ-পরিচয় করতে আসেন, এবং তখন তাদের যদি টুপি নামিয়ে রাখতে বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেদিনের 'সাপারে' তিনি নিমন্ত্রিত হলেন। তাই অনেক ভদ্রলোককে দেখা যায়, সন্ধ্যার পর আলাপ করতে এসে টুপিটা হাতে নিয়ে গৃহকর্ত্রীকে দেখিয়ে দেখিয়ে নাচাতে থাকেন। ইচ্ছা যাতে টুপিটা তাঁকে রাখতে বলা হয় কারণ তাহলে তিনি রাতের সাপার খেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সহজে গৃহকর্ত্রীরা তা বলেন না, এবং তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে টুপি নাচাবার পর বিমর্ষচিত্তে বিদায় নেন।

সামনে ক্রীসমাস ও নববর্ষের উৎসব আসছে, ঘরে ঘরে তার তোড়জোড় চলছে। নববর্ষের পাব্লিক বলনাচ একটা বড় ঘটনা। এ সম্বন্ধে এখন কিছু তোমাদের লিখব না, উৎসব শেষ হয়ে গেলে

জানার। সম্প্রতি আমার মেজাজটাও খুব ভাল নয়, কারণ কয়েকটা ব্যাপারে মিস্টার ফে'র আচরণে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। অদ্ভুত চরিত্রের লোক আমার স্বামী মিস্টার ফে। শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজনের সঙ্গে, অথবা যাঁরা তাঁর ওকালতির কাজকর্মে বিশেষ সাহায্য করতে পারেন এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তিনি একটুও উদ্‌গ্রীব বলে মনে হয় না। আজ পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গে করে আমি ডঃ জ্যাক্‌সনের বাড়ি যেতে পারিনি, অথচ শহরে কোন নতুন ভদ্রলোক এলে আগে তাঁর সঙ্গেই পরিচিত হবার চেষ্টা করেন। এ বিষয় কিছু বললে তিনি পরিষ্কার জবাব দেন যে এতবেশি সামাজিকতা তাঁর ধাতে সয় না। দু'একবার তিনি স্যার রবার্ট চেম্বার্সের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বটে, কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য জজদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয় করেননি, আদালতে তাঁদের চেহারা দেখেছেন মাত্র। কিছুদিন আগে স্যার এলিজা ইম্পে তাঁর সঙ্গে জাস্টিস হাইডের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এবং চীফ জাস্টিস নিজে যখন সেজন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিলেন তখন মিস্টার ফে এমনই মুখচোরা যে তিনি ভয়ে বলে ফেললেন, হাইডের সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় হয়েছে। এই কথা শুনে চীফ জাস্টিস সেই যে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন, আর তাঁর দিকে ফিরে চাননি। ঘটনাটি ঘটেছিল যেদিন মিস্টার ফে আদালতের অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হন। এখানকার রীতি হল, আদালতের নতুন সেসন আরম্ভ হবার প্রথমদিনে জাস্টিস হাইডের বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সভায় ব্যবহারজীবীরা সকলে মিলিত হন এবং সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে কোর্ট হাউসে যান।

আজকের মতন চিঠি এইখানেই শেষ করছি। পরের চিঠিতে, আশা করি, আরও অনেক নতুন খবর দিতে পারব।

তোমাদের স্নেহার্থিনী ই. এফ.

৪

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ১৭৮১

প্রিয় বোন,

গত চিঠি লেখার পর থেকে আমরা এখানে ক্রীসমাসের ফুর্তিতে মশগুল হয়ে আছি। ইংলণ্ডে বোধ হয় ক্রীসমাসের এত সমারোহ হয় না, কিন্তু এখানে প্রাচীনকালের উৎসবের মতন বেশ ধুমধাম করে ক্রীসমাস-পর্ব পালন করা হয়। ক্রীসমাসের দিন শহরের ইংরেজ ভদ্রলোকরা তাঁদের বাড়িঘর সুন্দর করে সাজান, বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার লাগে। বড় বড় কলাগাছ ফটকের দু'পাশে বসানো হয়, এবং বাড়ির থাম, দরজা ইত্যাদি ফুলের মালা জড়িয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কর্মচারীরা সকলে মাছ, ফলফুল ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস সাহেবকে ঐদিন ভেট বা উপহার পাঠায়, বেনিয়ান থেকে আরম্ভ করে খানসামা-চাপরাসি পর্যন্ত কেউ বাদ দেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপহারের বদলে আমাদেরও বকশিস ও উপহার দিতে হয়, কিন্তু তাহলেও বড়দিনের এই উপহার আমাদের কাছে সত্যিই খুব লোভনীয়।

প্রেসিডেন্সির সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের ঐদিন বিরাট একটি ডিনার দেওয়া হয় গর্বনমেণ্ট হাউসে, এবং সন্ধ্যায় মহিলাদের আপ্যায়ন করা হয় জমকাল বলনাচে ও সাপারে। এই ভোজ ও বলনাচের পুনরাবৃত্তি হয় নববর্ষে ও রাজার জন্মদিনে। 'হয়' না বলে 'হয়েছে'

বলা উচিত ছিল, কারণ শেষের উৎসবের তারিখটি গ্রীষ্মকালে পড়াতে খুবই অসুবিধা হতে থাকে। একে দারুণ গরম, তার উপর সকলকে পুরো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ফিটফাট হয়ে যেতে হয়, ভিড়ও হয় খুব। গরমে এমন অবস্থা হয় যে অনেকে সভাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারিখটা তাই বদলে ৮ ডিসেম্বর করা হয়েছে এবং তাতে সকলেই খুব খুশি হয়েছে মনে হয়। উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সাধ্য নেই আমার, ইচ্ছাও নেই। এককথায় বলা যেতে পারে যে চরম আড়ম্বরবহুল উৎসব বলতে যা বোঝায়, এগুলি সেই ধরনের উৎসব। একটির সঙ্গে অন্যটির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, এবং বিবরণ দিলে তা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হবে বলে আপাতত দিলাম না।

কিছুদিন আগে মিসেস জ্যাকসন আমার জন্য হারমনিক ট্যাভার্নের একখানি টিকিট সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। শহরের বাছা-বাছা ভদ্রলোকেরা হারমনিকের পৃষ্ঠপোষক, শীতকালে তাঁরা বর্ণানুক্রমে কনসার্ট, বলনাচ ও নৈশভোজ দিয়ে থাকেন। পালাক্রমে প্রায় একপক্ষ অন্তর হারমনিকে এই পার্টি দেওয়া হয়। মিস্টার টেলার নামে এক ভদ্রলোকের পার্টিতে আমি গিয়েছিলাম। তারপরই আমার চাঁদা শেষ হয়ে গেল। দুঃখের কথা, কারণ শহরে এরকম সুরুচিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা আর কোথাও নেই। যে-কেউ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলে আফশোস করবেন। বিচিত্র সব সঙ্গীতের আসর আমরা উপভোগ করেছি। লেডি চেম্বার্স খুব চমৎকার বীণ বাজাতে পারেন, এবং একদিন নিকোলায়ের সোনাটা বাজিয়ে সকলকে মোহিত করে দিলেন। এক ভদ্রলোক এই বাজনা শুনে পরদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত সুন্দর সঙ্গীত জীবনে আর কোনদিন আমি শুনেছি কি না।

এই সুরসভায় মিসেস হেস্টিংসও উপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি অনেক দেরী করে এসেছিলেন, এবং এসে হলের উল্টোদিকে এত দূরে বসেছিলেন যে তাঁকে দেখা যায় না বা কথাবার্তা বললেও শোনা যায় না। আমি তাঁকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতেই পাইনি। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর মিসেস জ্যাকসন আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন সন্ধান করছি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, গবর্নর-পত্নীকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছি কি না? আমি বললাম, "না, জানাইনি; কারণ জানাবার সুযোগ পাইনি। যতবার তাঁর দিকে চেয়ে চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করেছি, ততবার তিনি অন্যদিকে চেয়ে থেকেছেন।"

"ও, তাই না কি?" মিসেস জ্যাকসন বললেন, "তা হলে তো হবে না! আপনাকে চোখ না ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ না তিনি দেখতে পান। মিস চ্যান্ট্রি তাই করেছেন, আমি তাই করেছি, আপনাকেও তাই করতে হবে। তা না করলে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন।"

আমি তাঁর উপদেশ অনুসারে তাই করলাম, পলক না ফেলে চেয়ে রইলাম মিসেস হেস্টিংসের দিকে। দেখলাম তাতে কাজ হল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে ঈষৎ গ্রীবা বেঁকিয়ে মুচ্‌কি হাসলেন, আমিও ঘাড় নামিয়ে বিনত অভিনন্দন জানালাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠে এসে আমাদের কাছে বসলেন এবং আমার সঙ্গে বেশ মিষ্টি করে কথা বলতে লাগলেন।

লেডি কূট (Lady Coote) ও মিস মলি ব্যাজেটের সঙ্গে গবর্নর-গিন্নী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মলি ও লেডি কূটের গভীর বন্ধুত্ব বাল্যকাল থেকে। বালিকা বয়সে দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বিবাহ যাঁর আগে হবে তাঁর সঙ্গে অন্য

বন্ধুকে থাকতে হবে। লেডি কূটের বাবা ছিলেন সেণ্ট হেলেনার গবর্নর। স্যার আয়ারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবার পর সেণ্ট হেলেনা থেকে যখন তিনি চলে আসেন, তখন মলি, হেলেনার মেয়ে হয়েও, তাঁর সঙ্গী হয়ে ইংলণ্ডে যান এবং সেখান থেকে ভারতবর্ষে আসেন। তারপর থেকে তাঁরা দু'জন একসঙ্গে আছেন। পরস্পরের প্রতি এরকম গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সচরাচর দেখা যায় না।

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৮১

গতকাল আমরা আমাদের বন্দীজীবনের মুক্তির দিনের বাৎসরিক উৎসব পালন করেছি। ডঃ জ্যাকসনকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মিস্টার ও'ডনেল ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এই দিনটাকে আমি আমার জীবনের 'জুবিলি ডে' বলি। আশা করি তোমরা ইংলণ্ডে থেকেও আমার এই দিনের স্মৃতিটুকু বিস্মৃত হওনি।

একটা কথা মনে থাকতে বলি—সদর খাঁ ও আয়ার্স আমাদের দু'জন বড় শত্রু, কিছুদিন হল তাঁদের বদমায়েসি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথম ব্যক্তি তেলিচেরিতে আহত হয়ে মারা গেছেন ; দ্বিতীয়জন, মনে হয় মদ্যপান করে অসভ্যের মতন গালাগাল করতে করতে মিলিটারি অফিসারদের সামনে উদ্ধত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ভঙ্গিটা এই যে গুলি করে করুক, পরোয়া করি না। অফিসাররা অবশ্য তাই করেছিলেন, গুলি করেই তাঁকে মারা হয়েছিল। আয়ার্সের মতন অদ্বিতীয় দুশমনের এইভাবে মৃত্যু হওয়াটাও যথেষ্ট সম্মানের মনে হয়। আমি ভেবেছিলাম, তাঁকে গ্রেফ্তার করে বন্দী করা হবে এবং পরে সামরিক বিচারে পলাতক বলে গুলি করা হবে।

হতভাগ্য ওয়েস্টও মারা গেছেন। বেচারা যে বোট নিয়ে পাটনা যাত্রা করেছিলেন, নদীর চড়ায় আটকে তা ডুবে যায় এবং তিনিও মারা যান।

কলকাতা, ২৬ মার্চ ১৭৮১

গবর্নমেণ্টের চিঠিপত্তর নিয়ে শীঘ্রই একটা জাহাজ ইয়োরোপ যাবে। চিঠি পাঠাবার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বলে আমাদের এখানকার থিয়েটার সম্বন্ধে সামান্য ছ'চার কথা বলে চিঠি শেষ করছি।

থিয়েটার-গৃহ চাঁদা তুলে তৈরি করা হয়েছে এবং দৃশ্যপট ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। নাটক অভিনয়ে সাধারণত অ্যামেচাররাই অংশ গ্রহণ করেন। পেশাদার অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তা হলেও এই অ্যামেচার থিয়েটারে যে-সব অভিনয় আমি দেখেছি যে-কোন ইয়োরোপীয় স্টেজের অভিনয়ের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। কিছুদিন আগে Venice Preserved নামে একটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন কল (সেনাবিভাগের), মিস্টার ড্রোজ (বোর্ড অফ ট্রেড-এর), ও লেফটন্যাণ্ট নর্ফার যে তিনটি চরিত্র অভিনয় করেছিলেন তা সত্যি খুব উচ্চাঙ্গের। নর্ফারকে স্টেজের বাইরে দেখলে কিরকম মেয়েমুখো মনে হয়, কিন্তু শুনেছি সামরিক অফিসার হিসেবে তিনি নাকি খুব সাহসী। বাইরে এমনভাবে সাজগোজ করে থাকেন তিনি যে দেখলে মনে হয় যেন বলনাচ নাচতে যাচ্ছেন। অথচ হঠাৎ কাজকর্মের তলব পড়লে তিনি আদৌ ক্যাবলামি করেন না। জানি না, কি করে ভদ্রলোক এমন পরিপাটি করে সেজে থাকেন। কেশের বাহার দেখে মনে হয় তারই পরিচর্যা করতে বেশ সময় লাগে।

এই ধরনের অ্যামেচার থিয়েটারের একটা বড় অসুবিধে হল যে কেউ কোন পরিচালকের তাঁবে কাজ করতে চান না। সকলেই স্বাধীন, এবং যাঁর যা ইচ্ছা সেই ভূমিকায় অভিনয় করতে চান। তার ফলে যাঁকে যা মানায় না এরকম বেমানান অভিনয় অনেককেই করতে হয়। একটা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় অভিনয়ের সময়। তার জন্য ট্র্যাজেডি দেখতে গিয়ে প্রায়ই কমেডির মতন হাসতে হয়। থিয়েটারের মতন একটা শিশু-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তবু বলব, সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে যাওয়ার চেয়ে ভাল সময় কাটানোর আর কিছু নেই। টাকাপয়সার অভাব না থাকলে আমি কিন্তু একটা অভিনয় দেখাও বাদ দিতাম না। তবে একটি করে স্বর্ণমোহর প্রবেশ-দক্ষিণা দিতে হয়। কয়েক ঘণ্টার আমোদের জন্য এতটা মূল্য দেওয়া অসম্ভব।

আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, পরে আবার লিখব।

তোমাদের স্নেহপ্রার্থিনী

ই. এফ.

৫

কলকাতা, ২৬ মে ১৭৮১

প্রিয় বোন,

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, গত কয়েকমাস ধরে আমার চিঠির সুর অনেক বদলে গেছে, আগেকার উচ্ছ্বাস আর বিশেষ নেই। ব্যক্তিগত জীবনের সব ঘটনা তোমাকে জানাইনি, কারণ তুমি তা শুনলে দুঃখ পাবে। মিস্টার ফে'র অবিবেচনা ও অসংযত আচরণ ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছে। সে-সব কথা তোমাকে জানাইনি, এবং তাই চিঠি ভর্তি করার জন্য অনেক আজেবাজে কথা লিখতে হয়েছে। তা হলেও বাজে কথার ফাঁকে ফাঁকে হয়ত তুমি তার খানিকটা আভাস পেয়েছ এবং ভেবেছ যে জীবনটা আমার ঠিক স্বাভাবিক-ভাবে চলছে না, কোথায় একটা কিছু বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে। আমার মনে হয় না মিস্টার ফে আর বেশিদিন কলকাতা শহরে ওকালতি-ব্যবসা করতে পারবেন।

এখানে আসার পর থেকে ভদ্রলোক তাঁর নিজের খেয়ালখুশি মতন চলছেন, কোন বিষয়ে আমার মতামত বা পরামর্শ নেওয়ার দরকার বোধ করেন না। মুষ্টিমেয় একদল লোক, যাঁদের একমাত্র কাজ হল গবর্নমেন্টের বিরোধিতা করা এবং পদে পদে তাঁর কাজকর্মে বাধা দেওয়া, তাঁদের সঙ্গে মিস্টার ফে'র খুব বন্ধুত্ব। তার ফলে সরকারী মহলে তিনি রীতিমত অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন আগে কলকাতা শহরের ঘরবাড়ির উপর যখন ট্যাক্স ধার্য করা সাব্যস্ত

হয় তখন আমাদের বাড়িতে মিস্টার ফে'র বন্ধুবান্ধবদের ঘনঘন বৈঠক বসতে থাকে, এবং এই ট্যাক্স যে বেআইনী সে সম্বন্ধে তিনি তাঁদের আন্দোলন করার জন্য উস্কানি দিতে থাকেন। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি প্রতিবাদ করি এবং তাঁকে এই সর্বনাশের পথ অবিলম্বে ছাড়তে অনুরোধ করি। আমাদের গবর্নরের চরিত্র কার না জানা আছে? তিনি যেমন তাঁর বন্ধুদের কখনও ভোলেন না, তেমনি শত্রুদেরও ভুলেও ক্ষমা করেন না। অতএব মিস্টার ফে যদি ভেবে থাকেন যে মিস্টার হেস্টিংসের শত্রুতা করে তিনি গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবেন, তা হলে তিনি মূর্খের স্বর্গলোকে বাস করছেন বলতে হবে। কিন্তু আমার সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হয়, কারণ আমার কোন পরামর্শই তিনি গ্রাহ্য করেন না, তাচ্ছিল্য করে উপেক্ষা করেন। তাঁর পন্থা তিনি এখনও পূর্ণোদ্যমে অনুসরণ করে চলেছেন, এবং যত অবাঞ্ছিত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো যেন তাঁর অন্যতম কর্তব্য হয়ে উঠেছে। তার জন্য নিজের ওকালতি-ব্যবসায়ে তিনি আর মন দিতে পারেন না।

যখনই কোন পার্টিতে নিমন্ত্রণ হয় তখনই মিস্টার ফে যে-কোন অজুহাতে তা এড়িয়ে যেতে চান, এবং আমাকে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ বুঝিয়ে বলতে হয়। লেডি চেম্বার্স, জ্যাকসনরা এবং আর দু'একজন এখনও তাঁর প্রতি খানিকটা আগ্রহ দেখান বটে, কিন্তু আর কতদিন যে তা দেখানো সম্ভব হবে জানি না। কিছুদিন হল চেম্বার্সদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। আমি তখন তাঁদের কাছেই ছিলাম। শিশুটির সঙ্গে আমারও একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তার নামকরণ উৎসব হবে। স্যার এলিজা ও লেডি ইম্পে নবজাত শিশুর আনুষ্ঠানিক অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন। লেডি চেম্বার্সের ইচ্ছা অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত থাকি, কিন্তু স্যার রবার্ট কিছুতেই মিস্টার ফে'কে অনুষ্ঠানে

ডাকতে রাজি নন। সুতরাং মুশকিল হয়েছে, যদি মিস্টার ফে'কে ব্যাপারটা বোঝাতে পারি তবেই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব।

কলকাতা, ৩ জুন ১৭৮১

অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হয়ে গেছে। মিস্টার ফে'কে নিয়ে আমার কোন হাঙ্গামা হয়নি। কারণ নিমন্ত্রণের কথা বলা মাত্রই তিনি বললেন যে সেদিন তাঁর অন্য একটা নিমন্ত্রণ আছে, তাই তিনি যেতে পারবেন না। অনুরোধ করলেন যেন চেম্বার্সদের তাঁর অনুপস্থিতির কারণটা বুঝিয়ে বলি। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে রেহাই পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ তা তো নিশ্চয়ই বলব। আমার খুব ভাল লাগেনি ব্যাপারটা। বুঝতেই পারছ, না লাগাই স্বাভাবিক। অনুষ্ঠানে মনপ্রাণ দিয়ে যোগ দিতে পারিনি, যদিও স্যার এলিজা ও তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হবে? এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে আমার স্বামীর উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়, তা সে যে কারণেই হোক না কেন, আমার কখনও ভাল লাগতে পারে না। তাই প্রসন্নমুখে আমার পক্ষে ঘুরে বেড়ানোও সম্ভব হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে হয়েছিল নিজেরই স্বার্থে, কারণ সমাজের সেরা মানুষদের সঙ্গে সাহচর্যের ও পরিচয়ের সুযোগ ছিল বলে। এ সুযোগ ছাড়ব কি করে? বিপদে-আপদে তো এঁদেরই শরণাপন্ন হতে হবে? আর বিপদ তো আমার যে-কোন সময়ই হতে পারে?

কলকাতা, ২৪ জুন ১৭৮১

কোর্ট যদিও অনেকদিন ধরে খুলে গেছে, মিস্টার ফে প্রায় খালি হাতেই বসে আছেন, কোন মামলা-মোকদ্দমা নেই। অ্যাটর্নিরা তাঁকে মামলা দিতে ভয় পান। একদিকে দু'জন অ্যাডভোকেট

মামলায় নিয়োগ করা হয় এবং অন্যদিকে একজন, তবু তাঁকে মামলা চালাতে দেওয়া হয় না। এটা যে কতখানি দুঃখের ব্যাপার তা তুমি বুঝতে পারবে না। অর্থ রোজগারের এতবড় সুযোগ মিস্টার ফে স্বভাবের দোষে হারিয়েছেন। এসব সহ্য করা আমার পক্ষে যে কত কঠিন তা আমিই জানি। ভগবান আমাকে অসাধারণ সহ্যগুণ দিয়েছেন। আমার শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে তাঁকে আজকের এই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

গতকাল লেডি চেম্বার্সের কাছে আমার অবস্থার কথা সমস্ত খুলে বলেছি। একথাও বলেছি যে মিস্টার ফে অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। সব শুনে খুবই বিচলিত হয়ে তিনি বললেন, 'আপনি মোটেই চিন্তিত হবেন না। মিঃ ফে যদি চলেই যান তা হলে সোজা আপনি আমার বাড়িতে এসে উঠবেন এবং নিজের বাড়ির মতন থাকবেন।' স্যার রবার্টও তাঁর স্ত্রীর এই সহৃদয় আমন্ত্রণ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এরকম একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে স্বস্তি পেলাম। যতদিন না ইয়োরোপ ফিরে যেতে পারি ততদিন অন্তত নির্ভাবনায় থাকতে পারব।

কলকাতা, ১৭ জুলাই ১৭৮১

এমাসের শেষ তারিখে আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। ভবিষ্যতে কবে আবার আমি ও আমার স্বামী একবাড়িতে বাস করার সুযোগ পাব, তা ঈশ্বর জানেন। আমাদের মনোমালিন্যের ব্যাপারটা মিস্টার ফে যে কিরকম উদাসীনভাবে গ্রহণ করেছেন তা চোখে না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না। যেন কিছুই ঘটেনি, অথবা ঘটলেও কিছু আসে যায় না, এরকম একটা ভাব নিয়ে

থাকেন তিনি সবসময়। সম্প্রতি তাঁর একজন খুব বড় পেট্রন জুটেছেন, কর্নেল ওয়াটসন। সকলেই জানেন, ওয়াটসন কৃতী ও সংগতিপন্ন পুরুষ, গবর্নমেণ্টের বিরোধী পক্ষের একজন জাঁদরেল লোক, স্যার এলিজা ইম্পেরও ঘোর শত্রু। স্যার এলিজার বিরুদ্ধে ওয়াটসন অভিযোগ করে বিচার দাবি করেছেন। তার জন্য তাঁর একজন বিশ্বস্ত এজেণ্ট চাই, যিনি গোপন নথিপত্র নিয়ে ইংলণ্ডে যাবেন। মিস্টার ফে এই এজেণ্টের কাজটি যোগাড় করার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। তার জন্য কয়েকটি দলিলপত্র ও লেখা বাঙালী কেরানীদের দিয়ে তিনি কপি করাতে আরম্ভ করেছেন। বাঙালীদের দিয়ে কপি করানোর কারণ হল, ইংরেজী তাঁরা বিশেষ জানেন না এবং যেটুকু জানেন তাতে ইংরেজী লেখার অর্থ বুঝতে পারেন না। সুতরাং গোপন বিষয় তাঁদের ইংরেজীতে লিখতে দিলে তা বাইরে প্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কর্নেল ওয়াটসনকে আমাদের বাড়িতে কোনদিন আসতে দেখিনি। সমস্ত কাজকর্ম তাঁরা এমনভাবে করছেন যে মনে হয় যেন ভয়ানক রহস্যময় একটা ব্যাপার। আমি নিজে ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করি না, কারণ এসব করে শেষ পর্যন্ত মানুষের যে কোন উপকার হতে পারে তা মনে হয় না। তাই আমি আভাস-ইঙ্গিতেও জানাইনি যে বিষয়টা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি। তবু এখনও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কিছুতেই ভুলতে পারি না, তাই দূর থেকে অসহায়ের মতন ব্যাপারটা দেখে যাই, হাত-পা বাঁধা, কিছু করতে পারি না। আমাদের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই ঘটনার সঙ্গে জটিলভাবে জড়িয়ে পড়বেন। তুমি বুঝতেই পারছ কার কথা আমি ইঙ্গিত করছি। আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি, পরে বাড়ি বদল করে আবার তোমায় চিঠি লিখব।

তোমার স্নেহের বোন ই. এফ.

৬

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ১৭৮১

প্রিয় বোন,

গত চিঠি লেখার পর থেকে কয়েকটি গুরুতর কারণে আমার মনের উপর দিয়ে বেশ বড় একটা ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের ঝাপ্‌টা সহ্য করাই অসম্ভব মনে হয়েছিল। মিস্টার ফে গত ৩১ জুলাই তারিখে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। সেই দিনটা যে আমার কি ঝঞ্ঝাটে কেটেছে তা বলা যায় না। বাড়ির যে-সব আসবাবপত্তরের দাম শোধ করা হয়নি সেগুলি দোকানদারদের ফেরত পাঠাতে হয়েছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ধার করে যা আনা হয়েছিল তাও তাদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সব দিয়েথুয়ে বাকি যা ছিল শেষকালে একজন পাওনাদার এসে সব ঝেড়েমুছে নিয়ে চলে গেছেন। আমার স্বামীটি তাঁর বেহিসেবী খরচের দায় সামলাবার জন্য এমন কঠিন শর্তে অত্যধিক সুদে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন যার খেসারত শেষ পর্যন্ত এইভাবে দিতে হল। এখন আমাকে কপর্দকহীন, সহায়সম্বলহীন একজন রিক্ত মহিলা বলতে পার। সম্বল বলতে শুধু নিজের কয়েকখানা কাপড়জামা আছে। তাই দিয়েই স্বামীর অবিমৃষ্যকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে, এবং তার যা কিছু কুফল তাও আমাকে একাই ভোগ করতে হবে। জানি না তা করা সম্ভব হবে কিনা, কারণ এই ভ্রমণের সময় দীর্ঘ

পথ চলাফেরা করার ফলে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তার উপর কালিকাটের বন্দীজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা মনে হলে রীতিমত ভয় হয়, দেহে আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

লেডি চেম্বার্স এই দুঃসময়ে আমাকে তাঁর সহোদর বোনের মতন কাছে টেনে নিয়েছেন, এবং যখন যেখানে যান সর্বদাই আমাকে সঙ্গে যেতে বলেন। কিন্তু বাইরের সমাজে স্বাভাবিক-ভাবে চলাফেরা করা আমার পক্ষে সহজে সম্ভব হবে না, অন্তত কিছুদিন সময় লাগবে। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেইদিন থেকে একটি বিশেষ ঘটনার কথা জানতে পেরে আমি স্থির করে ফেলেছি যে মিস্টার ফে'র মতন মানুষের সঙ্গে কোনমতেই আর আমার অদৃষ্টকে জড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মানবিক ও আধ্যাত্মিক কোন সম্পর্ককেই শ্রদ্ধা করতে শেখেননি তাঁর সঙ্গে জীবন কাটানো অসম্ভব। উকিল বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাই আমি তাঁর কাছ থেকে বিধিমতে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবি করেছি। আমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় মিস্টার এস. একটি দলিল-পত্র মুসাবিদা করেন স্যার রবার্ট চেম্বার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে। এবার থেকে আমি যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারি, মিস্টার ফে'র কোন অধিকার আমার উপর যাতে না থাকে, এমনকি আমার টাকাকড়ি সম্পত্তি পর্যন্ত যাতে আমি যাকে খুশি উইল করে দিতে পারি, এসব ব্যবস্থা দলিলপত্রে করা হয়েছে। সলিসিটর মিস্টার জোন্স ও মিস্টার ম্যাকভীগ, এই দু'জনকে আমার ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছি। এঁদের চেয়ে ভাল বা নির্ভরযোগ্য লোক আর কেউ আমার জানা নেই। তোমার কাছে আর কিছু আমার জানাবার নেই। আর কেউ না জানুক, তুমি তো অন্তত জান, কী না করেছি আমি এই অকৃতজ্ঞ ভদ্রলোকের জন্য। শেষে আমার মতন মেয়ের ধৈর্যও তাঁকে সুপথে ফেরাতে পারল না।

এবিষয় নিয়ে আর বেশি আলোচনা করতে চাই না। গত ১১ আগস্ট দলিলপত্রে সই করা হয়ে গেছে। মিস্টার ফে'র ব্যক্তিগত জীবনের অনেক গোপন ব্যাপার আমার পক্ষে জানা স্বাভাবিক বলে, অভদ্র দাম্ভিকের মতন সই করার দিন তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন যে প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি হয়ত সেগুলি প্রকাশ করে দিতে পারি। হয়ত তিনি এখনও তাই ভাবতে পারেন, কারণ আমি তাঁর ঐ উদ্ধত কথার কোন জবাব দিইনি। কেবল তাঁর মুখের দিকে সোজা স্থিরদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে ক্ষোভ ও রাগ কিছুটা নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছিল, এবং তাঁর সামনে তিনি চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা হতেই হবে, কারণ বিবেকের দংশনে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়।

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ১৭৮১

স্যার রবার্ট চেম্বার্স চুঁচূড়ার কোর্টের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে গেছেন। লেডি চেম্বার্স ও পরিবারের অন্যান্য সকলেও তাঁর সঙ্গে গেছেন। সুতরাং এখন আমি একলাই এই বিরাট বাড়ির মালিক হয়ে রয়েছি, এবং নির্জনে চলতে-ফিরতে শুতে-বসতে নিজের ভাগ্যের কথা অহরহ ভাবার সুযোগ পেয়েছি। স্যার রবার্ট অবশ্য আমাকে তাঁর বিশাল লাইব্রেরির চাবি দিয়ে গেছেন। দরকার হলে আমি তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু পড়াশুনা করতে হলে যে মানসিক প্রশান্তি দরকার তা কোথায়? যদি তা থাকত বা কখনও আসে তাহলে বইয়ের গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ও অবকাশ পাওয়া যাবে।

সম্প্রতি মিসেস হোয়েলারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এরকম পরিচয়কে জীবনের একটা সম্পদ বলা যায়। একদিন লেডি

চেম্বার্সের সঙ্গে তাঁর বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেদিন যে আদরযত্ন তিনি করেছিলেন তা কখনও ভুলব না। তিনি আমাকে সর্বদাই সাহায্য করার জন্য উন্মুখ। মিস্টার হেস্টিংস রাজনৈতিক কাজে বাইরে গেলে মিস্টার হোয়েলার এখানে তাঁর কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। এর থেকে বুঝতে পারবে এখানকার সমাজে মিসেস হোয়েলারের প্রতিপত্তি কতখানি। কিন্তু তাহলেও স্বভাব-চরিত্রে ও ব্যবহারে এত অমায়িক তিনি যে না জানলে তাঁর সামাজিক মর্যাদার কথা কিছুই বোঝা যায় না। সভা-পার্টির নিমন্ত্রণ তাঁকে এত বেশি রক্ষা করতে হয় যে অধিকাংশ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকে না। সেটাও তিনি এত ভদ্রভাবে করেন যে তাঁর অসম্মতির জন্য কারও মনে কোন ক্ষোভ থাকে না।

আমি এখনও কলকাতা শহরে আমাদের ধর্মোপাসনার ব্যবস্থার কথা তোমাকে কিছু লিখিনি। উপাসনা করার জন্য পুরনো ফোর্ট উইলিয়মে আমাদের একটি ঘর আছে, এবং সেটা যে খুব বড় ঘর তা নয়। এটা কলকাতার মতন শহরে আমাদের দিক থেকে নিশ্চয় লজ্জার কথা। একটি নতুন গির্জা তৈরি করার কথাবার্তা কিছুদিন ধরে চলছে, ভাল জায়গাও দেখা হয়েছে তার জন্য, কিন্তু ব্যাপারটা তার বেশি আর এগোয়নি।

এদেশের প্রথা, ধ্যানধারণা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা তোমাকে জানাব। স্বভাবতঃই আমার বিবরণটা সংক্ষিপ্ত ও ভাসা-ভাসা হবে, তবে তাতেও তোমার জানবার আগ্রহ বাড়বে।

প্রথমেই মৃত স্বামীর সঙ্গে বিধবা স্ত্রীর সহমরণের বীভৎস প্রথার কথা উল্লেখ করতে হয়। একে সতীদাহ-প্রথা বলে। শোনা কথা নয়, সত্য ঘটনা, তবে আমি স্বচক্ষে সতীদাহের সমস্ত

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার দেখবার সুযোগ পাইনি, বরং ইচ্ছা হয়নি বলতে পার। কোন ইয়োরোপীয়ান এ-দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখেছেন বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস হয় না যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থেকে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। প্রেম, ভালবাসা বা মায়া-মমতা, অথবা পতিকে পরম গুরু বলে ভক্তি করার প্রেরণার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তা যদি থাকত তাহলে সেই স্বামী-স্ত্রীর সন্তানেরাও একই ভালবাসার টানে পিতামাতার জ্বলন্ত চিতার দিকে এগিয়ে যেত। পরিবারের ভালবাসাটা কেবল স্ত্রীর ক্ষেত্রে সত্য হল, আর সন্তানদের ক্ষেত্রে সত্য হল না, একথা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভক্তি বা ভালবাসার সঙ্গে যদি এই কুৎসিত প্রথার কোন সুদূর সম্পর্কও থাকত তাহলে বিধবা স্ত্রী বা যিনি গর্ভ-ধারিণী মা তিনি, অনাথ ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়েও জীবিত থাকার চেষ্টা করতেন। অনুসন্ধান করে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে দাম্পত্যপ্রেমের সঙ্গে সহমরণের সম্বন্ধ নেই, কারণ উভয়ের যখন বিবাহ হয় তখন তাদের মুখ দিয়ে কথাই ফোটে না, এবং দু'জনেই হয়ত হামাগুড়ি দিতে থাকে। শৈশবেই দু'জনের পিতা-মাতা ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য বাক্‌দান করে থাকেন। সুতরাং প্রেম-ভালবাসা গোড়াতেও থাকে না, পরেও বহু পুত্রকন্যা-পরি-বেষ্টিত পরিবারের জলবায়ুতে তা লতিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। আসলে প্রথাটা হল এদেশে স্ত্রী-জাতির নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথার একটা বড় নিদর্শন। স্ত্রী হল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গহনা ও টাকা-কড়ির প্রাণহীন পোঁটলা-পুঁটলির মতন। মরার পর সম্পত্তিটি তিনি রেখে যেতে চান না, সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। তার জন্যই সহমরণের প্রয়োজন, এবং শাস্ত্রবচনের আধ্যাত্মিক আস্তরণ দিয়ে এই হীন উদ্দেশ্য চাপা দেওয়াও দরকার। এই হল পতিভক্তি-প্রণোদিত সহমরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাই এদেশের লোকেরা

যখন নারীচরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন তখন সত্যিই আমার হাসি পায়। কারণ একটা সামাজিক কু-প্রথার দাস হওয়ার মধ্যে বাহাদুরি নেই কিছু, মহত্ত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। সতীরা অবশ্য সমাজে বীরাঙ্গনা বলে কীর্তিত হন এবং পতিগত-প্রাণা বলে কিছুদিন সমাজের লোক তাঁদের স্মরণ করেন। ইংলণ্ডেও যদি বীরত্ব ও সতীত্বের এই সাময়িক গৌরবের সঙ্গেও এরকম কোন সামাজিক কুপ্রথার আচরণ জড়িত থাকত, তাহলে ইংরেজ রমণীরাও হয়ত তা পালন করতে কুণ্ঠিত হত না। যে-সব স্বামীর সঙ্গে জীবনে একদিনও হয়ত তাঁরা শান্তিতে ঘর করতে পারেননি, বীরাঙ্গনার স্তোকবাক্যের লোভে হয়ত তাঁদের সঙ্গেও তাঁরা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতেন। তাই বীরত্ব, সতীত্ব, মহত্ত্ব ইত্যাদি কথা শুনলে হাসি পায়।

তা ছাড়া সত্যিই যদি এদেশের মেয়েদের বীরত্বের কথা ওঠে তাহলে তার জন্য সহমরণের পরীক্ষা দেবার কোন দরকার নেই। এদেশের মেয়েরা সবদিক থেকেই বীরাঙ্গনা। সারাটা জীবনের প্রত্যেকটা দিন অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখকষ্ট, নির্যাতন, অপমান তাদের সহ্য করতে হয়। তা করার পরেও স্বামী, পুত্রকন্যা ও পরিবারের অকুণ্ঠ সেবায় তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেন। তার পরেও তাঁরা যদি সমাজে বীরাঙ্গনার সম্মান না পান, এবং তার জন্য সতীদাহের মতন কদর্য নাটকের অভিনয় করতে হয়, তাহলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কিছু নেই। যে-কোন 'সতী'র চেয়ে এদেশের সাধারণ মেয়েরা অন্তত দশগুণ বেশি বীর। এইসব সামাজিক প্রথার কথা মনে হলে তাই হিন্দুধর্মের উপর শ্রদ্ধা বা আস্থা থাকে না।

হিন্দুরা চারটি বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। জাতিগত মর্যাদার দিক থেকেও এই চারটি বর্ণ যথাক্রমে

বিন্যস্ত। সর্বোচ্চ মর্যাদা ব্রাহ্মণের, তারপর ক্ষত্রিয়ের, তারপর বৈশ্যের এবং সকলের নীচে শূদ্রের। প্রত্যেক বর্ণের পেশা, কাজকর্ম ও সামাজিক দায়িত্ব স্বতন্ত্র। যদি কেউ তা পালন না করে তাহলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়, সে 'পারিয়া' হয়ে যায়। এই সমাজচ্যুতদের পঞ্চম জাতি বা বর্ণ বলা যেতে পারে। জনসমাজের যত আবর্জনা সব এসে এই তলার স্তরে জমা হয়, এবং সমাজের যতরকমের নোংরা কাজ আছে তাই করে তারা জীবনধারণ করে। সকলে ব্রহ্মের ধর্মে বিশ্বাস করে এবং 'ব্রহ্ম' থেকে যাঁদের নাম 'ব্রাহ্মণ' হয়েছে তাঁরাই ধর্মাচরণে পৌরোহিত্য করেন। স্বভাবতঃই সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় জাতি তাঁরাই। হিন্দুদের যা-কিছু ধর্মকথা সব নাকি 'বেদ' নামক পবিত্র গ্রন্থে আছে। সেই গ্রন্থ দুর্বোধ্য ও অচল সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং তা কেবল ব্রাহ্মণদের পাঠ করার অধিকার আছে। হিন্দুরা ত্রিদেবতার পূজা করেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মা হলেন স্রষ্টা, বিষ্ণু হলেন ত্রাতা এবং শিব হলেন প্রলয়কর্তা। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধ্যানধারণা ত্রিনাথের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার একথাও হিন্দুরা বলেন যে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাই হলেন পরমেশ্বর, বাকি সমস্ত ঈশ্বর-ধারণার মূল উৎস। ব্রহ্মা সমস্ত জ্ঞানের ও সত্যের আকরস্বরূপ। হিন্দুদের দেবতার মন্দির আছে, কিন্তু সেখানে শুনেছি হিন্দু ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। আমি মন্দিরে যাইনি বা বা তার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত কোন দেবতার মূর্তিও দেখিনি। লোকমুখে শুনে মনে হয়েছে, মূর্তিগুলি যতদূর ভয়াবহ ও কিম্ভূতকিমাকার হতে পারে তাই। এই প্রসঙ্গে পোপের একটি কবিতা মনে পড়ে :

> Gods changeful, partial, passionate unjust,
> Whose attributes are rage, revenge, or lust.

এইসব দেবতার প্রতি এদেশের লোকদের যে কি অচল ভক্তি, এবং তার যে কি উন্মত্ত প্রকাশ তা তোমাকে চিঠিতে বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। ‘পুণ্ডরম’ বলে একটা জাত আছে (দক্ষিণ-ভারতীয়) যাদের পেশাই হল ভিক্ষা করা। পেশা হলেও তারা কিন্তু অদ্ভুত ভিখিরী। খুব ক্ষুধার্ত না হলে তারা ভিক্ষা চায় না, এবং যতটুকু না হলে খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না তার বেশি ভিক্ষা করেও না। সামান্য খেতে পেলেই তারা খুশি হয়ে সারাদিন শিবের গান গেয়ে বেড়ায়। আর একজাতের ভিখিরী আছে যারা পায়ে পেতলের আংটা ও তাবিজ পরে ঘুরে বেড়ায়, দেবতার গান গেয়ে ভিক্ষা করে। এরা কতকটা আমাদের দেশের ধর্মযাজকদের মতন, যদিও আমার মনে হয় ইয়োরোপের যাজকদের চেয়ে ভারতবর্ষের যোগী ও সন্ন্যাসীরা ধর্মের ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মনিগ্রহ সহ্য করেন। এঁরা যে কেবল দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন তা নয়, আত্মপীড়ন কতরকম উপায়ে করা সম্ভব তা এঁদের উদ্‌ভাবন করতে অসুবিধা হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : বড় বড় নখ না গজানো পর্যন্ত হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ; দিনের পর দিন, এমন কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ; উর্ধ্ববাহু হয়ে সোজা বসে থাকা।

আত্মশোধনের জন্য অথবা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এই যোগী-সন্ন্যাসীরা যে-সব দণ্ড ভোগ করতে অভ্যস্ত তা রীতিমত ভয়াবহ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি একজন যোগীকে জিবে লৌহশলাকা বিদ্ধ করে রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করতে। তখন তার জিব দিয়ে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল। শুনেছি চড়কপূজার সময় শত শত সন্ন্যাসী পিঠে লোহার হুক বিঁধিয়ে চড়কগাছের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। হুকের সঙ্গে কারও কারও পিঠে কাপড় বাঁধা থাকে, পাছে হুক ছিঁড়ে গেলে নিচে না পড়ে যায়।

দৈবক্রমে একবার আমি এই দৃশ্য দেখে ফেলেছিলাম, কারণ স্বেচ্ছায় এ দৃশ্য কেউ দেখতে চায় না। একটি লোক পিঠে হুক বিঁধিয়ে খুব জোরে চড়কগাছের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন তাকে মানুষ বলে চেনাই যাচ্ছিল না। এই নিষ্ঠুর আত্মনিগ্রহের যুক্তি হল, ভগবানের কাছে এইভাবে কষ্ট স্বীকার করে জীবনের পাপতাপ, অন্যায়-অপরাধ সব ধুয়েমুছে যায় এবং পাপীতাপীরা পবিত্র হয়ে মৃত্যুর পরে স্বর্গবাসের নিশ্চিত অধিকার লাভ করে। আর অনুষ্ঠান পালনের সময় কোনক্রমে যদি মৃত্যু হয় তাহলে তো কথাই নেই, কারণ সেক্ষেত্রে সশরীরে স্বর্গবাসের নাকি গ্যারান্টি থাকে। অতএব মৃত্যুর জন্য তারা চিন্তিত নয়, কারণ মৃত্যু মানুষের মুক্তিদাতা। এ বিশ্বাস থেকে তাদের টলানো সহজ নয়।

চড়কপূজার মতন অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক ব্যাপারে হিন্দুদের এই বিচিত্র চরিত্রের প্রকাশ দেখেছি। তাঁদের বাইরের কোমলতা ও ভীরুতা দেখে মনে হয় না যে এত সহজে অম্লান বদনে মৃত্যুও বরণ করতে পারেন। মৃত্যুটা যেন তাঁদের কাছে কিছুই নয়, এবং এ-ব্যাপারে তাঁরা এত দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারেন যে তাঁদের বাইরের চেহারা দেখে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। নিজেদের অবিচল আস্থা অনুযায়ী দাবি তাঁরা যেন মৃত্যুর বিনিময়ে আদায় করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। সম্প্রতি এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে যা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। একজন হিন্দু ভিক্ষুক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কোন বড়-লোকের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। ধনিক গৃহস্বামী জাতিতে ছোট ছিলেন। হয় তাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়নি, অথবা অল্প ভিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, ঠিক জানি না। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের অন্তর্নিহিত ব্রাহ্মণ্য তেজ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তখন প্রশ্নটা দাঁড়ায়,—

ছোটজাতের এতবড় স্পর্ধা, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দিয়ে অপমান করা! ব্রাহ্মণ ভিখিরী বড়লোকটিকে যোগ্য শাস্তি দেবার সংকল্প করে দরজার কাছে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল, প্রতিজ্ঞা করল যে অন্যায়ের প্রতিবিধান না করলে একতিলও সে নড়বে না। বড়লোকের বাড়ি, ভৃত্যের অভাব নেই। ভৃত্যরা এসে একে একে তাকে ভাল মুখে, ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করল দরজার কাছ থেকে উঠিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণের, ভিখিরীর নয়, সুতরাং তা টলানো সম্ভব হল না। অবশেষে ভৃত্যরা ধরাধরি করে তুলে তাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দিল। তার ফলে সে হল্লা করে পাড়া তোলপাড় করতে লাগল এবং বললো যে অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত সেই স্থান থেকে সে কিছুতেই নড়বে না। গৃহকর্তা তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, তাতেও কোন ফল হল না। গোঁড়া হিন্দুর মতন অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে দরজার কাছে শুয়ে রইল, এবং তার দাবি হল অন্যায়ের প্রতিকার চাই। প্রায় ৩৮ ঘণ্টা শুয়ে থাকার পর বৃদ্ধ ভিখিরীর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। মৃত্যুর সময় তার নিশ্চয় এই বিশ্বাস ছিল যে অন্যায়ের প্রতিকার একদিন হবেই, এবং তার মৃত্যু সেই প্রতিকারের পথ পরিষ্কার করবে। একদিক থেকে বিচার করলে তার ধারণা যে ভুল তা বলা যায় না, কারণ বাড়ির দরজার সামনে এইভাবে একজন ভিখিরীর মৃত্যুর ফলে লোকটিকে জরিমানা ও গঞ্জনার যে অসহ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে তা বর্ণনাতীত।

যাই হোক, আমি অন্তত জীবনে কখন এই ধরনের আশ্চর্য মনোবল এবং ততোধিক আশ্চর্য পরম নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণের কথা শুনিনি। ভারতবর্ষের হিন্দুচরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও একাগ্রতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। এই-

সব বলিষ্ঠ গুণের পাশাপাশি দুর্বলতা, ভাবাতিশয্য, কোমলতা প্রভৃতি বিপরীত সব গুণের এক অদ্ভুত সমাবেশ হয়েছে হিন্দু-চরিত্রে। বাইরে থেকে একজন নিরীহ হিন্দুকে দেখে বোঝাই যায় না যে তার মধ্যে কি ভয়ানক আগ্নেয়গিরি লুকানো আছে, প্রয়োজন হলে যার মৃত্যুভয়হীন ভয়ংকর রূপ যে-কোন সময় প্রকাশ পেতে পারে।

সম্প্রতি একজন ধনিক হিন্দুর একটি বিবাহের শোভাযাত্রা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। পাত্রের সঙ্গে পাত্রীও শুনলাম একই পাল্কির মধ্যে বসে চলেছে। পাল্কিটি চমৎকার করে সাজানো। পাত্র ও কন্যা উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে চলেছে নানারকমের বেশভূষায় সেজেগুজে। কেউ যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কেউ পাল্কিতে করে, কেউ বা হাতির পিঠে চড়ে। বড়লোকের বাড়ির বিয়ে, জাঁকজমকের অভাব নেই। সবার আগে গেছে নর্তক-নর্তকী ও গাইয়ে-বাজিয়েরা। রাত্রে শুনলাম কন্যাপক্ষের বাড়িতে প্রচুর বাজি পোড়ানো হয়েছিল এবং বেশ চর্বচোষ্য ভোজ দিয়েছিলেন কন্যার পিতা। ভোজে কোন ইয়োরোপীয়ান কেউ উপস্থিত ছিলেন বলে শুনিনি। এই ধরনের বিবাহ এখানে প্রায়ই ঘটে থাকে। একজন ধনীলোকের একটিমাত্র কন্যা ছিল, তিনি স্বজাতির একটি দরিদ্র ছেলেকে মেয়ের স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে বাড়িতেই রাখতে চান। তাঁর পক্ষে এরকম ব্যবস্থা করারও বিশেষ প্রয়োজন, তার কারণ মেয়ের স্বামী এক্ষেত্রে তাঁর পরিবারে পুত্রের মতন গৃহীত হওয়া ছাড়া উপায়ই নেই। এরকম বিবাহে পাত্রকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে এসে তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সে শ্বশুরের পরিবারের নিজের লোক হয়ে যায়। আইনত কন্যার সঙ্গে গৃহসম্পত্তি যৌতুক দেওয়া নিষিদ্ধ হলেও এক্ষেত্রে

যার কিছু নেই এরকম ছেলেকে ঘরবাড়ি সম্পত্তি সব দেওয়া হয়। এইভাবে বিবাহ করে দরিদ্রের পক্ষে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হওয়া এদেশে মোটেই শক্ত নয়, তবে একটি মেয়ের জীবনের দায়িত্বের বিনিময়ে তা হতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধ শ্বশুর মারা যান। তখন তাঁর যুবক জামাইটি হঠাৎ স্বাধীন হয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে। এতদিন সে যা করেছে তা নিজের পিতামাতা ও শ্বশুরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। অতএব প্রথম সুযোগ পাওয়ার পরেই সে তার আত্মীয়াদের একটি গরীবের ঘরের মেয়ের খোঁজ করতে বলে বিবাহ করার জন্য। অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে যায়। প্রথমে গরীবের ছেলে হয়ে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সে ঘরজামাই হয়েছিল, এবারে শ্বশুরের মৃত্যুর পর নিজে বড়লোকের ছেলের মতন গরীবের মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনল। এদেশে এই বহুবিবাহের প্রথা অত্যধিক প্রচলিত, দু'চারটি বিবাহ করতে পুরুষদের কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই। প্রথাটির আরও বৈচিত্র্য হল, প্রথম স্ত্রীর মর্যাদা পরবর্তী স্ত্রীদের তুলনায় সবসময়ই বেশি। আইনত স্বামী প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে পালাক্রমে বাস করতে বাধ্য। প্রথাটা বেশ বিচিত্র নয় কি ?

আমার বেনিয়ান দত্তরাম চক্রবর্তী গত বিশ-ত্রিশ বছর হল বিবাহ করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের কথা হল যে এখনও পর্যন্ত একটির বেশি বিবাহ করেননি। তিনি খুব অহংকার করে বলেন যে তাঁর পুরনো স্ত্রী নিয়ে তিনি বেশ সুখেস্বচ্ছন্দেই ঘরকন্না করছেন, যা তাঁর বহু সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধব নতুন নতুন একাধিক স্ত্রী নিয়ে করতে পারছেন না। বেনিয়ানবাবু কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেননি। আমারও ধারণা, তাঁর কথাই ঠিক।

হিন্দু মহিলাদের কখনও ঘরের বাইরে বেরুতে দেখা যায় না। যখন তাঁরা বাইরে বেরোন পাল্কিতে বা গাড়িতে করেই চলাফেরা করেন এবং তার চারিদিক পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। ইচ্ছা হলেও মুখ বাড়িয়ে কিছু দেখা যায় না এবং কোন কৌতূহল মেটানো যায় না। একবার আমি দৈবাৎ দু'টি অতীব সুন্দরী মহিলাকে দেখে ফেলেছিলাম। কিন্তু নানারকমের বেশভূষায় ও গহনাগাঁটিতে তাঁরা এমন সুসজ্জিত যে সত্যিই আসলে তাঁরা কতখানি সুন্দর তা বলা মুশকিল। যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাজগোজ করতে তাঁদের সমস্ত সময়টুকু কেটে যায়। মাথার চুল বাঁধতে, চোখের ভ্রূ-জোড়া ও পাতা কাজলকালো করতে, দাঁত হাত নখ সুদৃশ্য করতে প্রচুর সময় ও অবকাশের দরকার হয়। হিন্দু রমণীদের প্রসাধন-নৈপুণ্য দেখলে অবাক হতে হয়। সাজগোজের কলাকৌশল চর্চা করতে এত বেশি সময় তাঁরা অতিবাহিত করেন যে মনে হয় যেন এছাড়া আর অন্য কোন কাজ নেই তাঁদের। কিন্তু তার জন্য তাঁদের বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতু রূপচর্চা তাঁদের করতেই হয়, প্রথমত স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য, দ্বিতীয়ত সপত্নীদের চিত্তাকর্ষণের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করার জন্য।

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮১

যে-সব হিন্দু পয়সা দিয়ে কাঠ কিনতে পারেন তাঁরা দাহ করে মৃতদেহ সৎকার করেন। কলকাতার পাশে গঙ্গায় নৌকা করে বেড়াতে বেরোলে এই মৃতদাহের দৃশ্য অনেক দেখা যায়, কারণ গঙ্গার তীর ধরে হিন্দুদের সব শ্মশান। অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্য, রাতেই বেশি দেখা যায়। এ বিষয়ে বেশি কিছু আর লিখব না। যারা গরীব লোক, কাঠ কেনার পয়সা যোগাড় করতে পারে না, তারা মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয় এবং তা পচে দুর্গন্ধে

আবহাওয়া দূষিত করে। এর চেয়ে দাহপ্রথা বীভৎস হলেও ভাল। বহুবার আমি নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দ্রুতপদে হেঁটে ফিরে এসেছি, মৃতদেহ সৎকারের সশব্দ অনুষ্ঠান সহ্য করার ক্ষমতা হয়নি।

রুগ্ন ও মুমূর্ষুদের সম্বন্ধে হিন্দুদের আরও বীভৎস একটি প্রথা আছে। এদেশের ব্রাহ্মণরা কেবল পৌরোহিত্য করেন না, চিকিৎসাদিও করেন। কোন রোগীকে দেখেশুনে যখন তাঁরা আত্মীয়স্বজনের হাতে সমর্পণ করে দেন, তখন রোগী জীবিত থাকলেও ধরে নিতে হবে যে তার মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব মৃত্যুর পূর্বের অনুষ্ঠান গঙ্গাযাত্রা বা গঙ্গাজলির কাজ আরম্ভ হয়। আত্মীয়রা কাঁধে করে তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায় এবং সেখানে জলে চুবিয়ে তার চোখ-মুখ-নাকে গঙ্গামাটি ঠেসে গুঁজে দেওয়া হয়। তার ফলে রুগ্ন লোকটি ক্রমেই মরণাপন্ন হতে থাকে এবং মরেও যায়। অর্থাৎ মরতে তাকে বাধ্য করা হয়, কারণ গঙ্গাজলির পর বেঁচে থাকলেও তাকে আর ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাহলে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়।

ডঃ জ্যাকসন একবার একজন হিন্দুরাজার স্ত্রীর গঙ্গাযাত্রা শুরু হবার সময় রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি রাজাকে বলেন যে তাঁর স্ত্রীর বেঁচে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং তিনি নিজে তাঁর চিকিৎসা করবেন। ভাগ্যিস গঙ্গা-যাত্রা অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়নি! তাহলে তো মহিলাকে মরতেই হত। জ্যাকসন কোম্পানির ডাক্তার, তাঁর নামডাক খুব। রাজা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং রানীর চিকিৎসা চলতে থাকল। রানী বেঁচে উঠলেন এবং আজও তিনি বেশ দিব্বি বেঁচেবর্তে আছেন। এ ঘটনার পর জ্যাকসনের সুনাম আরও বেড়েছে, এবং তিনি গঙ্গাযাত্রার স্তর থেকে আরও দু'চারজন রোগীর জীবন রক্ষা করেছেন।

চিঠিখানা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল, সুতরাং এইখানেই শেষ করছি। আশা করি শীঘ্রই তোমাদের সুসংবাদ শুনতে পাব। ইতি—

তোমার স্নেহের বোন

ই. এফ.

৭

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ১৭৮১

প্রিয় বোন,

স্যার রবার্ট ও লেডি চেম্বার্স কলকাতায় কিছুদিন ছিলেন, এখন আবার বাইরে চলে গেছেন খুব মানসিক কষ্ট পেয়ে। লেডি চেম্বার্সের ইচ্ছে ছিল এখানেই থাকেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি তাঁদের পরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, নবজাত শিশুটি ছ'মাস বয়স হবার পর হঠাৎ তিনদিনের অসুখে মারা গেছে কয়েক সপ্তাহ আগে। ছেলেটির কথা আমিও সহজে ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।

মিস্টার ও মিসেস হোসিয়া কলকাতায় এসেছেন এবং গ্রসভেনর জাহাজে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার ব্যবস্থাও করেছেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁদের সঙ্গে যাব, কিন্তু তা সম্ভব হল না।

উত্তরভারতের কোন এক জায়গায় মিস্টার হোসিয়া রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি একজন সৎচরিত্র ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীর মতন অমায়িক ভদ্রমহিলাও আমি দেখিনি। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে না ভালবেসে পারা যায় না।

স্যার চেম্বার্সের মা খুব সুন্দর অভিজাত প্রকৃতির বৃদ্ধা মহিলা, বয়স অনুপাতে সর্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও কৌতূহল অনেক বেশি। মিসেস হোসিয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হবার পর তাঁদের সাহচর্যে আমার দিনগুলি এখানে বেশ ভালই কেটেছে। এর

আগে বর্ষাকালে যখন একা ছিলাম তখন সঙ্গিহীন অবস্থায় দিনগুলি আমার খুবই কষ্টে কেটেছে। ডঃ জ্যাকসনের বাড়ি আমি নিয়মিত যাতায়াত করি। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি আমার পরিচয় হয়েছে যেখানে কোন নিমন্ত্রণ বা আপ্যায়নের প্রত্যাশা না করেই মধ্যে মধ্যে আমি যাই। সত্যি কথা বলতে কি, কোনরকম পারিবারিক বা সামাজিক লৌকিকতা এখন আর আমি সহ্যই করতে পারি না। বর্তমানে মনের দৈন্য আমার কতদূর বেড়েছে তা বুঝতেই পারছ, অথচ একসময়ে কত উচ্চাশাই না পোষণ করতাম সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে। এখন কেবল একটি কথা আমার অনবরত মনে হয়, যে-সমাজে আমি সহজে মেলামেশা করব সেখানে আমার সঠিক স্থান কোথায়? বোধ হয় কোন স্থান নেই, একমাত্র অপমানের ও বেদনার স্থান ছাড়া। তাই আমার মন চায় এই স্থান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে এবং এমন এক জায়গায় সান্ত্বনা খুঁজতে যেখানে অন্তত তা দেবার মতন লোকের অভাব নেই। আর কিছু না হোক সেখানে অন্তত মৃত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠবে না। মনে করো না এসব কথা তোমাকে লিখছি কোন ব্যক্তিগত অনুশোচনার ফলে, অথবা এইসব হতাশার কথা লিখছি বলে মনে ভেব না যাঁরা নানাভাবে আমার উপকার করেছেন তাঁদের কথা অকৃতজ্ঞের মতন ভুলে গেছি। বহু মহানুভব ব্যক্তির সান্নিধ্যেও আমি এসেছি এবং তাঁরা সব সময় আমার প্রতি যে উদার ব্যবহার করেছেন তা আমার দাবি করা তো দূরের কথা, প্রত্যাশা করারও অধিকার নেই। সেই ব্যবহার কি কোনকালে ভোলা সম্ভব? সম্ভব নয়। এটা আমার সারাজীবন গর্ব করে বলার মতন ব্যাপার যে বন্ধুবান্ধবের ভাগ্য আমার ভাল। যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন এই বন্ধুদের সহৃদয়তার কথা আমি ভুলতে পারব না।

আজকের মতন এখানেই থাক, পরের চিঠিতে আরও কিছু লিখব। আশা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় শীঘ্রই আমি আমার প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারব।

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি ১৭৮২

সপ্তাহ তিনেক আগে মিসেস হোসিয়ার একটি সন্তান হয়েছে। এখন তাঁর সমুদ্রযাত্রা করতে বাধা নেই, অতএব পুরোদমে তার প্রস্তুতি চলেছে। স্যার রবার্টের বড় ছেলেটিও হোসিয়াদের সঙ্গে যাচ্ছে। সুন্দর ছেলেটি, নাম টমাস, বয়স বছর সাতেক হবে। বিলেত পাঠাবার বয়সের দিক থেকে একটু দেরী হয়ে গেল মনে হয়, কিন্তু এর আগে ওঁরা সঙ্গে পাঠাবার মতন ভাল লোক পান নি। হোসিয়াদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর একটি মেয়েও সঙ্গে যাচ্ছে। মেয়েটির নাম মিস শোর, টমাসের সমবয়সী। মিসেস হোসিয়া তাঁর একটি বছর দেড়েকের ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। নবজাত শিশুটি লেডি চেম্বার্সের কাছে থাকবে। আগামীকাল একটি নামকরণের অনুষ্ঠান হবে, এবং সেখানে বড় বড় সব দলের অভ্যর্থনার ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকা আমার উপায় নেই। কেবল একটি পরিবারের ক্ষেত্রে তা পারব না। হোসিয়ার নবজাত শিশুর নামকরণ হবে আগামী মাসের গোড়ার দিকে এবং তাতে স্যার রবার্ট সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এখন মিসেস হোসিয়ার পরিবারের সঙ্গে আমি খুব গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছি, তাঁর সঙ্গে সত্যিকার বন্ধুত্ব-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যদি তাঁর সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে পারতাম ভালই হত, এখন তা নানা কারণে সম্ভব হচ্ছে না। আর একটি জাহাজও সম্প্রতি যাত্রা করেছে, কিন্তু তাতেও যাত্রীর ভীড় বেশি। সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আমার উপায় নেই। শুধু কি যাত্রীর ভীড়?

প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে কি পরিমাণ যে লটবহর যায় তা ভাবা যায় না। মিস্টার ও মিসেস হোসিয়ার জন্য ২৯টি ট্রাঙ্ক ভর্তি জিনিসপত্র আমি নিজে গুণে দেখেছি। তাছাড়া চেষ্ট-ড্রয়ার, নানারকমের প্যাকেট, কেবিনের বহু জিনিস তো আছেই। মাদ্রাজ ঘুরে যাবার জন্য তাদের খরচও বেশি পড়বে, বাংলাদেশ থেকে সোজা যাত্রা করলে এই অতিরিক্ত খরচের একটি টাকাও লাগত না। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে মালপত্তর ওঠানামা করানোর খরচ ও অসুবিধাও কম নয়। সেটাও তাদের ভোগ করতে হবে।

চুঁচুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৭৮২

গত প্রায় পনের দিন ধরে অত্যধিক কাজকর্মের চাপে চিঠিপত্র লেখার অবসর পাই নি। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা খুবই দুঃখের। সেকথা পরে বলছি।

আমাদের বন্ধুরা গত ২ তারিখে চলে গেছেন। সদ্যোজাত বাচ্চাটিকে রেখে যাবার সময় মিসেস হোসিয়া খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। হবারই কথা, কারণ মাত্র ২৫ দিনের কোলের শিশুকে কোন মায়ের পক্ষে এইভাবে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কারণেও যাবার সময় তাঁর দুশ্চিন্তা হয়েছিল। অ্যাডমিরাল সাফরেন বঙ্গোপসাগরে নিজেদের জাহাজের চলাফেরার উপর বিশেষ নজর রাখেন, কিন্তু স্যার হিউজেস ফরাসী নৌবহরের পশ্চাদ্‌ধাবনে ব্যস্ত।

ছেলেকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে স্যার রবার্ট ও লেডি চেম্বার্স দু'জনেই খুব মুশড়ে পড়েছেন। মিসেস চেম্বার্স একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন নাতির শোকে। জাহাজ ছাড়ার পাঁচদিন পরে তাঁর হঠাৎ খুব অসুখ হয় এবং সাতদিনের দিন বৃদ্ধা মারা যান। স্যার রবার্ট খুবই ব্যথিত হয়েছেন মা'য়ের মৃত্যুতে। হবারই কথা, না

হলে আমি বিস্মিত হতাম। কারণ তাঁর মতন স্নেহশীলা মা'য়ের কথা সহজে ভোলা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর ছেলে রবার্টের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর মতন উদার দানশীলা মহিলাও আমি দেখি নি। তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই শোকাভিভূত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল। পরদিন তাঁর শবযাত্রায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন, উল্লেখযোগ্য মহিলা ও ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ বাদ ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি যেরকম প্রকৃতির মহিলা ছিলেন তাতে তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদনে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।

চুঁচূড়া শহরটি কেমন নিশ্চয় তোমার জানার কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু শহরের ঘরবাড়িগুলি খুব সুন্দর, সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন, এই কথা বললে শহর সম্বন্ধে আর কিছু বলার থাকে না। শহরবাসীরা যে খুব আনন্দে দিন কাটায় এমন কথা বলা যায় না। শাসকরা তাঁদের প্রতি উদার, এবং সকলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধেও সচেতন বলে মনে হয়।

এই শহরটি দখল করার ব্যাপার নিয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা নিয়ে পরে আদালত পর্যন্তও গড়াতে পারে। একটি কোম্পানির জাহাজ (ফ্রিজেট বা যুদ্ধের স্লুপ) কলকাতায় যখন অপেক্ষা করছে তখন খবর এল যে ডাচ্‌রা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। খবর পেয়ে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর নাবিক-লস্কর নিয়ে চুঁচূড়া অভিযান করেন এবং সেখানে রাত প্রায় দুটোর সময় পৌঁছে স্থানীয় গবর্নরকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে, এবং সৈন্য-সামন্তসহ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত না থাকায়, গবর্নরও তাঁর হুকুম মেনে নিতে বাধ্য হন। এদিকে কোম্পানির সৈন্যদল যথাসময়ে

নির্দেশ অনুযায়ী সকাল সাতটায় চুঁচূড়ায় পৌঁছে দেখে যে তাদের কর্তব্যকর্ম আগেই করে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনে সকলেই খুব হাসাহাসি করতে লাগল। ক্যাপ্টেনকে বলা হল তাঁর দখলীস্বত্ব ত্যাগ করতে। তিনি বললেন, তা তিনি করতে পারেন, কিন্তু তাঁর লোকলস্করকে পুরস্কৃত করতে হবে। ব্যাপারটা বিচিত্র নয় কি ?

৮

কলকাতা, ১৭ মার্চ ১৭৮২

প্রিয় বোন,

এইটাই বোধ হয় বাংলাদেশ থেকে লেখা আমার শেষ চিঠি। কারণ অনেক চেষ্টা করে অবশেষে একটা নতুন জাহাজে স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছি। জাহাজটির এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা। জাহাজের একজন সঙ্গিনীও পাওয়া গেছে এবং তাতে আমার পক্ষে খুবই ভাল হয়েছে। ক্যাপ্টেন লুইস জাহাজের কর্ণধার। কর্নেল ও মিসেস টোটিংহ্যাম সপরিবারে আমাদের সঙ্গে যাবেন। তাঁরা ছাড়া কোম্পানির তু'জন সিভিলিয়ান, সাতজন মিলিটারী কর্মচারী এবং তেরটি শিশুও আমাদের সঙ্গে যাত্রা করছে। এপ্রিল মাসের গোড়ায় জাহাজ ছাড়ার কথা। মিসেস ডব্লুর বাড়িতে কাল রাতে ক্যাপ্টেন লুইসের সঙ্গে খানা খেলাম। তাঁর অমায়িক আচরণে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। সাধারণত জাহাজের ক্যাপ্টেনরা বেশ একটু অহংকারী হয়ে থাকেন, কিন্তু লুইসের মধ্যে তার কোন আভাস পাওয়া যায় না। এরকম একজন কমাণ্ডারের অধীনে সমুদ্রযাত্রা করা সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। জাহাজের সহযাত্রীরা ভাল হলে আমাদের সমুদ্রযাত্রা বেশ আরামের হবে মনে হয়।

বাক্স-প্যাঁটরা জিনিসপত্র সব তাড়াতাড়ি গোছগাছ করতে হচ্ছে, লেডি চেম্বার্স যথাসাধ্য সাহায্য করছেন। অন্যান্য বন্ধুরাও যেখান

থেকে যা পারছেন যোগাড় করে দিচ্ছেন। এমন সব জিনিস যা জাহাজে তো বটেই, এমন কি ইংলণ্ডে গিয়েও কাজে লাগতে পারে। এখানে এক ভদ্রমহিলা একটি স্কুল করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাকে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাতে সম্মত হওয়া সম্ভব হল না। অবশ্য স্কুল করতে পারলে খুব ভাল হত; কারণ যে মহিলাটি প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও বন্ধুত্ব, কাজকর্মের ব্যাপারে মতামতের অমিল হত না বলেই মনে হয়।

কলকাতা, ২৮ মার্চ ১৭৮২

গতকাল সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন পি'র সঙ্গে আমার এক তরুণী বান্ধবী মিস টি'র বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ডঃ জ্যাকসনের বাড়িতে বিবাহ হয়েছিল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বলনাচ হবে ঠিক হল, কিন্তু তখন অতিথিদের মধ্যে কাউকে নাচতে রাজী করানো সম্ভব হল না। শরীর খারাপ বলে আমার দিক থেকে নাচের কোন প্রশ্নই ওঠে নি। অবশেষে মিসেস জ্যাকসন, ৬৫ বছরের বৃদ্ধা, নিরুপায় হয়ে নাচের আসরে নামলেন। সে কি নাচ! যেমন নাচের ছন্দ, তেমনি পায়ের ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততাল। অবলীলাক্রমে তিনি প্রায় ঘণ্টা দুই নাচলেন, যে-কোন স্বাস্থ্যবতী যুবতীরও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবার কথা। যাই হোক, তাঁর নাচের সুফল হল এই যে অনেকে উৎসাহিত হয়ে একে-একে আসরে নামলেন। নাচ শেষ হলে সকলে বসে বেশ আনন্দে সাপার খাওয়া গেল। প্রচলিত 'টোস্টে'র পালা সাঙ্গ করে রাত্রি প্রায় একটার সময় বাড়ি ফিরলাম। কামনা করি, নবদম্পতী সুখে শান্তিতে থাকুক।

ভ্রমণবৃত্তান্ত

ফ্যানি পার্ক্‌স

১৮২২-২৮ খ্রীষ্টাব্দ

১

১৮২২-২৩ সন

শ্রীমতী ফ্যানি পার্ক্‌স কলকাতা শহরে এসেছিলেন অনেকদিন আগে, ১৮২২ সালে নভেম্বর মাসে। ইংলণ্ড থেকে তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং নানা দেশ ঘুরে শেষে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। তখন এদেশে ইংরেজদের প্রধান ও প্রথম দর্শনীয় স্থান ছিল কলকাতা শহর। ভারতভ্রমণে এসে ফ্যানি কিছুটা 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিলেন মনে হয় অজ্ঞাতসারেই। দেবনাগরী অক্ষরে 'শ্রী গণেশঃ' নামে একটি বহুবর্ণচিত্র তাঁর গ্রন্থের শোভাবর্ধন করছে। ভূমিকায় লেখিকা লিখেছেন, 'although a *pukka Hindu*, Ganesh has crossed the *Kala Pani*, or Black Waters, as they call the ocean, and has accompanied me to England. There he sits before me in all his Hindu state and peculiar style of beauty—my inspiration—my penates.'

"শ্রীগণেশ পাক্কা হিন্দু হলেও কালাপানি পার হয়ে আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে এসেছেন। তিনি তাঁর হিন্দুত্বের সমস্ত মর্যাদা ও ঐশ্বর্য নিয়ে আমার সামনে উপবেশন করে আছেন। আমার প্রেরণা ও ক্ষমতার উৎস তিনি।"

অতঃপর শ্রীগণেশকে 'সেলাম, সেলাম' বলে বন্দনা করে শ্রীমতী ফ্যানি ভ্রমণকাহিনী লেখা আরম্ভ করেছেন।

নভেম্বর ১৮২২॥ অপূর্ব ও বিচিত্র শহর কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। কলকাতাকে সকলে ‘প্রাসাদপুরী’ (City of Palaces) বলেন। এ নাম সত্যিই তার প্রাপ্য। নদীতীরে ময়দানের সামনে বিশাল ‘গবর্নমেণ্ট হাউস’, তার পেছনে অ্যাণ্ড্রুজ চার্চ ও শহর। বাঁদিকের জায়গার নাম ‘চৌরঙ্গি’। সুন্দর সব বাগান-ঘেরা ছাড়াছাড়া বাড়ি চৌরঙ্গি অঞ্চলে। বড় বড় স্তম্ভের উপর টানা-টানা বারান্দা, নিচে থেকে উপর পর্যন্ত, বাড়িগুলির চেহারায় এমন একটা মনোরম গাম্ভীর্য এনেছে যা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। এই নির্মাণ-কৌশলের জন্য রৌদ্রের তাপেও বাড়ি ঠাণ্ডা থাকে এবং বর্ষার বৃষ্টিধারাও উপভোগ করা যায়। গড়নের জন্যও বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন বাড়িগুলি পাথরের তৈরি। চৌরঙ্গিতে বাড়িভাড়াও অত্যন্ত বেশি, আসবাবপত্র ছাড়া মাসিক ৩০০-৩৫০৲ টাকা, বড় বাড়ি ৪০০-৫০০৲ টাকা। আমরা ৩২৫৲ টাকা ভাড়া দিয়ে চৌরঙ্গিতেই একটি বাড়ি নিলাম।

ভারতীয় গৃহের সাজসজ্জার সঙ্গে ইংলণ্ডের বেশ পার্থক্য। ঘরের মেঝে মাদুর বা সতরঞ্চি দিয়ে ঢাকা থাকে। শীতকালের কয়েক মাস পার্সী বা মির্জাপুরী কার্পেট পাতা হয়। ঘরের দরজা-জানলা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ঘরগুলিও অনেক বড় ও উঁচু। প্রত্যেক শোয়ার ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম আছে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য মধ্যে ছোট ছোট ঠেলাদরজা আছে। শৌখিন আসবাবপত্রের অভাব নেই শহরে। চমৎকার ফরাসী ফার্নিচারের জন্য মঁসিয়ে ছ্য বাস্তের দোকান কলকাতা শহরে বিখ্যাত। বড় বড় মার্বেল পাথরের টেবিল, সুন্দর সুন্দর আয়না ও আরামকেদারা তাঁর দোকানে প্রচুর মজুত থাকে। এ ছাড়া ইয়োরোপীয়দের আরও অনেক ফার্নিচারের দোকান আছে কলকাতায়। ক্যাবিনেট-মেকারদের মধ্যে বোধ হয় বিদেশীদের

সংখ্যাই বেশি। কিন্তু বিদেশীদের দোকানে আসবাবপত্র তৈরি করে এদেশী ছুতোর-মিস্ত্রিরা, সাহেবরা তাদের নির্দেশ দেন। স্থানীয় অন্যান্য বাজারে যেসব কাঠের জিনিসপত্র বিক্রি হয় তা ভাল নয়।

শীতকালে কলকাতার আবহাওয়া এত মনোরম ও লোভনীয় যে সব সময় আমার ইংলণ্ডের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কথা মনে পড়ছিল। এই সময় কলকাতায় বাস করলে তাঁরাও নিশ্চয় খুশি হতেন। কলকাতা দেখে সারা ভারতবর্ষটাকেই আমার সুন্দর দেশ বলে মনে হল। কিন্তু ভারতবর্ষে বাস করতে গেলে যে এত ভৃত্যের প্রয়োজন হয় তা আগে কল্পনাও করতে পারি নি। কেবল আমি নই, ইয়োরোপ থেকে যে-কেউ প্রথম এদেশে এলে ভৃত্যের বহর দেখে অবাক হয়ে যাবেন। মনে হবে শুধু চাকরের চাপে তাঁর পতন অনিবার্য। ভৃত্যদের বেতন বেশি নয়, অনেক সময় খেতে দিলেও তারা কাজ করে। কিন্তু এত বেশি সংখ্যায় তাদের রাখতে হয় যে তাতে খরচ কুলিয়ে ওঠা বেশ রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে।

স র কা র॥ সংসারে ভৃত্যকুলের শিরোমণি হলেন সরকার মশায়। এই ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া এক-পাও চলবার উপায় নেই। প্রত্যহ সকালবেলা সবার আগে তাঁরই মুখদর্শন করতে হয়। খাতা হাতে, মাথা নত করে তিনি এসে সামনে দাঁড়ান, সেদিনের কেনাকাটার ফিরিস্তি তৈরি করার জন্য। মেমসাহেবের কাছ থেকে অর্ডার নেওয়া শেষ হলে তিনি বাজার করতে যান। ফার্নিচার বই পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি সাহেবদের দোকান ঘুরে ঘুরে নিয়ে আসেন, এবং গৃহকর্ত্রীর পছন্দ হলে কিনে দেন। বিদেশী বা দেশী, ছোট বা বড় সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী বা দোকানদারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। জিনিস কেনার জন্য তাঁর

পাওনা হল দস্তুরি, এবং সকলকেই তা দিতে হয়। নেহাত ভিক্ষের কড়ি নয় এই দস্তুরি, শতকরা বেশ ভাল একটা অংশ। মাস গেলে সেটার অঙ্ক কম মোটা হয় না। একদিন সকালে আমার সরকারকে ডেকে বললাম, কাল যে জিনিসপত্র কিনেছেন তার দাম অত্যন্ত বেশি। তার উত্তরে তিনি বললেন, "আপনি আমার মা-বাপ, আমি আপনার ছেলে। মাপ করবেন আমাকে, আমি বেশি কিছু নিই নি, টাকায় মাত্র দু'আনা দস্তুরি নিয়েছি।"

এই ধরনের কথা বলতে এদেশের লোকের মুখে আটকায় না। আর-একদিন সরকার মশায় বললেন, "আপনি আমার মা-বাপ, আপনি সাক্ষাৎ দেবী।" আমি খুব বিরক্ত হয়ে সেদিন তাঁকে ধমক দিয়েছিলাম। তার উত্তরে সরকার ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, যেহেতু আমি তাঁকে অন্ন দান করছি এবং আশ্রয় দিচ্ছি, সেই জন্য আমি তাঁর কাছে দেবীতুল্য। যাই হোক, ধমকে কাজ হয়েছিল, তারপর থেকে আর কখনও তিনি ঐভাবে কথা বলতেন না। কলকাতার একজন বিশিষ্ট সরকার মশায়ের ছবি আমি বইতে ছেপে দিলাম। পরিষ্কার সাদা ধবধবে কাপড় কাছা-কোঁচা দিয়ে পরে গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে রাখাই এঁদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য। মাথাতেও একটি সাদা পাগড়ি থাকে, তার কাপড়ের দৈর্ঘ্য একুশ গজ এবং প্রস্থ চোদ্দ ইঞ্চি। এই সমস্ত কাপড়টা চমৎকার কায়দায় ভাঁজ করে পাগড়ি বাঁধা হয়। কানে খাগের কলম গোঁজা থাকে এবং হাতে থাকে সাদা কাগজ, মেমসাহেবের ফরমাশ লেখার জন্য। পায়ে থাকে নাগরা জুতো, তার চামড়া ভাল নয় কিন্তু সোনালী-রুপোলি কারুকাজ করা থাকে খুব। ভারতবর্ষের সব লোকের দেখতে পাই ছোটবড় গোঁফ থাকে। তারা সাহেবদের চাঁছাপোঁছা মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, এবং মনে হয় যে দাড়িগোঁফহীন পুরুষের মুখ

তাদের কাছে ঘৃণার বস্তু। সরকার যে জাতিতে হিন্দু, কপালে তিলকের চিহ্ন দেখে তা বোঝা যায়।

দস্তুরির কথা বলি। দস্তুরিটা হল কতকটা ট্যাক্সের মতন। দ্বারোয়ান গেটের মধ্যে কোন ফেরিওয়ালাকে ঢুকতে দেয় না দস্তুরি না পেলে। ভেতরে ঢোকার পর যদি কোন জিনিস সাহেব তার কাছ থেকে কেনেন তাহলে সর্দার-বেয়ারাকে দস্তুরি দিতে হয়। আর যদি মেমসাহেব কোন জিনিস কেনেন তাহলে দস্তুরি দিতে হয় আয়াকে। তাতে অবশ্য ফেরিওয়ালার লোকসানও হয় না, কারণ দস্তুরি হিসেব করেই সে সাহেবের কাছ থেকে জিনিসের দাম আদায় করে নেয়। সাধারণত টাকায় দু'পয়সা থেকে চার পয়সা হলো দস্তুরির হার, চার পয়সাই বেশি। তবে সরকার মশাই যদি কিছু কেনেন এবং দস্তুরির প্রার্থী হন তাহলে অন্যান্য ভৃত্যরা কেউ আর ভাগ চায় না। সরকার নিজেই প্রায় টাকায় দু'আনা হারে দস্তুরি নিয়ে নেন। ভৃত্যরা সকলে সরকারকে খুব সমীহ করে চলে, কারণ তিনি তাদের ভাগ্যবিধাতা এবং যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় আচরণের জন্য সাহেব-মেমের কাছে দায়ী। মধ্যে মধ্যে ভৃত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশ মজা লাগে। একমাত্র দরজি ছাড়া আর কেউ একটি ইংরেজি কথাও বলতে পারে না। বাধ্য হয়ে তাই আমাকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য হিন্দুস্থানী শিখতে হয়েছিল।

ইয়োরোপ থেকে যখন কেউ ভারতবর্ষে আসেন তখন প্রথম এক বছরের জন্য সেই নবাগতকে 'গ্রিফিন' (Griffin) বলা হয়। এদেশের সবকিছুই এত বিরাট বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে গ্রিফিনের দৃষ্টিতে তা তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হয়। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগে।

ডিসেম্বর ১৮২২॥ ডিসেম্বর মাসে এমন উপভোগ্য আবহাওয়া হয় কলকাতায় যে মনে হয় যেন এমন শহর পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সারা বছর যদি এই রকম আবহাওয়া থাকত তাহলে আমি পশ্চিমের লোকজনকে বলতাম ওদেশ ছেড়ে এদেশে চলে আসতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আবহাওয়া একরকম থাকে না এবং গ্রীষ্মকালের কথা মনে হলে শীতের সমস্ত আরাম একমুহূর্তে উবে যায়।

আমার স্বামী আমাকে একটি সুন্দর আরবী ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম রাখা হয়েছিল "আজর"। কি কারণে জানি না, সহিসরা এই নামটি বিকৃত করে সব সময় তাকে "অরোরা" বলে ডাকত। অবশেষে আজর ও অরোরা দুটি নামই বাদ দিয়ে তার নাম রাখা হল "রাজা"। রাজার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগত এবং রোজ ভোরে অথবা সন্ধ্যাবেলা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ও লাটসাহেবের বাড়ির সামনে ময়দানের ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে আমি রাজার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। তখন ময়দানে হাড়গিলা পাখি জমায়েত হত খুব। প্রায় দেখতাম লাটের বাড়ির গেটের মাথায় সিংহের মূর্তির উপর হাড়গিলারা সারবেঁধে বসে রয়েছে। দেখে মনে হত সিংহের মতন পাখিগুলোও বাড়ির স্থাপত্যের অঙ্গবিশেষ।

১৬ ডিসেম্বর তারিখে লর্ড হেস্টিংস লাটবাড়িতে বিরাট একটি ভোজ ও নাচের আয়োজন করে সিভিল ও মিলিটারী অফিসারদের ও কলকাতার স্থানীয় অভিজাত বাসিন্দাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নবাব ও রাজা-মহারাজারা, মারাঠী গ্রীক তুর্কী আরমেনিয়ান হিন্দু ও মুসলমানরা, নানা রকমের বিচিত্র সব পোশাক পরে ভোজসভায় এসেছিলেন। রঙ-বেরঙের পোশাকের বিচিত্র এক প্রদর্শনী হয়েছিল লাটবাড়িতে। কিন্তু এমন ঘন কুয়াশায় পথঘাট ঢেকে গিয়েছিল যে লাটবাড়িতে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তা

একেবারে দেখা যাচ্ছিল না, গাড়ি করে যাওয়াও বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। দুজন মশালচি ঘোড়ার গাড়ির আগে মশাল নিয়ে দৌড়চ্ছিল এবং গাড়িতেও আলো জ্বালা ছিল পথ দেখার জন্য। মশালের আলোয় এবং সহিস-ভৃত্য-গাড়োয়ানের হল্লায় কুয়াশা কেটে গিয়ে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। নিরাপদে আমরা লাট-বাড়িতে পৌঁছলাম।

ঘোড়াগাড়ি ছাড়া চলাফেরার জন্য পালকি ছিল কলকাতায়। বেয়ারারা বেশ দ্রুত পালকি বইতে পারত। পালকিকে দ্বিপদ ঘোড়ার যান বললেও ভুল হয় না। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করতে করতে তারা পথ চলত এবং চলার ছন্দের সঙ্গে সুরের তাল কাটত না কখনও। ওস্তাদ ও অভিজ্ঞ বেয়ারারা এমন কায়দায় দৌড়তে পারত যে পালকি একটুও দুলত না।

ইংলণ্ডের বিত্তবান ভদ্রলোকদের মধ্যে খুব কম লোকই স্ত্রী-কন্যাদের চড়ে বেড়াবার জন্য ঘোড়া পুষতে পারেন। তাই কলকাতায় এসে ইংরেজ মহিলাদের ঘোড়ায় চড়ার বহর দেখে আমি রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতায় প্রত্যেক ইংরেজ মহিলারই বোধ হয় একটি করে ঘোড়া ছিল এবং তিনি তার পিঠে চড়ে সগর্বে বেড়িয়ে বেড়াতেন। বেশ পাকা ঘোড়-সওয়ার হয়েছিলেন কলকাতার মহিলারা। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যখন দেখলাম একদিন এক ইংরেজ মহিলা, সন্তান প্রসবের মাত্র সপ্তাহ তিনেক পরে, দুর্ধর্ষ এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে ময়দানে মহানন্দে গ্যালপ্ করে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার এই অশ্ব-বিলাসী মহিলারা আমাকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কি সাংঘাতিক কড়া নার্ভ এই মহিলাদের। ভাবতেও ভয় হয়।

সিভিল-মিলিটারী অফিসাররা এবং কলকাতার স্থানীয় প্রতি-পত্তিশালী বাসিন্দারা লর্ড ও লেডি হেস্টিংসের বিদায় উপলক্ষে

একটি বিরাট ভোজ দিলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে।

ক্রীসমাসের দিনে দেখেছি বাড়ির ভৃত্যরা গাছ-লতাপাতা দিয়ে গেট সাজায় এবং চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়। বেয়ারা, ধোপা ও অন্যান্য সকলে রেকাবে ও ট্রেতে করে নানা রকমের ফল-মূল-কেক-মিষ্টি ইত্যাদি সাজিয়ে ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে আসে এবং বক্‌শিস চায়। আমার মনে হয় 'ক্রীসমাস-বক্সের' উৎপত্তি হয়েছে এইভাবে। আমরা ফল-মিষ্টি উপহার নিই, এবং তার বদলে টাকা বকশিস দিই।

সকলে বলে, চীনের পর ভারতবর্ষেই নাকি চুরি হয় সবচেয়ে বেশি। চুরির ভয়ে আমরা বাড়িতে একটি দ্বারোয়ান রেখেছিলাম এবং দু'জন চৌকিদার নিযুক্ত করেছিলাম রাত্রে পাহারা দেবার জন্য। তাছাড়া খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে বাড়ির চারিদিক ঘেরাও ছিল। এক দিন সকালে শুনলাম বেয়ারারা খুব উত্তেজিত হয়ে কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। জানা গেল আমাদের বাড়িতে গতরাত্রে চুরি হয়ে গেছে। এক বন্ধু অতিথি থাকতেন আমাদের বাড়িতে, তাঁর অনেকগুলি সোনার মোহর ও মূল্যবান জিনিসপত্র দেরাজ ভেঙ্গে চোরেরা নিয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, যে-রাতে চুরি হয়েছিল সেই রাতে চৌকিদারের হাঁকডাক শোনা গিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। চোর অবশ্য হাতেনাতে ধরা গেল না, তবে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে দ্বারোয়ান ও চৌকিদারের যোগসাজসে খানসামাই চুরি করেছে। অতএব খানসামাকেই তাড়িয়ে দেওয়া হল।

মার্চ ১৮২৩॥ প্রায় চারমাস হল কলকাতায় এসেছি, এর মধ্যে এদেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেছে। মার্চ মাস থেকে গরম হাওয়া বইতে আরম্ভ করল।

এ-হাওয়া সহ্য করা কঠিন। হঠাৎ চুল্লীর মুখ খুললে যেমন তাপ লাগে মুখে, তেমনি এই সময় দুপুরে বাইরে বেরুলে গরম হাওয়ায় মুখ পুড়ে যায়। পারতপক্ষে দিনদুপুরে এই সময় কাজকর্ম করতে বেরুনো খুবই কষ্টকর। সন্ধ্যার পরে আবহাওয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় শরীর সত্যিই জুড়িয়ে যায়। বেশ রাত করে আমরা বেড়াতে যাই, এবং শুক্লপক্ষের রাত এত সুন্দর দেখায় যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের রাতে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি জ্বলতে থাকে, মনে হয় যেন ছোট ছোট আগুনের ফুল্‌কি হাওয়ায় উড়ছে। একটা-দুটো নয়, অসংখ্য জোনাকি। এগুলো একজাতীয় পতঙ্গ, এমনি দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, লেজের দিকে আলো ঝল্‌মল করে, উড়ে যায় যখন তখন আলো জ্বলতে ও নিভতে থাকে। বাড়ির গাছপালাগুলো ঘিরে জোনাকিরা যখন জ্বলতে-নিভতে থাকে তখন যে কি সুন্দর দেখায় তা আর কি বলব!

যে-কোন নবাগত গ্রিফিনের কাছে আরও একটি আশ্চর্য বস্তু হল 'টানাপাখা'। এই বিচিত্র বস্তুটি এদেশে না এলে হয়ত চোখে দেখার সৌভাগ্য হত না। একে একটা বিরাট দৈত্যাকার পাখা বলা যায়, দশ-কুড়ি-ত্রিশ ফুট কিংবা তারও বেশি লম্বা, সিলিং থেকে মোটা দড়ি দিয়ে ঝুলনো; ঘরের বাইরে থেকে একটি লোক সেটা টানে। এ-পাখা এদেশের লোকের আবিষ্কার যে তাতে সন্দেহ নেই। যে-সে লোকের বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় না। বেশ বড়লোক না হলে ঘরে টানাপাখা ঝুলিয়ে হাওয়া খাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলে পাখা বেশ বাহারে করা যায়। ঝালর দেওয়া যায় রঙিন দামী কাপড় দিয়ে, শৌখিন লোক যাঁরা তাঁরা সিল্কের কাপড়ও দেন। কাঠের গায়ে রঙিন চিত্রের নকশাও করা যায়। টানাপাখা তখন সত্যিই চরম বিলাসিতার বস্তু হয়ে ওঠে,

মনে হয় ঘরের সিলিঙের নিচে কোন অপ্সরী যেন ডানা মেলে উড়ছে।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের আবহাওয়া খামখেয়ালী। এই হয়ত প্রচণ্ড গরমে প্রাণ আইঢাই করছে, তারপরেই হয়ত ঘনকালো মেঘ জমল আকাশে, প্রবলবেগে ঝড় উঠল কালবৈশাখী, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে লাগল, বৃষ্টি হল মুষলধারে। গাছপালাও কলকাতায় প্রচুর। এরকম সবুজের প্রাচুর্য আমাদের কাছে বিস্ময়কর। জানি না, এই ধরনের আবহাওয়ার মধ্যে কোন আল্‌সেমির আমেজ আছে কি না! থাকতেও পারে হয়ত। তা না হলে এদেশের লোক এত আল্‌সে হয় কি করে? একেবারে হাড়েমজ্জায় আল্‌সে। যেমন আমার আয়াটির কথা বলি। তার কাজ হল আমার সাজপোশাক গুছিয়ে দেওয়া। কোনরকমে সেই কাজটুকু সেরে সে তার ঘরে চলে যায়, খাওয়া-দাওয়া করে এবং ফিরে এসে আমার ঘরের এককোণে শুয়ে সারাদিন ঘুমোয়। বেয়ারাগুলোও এমন কিছু মেহনতের কাজ করে না, কেবল খায় আর ঘুমোয়। খাওয়া আর ঘুমোনো—এই হল এদেশের লোকের জীবনের প্রধান কাজ।

এদেশের লোক সকলে না হলেও, কেউ কেউ দেখতে সত্যি খুব সুন্দর। তবে দেখলেই মনে হয় প্রাণশক্তিহীন ও কর্মবিমুখ। তার জন্য ভৃত্যেরও প্রয়োজন হয় এত বেশি। কাজ করার ক্ষমতা তাদের কম, এবং সবরকমের কাজ সকলে করতে চায় না। যে রাঁধবে সে থালাবাসন ধোবে না, যে বেয়ারার কাজ করবে সে মোট বইবে না, যে ঘরের কাজ করবে সে বাইরে কিছু করবে না, এইরকম অনেক ওজর-আপত্তি আছে তাদের। এর সঙ্গে জাতধর্মের ব্যাপারও জড়িত আছে। বিভিন্ন কাজের মর্যাদার তারতম্য আছে এবং জাতিভেদ অনুযায়ী কর্মভেদও আছে। মহা হাঙ্গামার ব্যাপার, এদেশের মতন ইংলণ্ডের ভৃত্যদের নিয়ে এত ঝামেলা পোহাতে

হয় না। দৈনন্দিন জীবন এই ভৃত্যদের উপদ্রবে অসহ্য হয়ে ওঠে।

তার উপর 'মশা' বলে একটি জীব আছে এদেশে। অগুন্তি তাদের সংখ্যা, গুন গুন শব্দ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। তাদের অতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র দেহে একটি করে হুল থাকে, মানুষের দেহে সেটি সূচের মতন বিঁধিয়ে দিয়ে রক্তপান করে। অন্তত একবার যে না এই মশার কামড় খেয়েছে তাকে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, তার জ্বালা কি! কামড় দিলেই সেখানে চুলকোতে হবে, চুলকোলেই সেখানে ফুলে উঠবে, ফুললেই সেটা বিষোবে এবং সেই বিষ ঝাড়তে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তার চেয়ে গরম ঢের ভাল, কিন্তু মশা একেবারে অসহ্য।

চ ড় ক পূ জা ॥ একদিন ঠিক করলাম (চৈত্রসংক্রান্তির দিন) কালীঘাটে মন্দির ও জাগ্রত কালী দর্শন করতে যেতে হবে। চৌরঙ্গি থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দক্ষিণে কালীঘাটের কালী-মন্দির। ঘোড়াগাড়ি করে কালীঘাট যাত্রা করলাম সন্ধ্যাবেলা। পথে এক দৃশ্য দেখলাম, উৎসবের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। দেখলাম হাজার হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসের ভিড়'? শুনলাম, চড়ক পূজার উৎসব হচ্ছে। দীর্ঘ একটি কাষ্ঠদণ্ডের মাথায় হুকবিদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খাওয়া চড়কপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কতরকমের লোক যে কত বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে তার ঠিক নেই। তার মধ্যে সর্বপ্রথম স্বচক্ষে দেখলাম এদেশের বৈরাগী সাধুদের। সর্বাঙ্গে তাদের ভস্ম মাখা, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, পরনে একটুকরো কাপড় জড়ানো, প্রায়-নগ্ন বলা চলে। একজন বৈরাগী তার শীর্ণ হাত দুটি মাথার উপর তুলে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অসাড় হয়ে গেছে হাত ও দেহ,

পাখির মতন আঙুলের ধারালো লম্বা লম্বা নখগুলি হাতের পিছন থেকে বিঁধে ফুঁড়ে বেরিয়েছে ভিতরের তেলো দিয়ে। ভগবান বিষ্ণুর কাছে মানতের জন্য সে এই ভয়ংকর ক্লেশ স্বীকার করছে। নখগুলি প্রথমে বিদ্ধ হবার যন্ত্রণা হয় নিশ্চয়, কিন্তু পরে হাত অসাড় হয়ে গেলে আর কোন যন্ত্রণা থাকে না। এই শ্রেণীর আত্মপীড়ন-দক্ষ সাধুকে সকলে খুব পুণ্যবান মনে করে, কারণ ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র না হলে এরকম কষ্টস্বীকার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেখলাম সকলে ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে তার সাধুত্বের তারিফ করছে খুব।

আরও কয়েকজন সাধু মাথার উপরে একহাত তুলে চক্ষু উলটে বসেছিল। একদল নীচজাতের হিন্দু বাহুর মাংসপেশী এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে বাঁশের লাঠি ও লৌহশলাকা পুরে ঢোলের বাজনার তালে তালে বীভৎস ভঙ্গিতে তাণ্ডবনৃত্য করছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লৌহশলাকা দিয়ে জিব ফুঁড়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছিল জনতার কাছে। কয়েকগজ দূরে তিনটি বড় বড় কাঠের খুঁটি মাটিতে পোঁতা ছিল। প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা এক-একটা খুঁটি, তার মাথায় আড়ে একটি বা দুটি করে বাঁশ বাঁধা। যে খুঁটির মাথায় একটি বাঁশ বাঁধা তার একদিকে একটি লোক ঝুলে রয়েছে, আর একদিকের লম্বা দড়ি ধরে নিচের লোকজন খুঁটির চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং উপরে ঝুলন্ত লোকটিও তার ফলে ঘুরছে বন্ বন্ করে। যে-খুঁটির মাথায় দু'টি বাঁশ ক্রস করে বাঁধা আছে তাতে আরও বেশি লোক ঘুরছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, উপরের লোকগুলি হুকবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে ও ঘুরছে, এবং তাদের বুকে ও পিঠে সেই হুকগুলি বিঁধে রয়েছে। উপরের লোকটি খুঁটির মাথায়, বাঁশের ডগায় ঘুরছে তো ঘুরছেই, আর নিচের লোকজন উন্মত্তের মতন তাদের পাক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ঘোরার

শেষ নেই, পাকেরও শেষ নেই। উপরে ঘুরছে যারা তারা বোধ হয় বেশি পুণ্যবান, কারণ একটি থলি ভর্তি করে ফুল-বাতাসা নিয়ে উপর থেকে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিচের লোকজন মহা উল্লাসে সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছে দেবতার প্রসাদের মতন। কেউ কেউ বুকেপিঠে কাপড় না জড়িয়েই হুকবিদ্ধ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রচুর পরিমাণে নেশা করে, গাঁজা-আফিম খেয়ে তাদের চোখমুখের চেহারা পিশাচের মতন ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

নীচজাতের হিন্দুরা শুনেছি চড়কপূজার অত্যন্ত ভক্ত। পূজা-উৎসবে যোগদানকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এরকম একটা পৈশাচিক ভয়াবহ উৎসব আর কোথাও দেখি নি। এই ধরনের উৎসবে দুর্ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। চড়কপূজায় শতকরা তিন-চারজন লোক মারাও যায়। ধনীলোকেরা টাকা-পয়সা দিয়ে গাজনের সন্ন্যাসীদের চড়ককাঠে চর্‌কিপাক খাওয়ান পুণ্যার্জনের জন্য। এইভাবে প্রকৃসি দিয়েও নাকি পুণ্যলাভ করা যায়।

উৎসবে ছ্যাকরা গাড়ি ভর্তি হয়ে বাইজীরাও এসেছিল অনেক। যেমন তাদের পোশাক, তেমনি নাচ-গানের ভঙ্গি। যাঁর রুচি আছে তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। কিন্তু এই বাইজীনাচ দেখার জন্য বহু হিন্দু ভদ্রলোকের ভিড় হয়েছিল উৎসবে।

রামমোহনের বাড়ির ভোজসভা॥ একদিন এক ধনিক সম্ভ্রান্ত বাঙালীবাবুর বাড়ি ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। বাবুর নাম রামমোহন রায়। বেশ বড় চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বাড়ি, ভোজের দিন নানাবর্ণের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজির খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তাঁর বাড়ি।

বাড়িতে বড় বড় ঘর ছিল এবং একাধিক ঘরে বাইজী ও নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। বাইজীদের পরনে ছিল ঘাঘরা, শাদা ও রঙিন মসলিনের ফ্রিল দেওয়া, তার উপর সোনারূপোর জরির কাজ করা। সাটিনের ঢিলে পায়জামা দিয়ে পা পর্যন্ত ঢাকা। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, পোশাকে ও আলোয় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়েতে অলংকারও ছিল নানারকমের। তারা নাচছিল দলবেঁধে বৃত্তাকারে, পায়ের নূপুরের ঝুম-ঝুম শব্দের তালে তালে। নাচের সময় মুখের, গ্রীবার ও চোখের ভাবপ্রকাশের তির্যক ভঙ্গিমা এত মাদকতাপূর্ণ মনে হচ্ছিল যে তা বর্ণনা করতে পারব না। নর্তকীদের সঙ্গে একদল বাজিয়ে ছিল, সারেঙ্গী মৃদঙ্গ তবলা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল তারা।

গানের সুর ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমরা শুনিনি কখনও। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, সুর কণ্ঠ থেকে নির্গত না হয়ে নাসিকার গহ্বর থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে। কোন কোন সুর এত সূক্ষ্ম ও মিহি যে কণ্ঠের কেরামতির কথা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাইজীদের মধ্যে একজনের নাম নিকী, শুনেছি সারা প্রাচ্যের বাইজীদের মহারানী সে, এবং তার নাচগান শুনতে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা।

বাইজীদের নাচগান শোনার পর রাতের খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। তারপর এদেশের ভেলকিবাজ জাগলারদের অদ্ভুত সব ক্রীড়াকৌশল আরম্ভ হল। কেউ তলোয়ার লুফতে লুফতে হাঁ করে সেই ধারালো অস্ত্রটা গিলে ফেললে, কেউ বা অনর্গল ধারায় আগুন ও ধোঁয়া বার করতে লাগল নাকমুখ দিয়ে। একজন শুধু ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পিছন দিক দিয়ে বাঁ-পা তুলে ধরল কাঁধের উপর। এই ধরনের কৌশল দেখে নকল করার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র

সাজানো, এবং সবই ইয়োরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালীবাবু (রামমোহন রায়)।

ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় ছেলেমেয়েদের মুখচোখ কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখায়, স্বদেশের রক্তিম আভা কোথায় যে মিলিয়ে যায় তার ঠিক নেই। এদেশের আবহাওয়ার গুণে এরকম রঙ পর্যন্ত বদলে যায়।

ভারতবর্ষের ফলমূল দেখতে খুব সুন্দর এবং বড় বড়; কেবল গন্ধের দিক থেকে মনে হয় ইংলণ্ডের মতন সুগন্ধি নয়। এদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ফল হল আম, সকলেই খুব প্রশংসা করে, আমার ভাল লাগে না। কলকাতায় যত রকমের আম খেয়েছি তার মধ্যে কেমন যেন একটা তারপিনের গন্ধ আছে বলে মনে হয়েছে। সুরা সবরকমের পাওয়া যায় কিন্তু সব সময় নয়। পোর্ট ও শেরি গ্রীষ্মকালে বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। মদিরার যে খুব প্রচলন আছে তা নয়। বার্গাণ্ডি, ক্ল্যারেট ও অন্যান্য হালকা ফরাসী সুরা রুচিবানেরা বেশি পছন্দ করেন।

কলকাতার নতুন কেল্লাটি খুব প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আবহাওয়ার জন্য সৈন্যদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। কেবল ধপাধপ অসুখে পড়ে আর মরে।

একদিন কেল্লায় গিয়ে দেখি প্রায় তিনশো সৈন্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে রয়েছে। সৈন্যদের মধ্যে মৃত্যুর হারও খুব বেশি। এর কারণ আমার মনে হয় সস্তায় অত্যধিক মদ্যপান এবং কড়া রোদ লাগানো। এখানকার স্যাঁতসেতে হাওয়ার সঙ্গে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ মিশলে ঘরেও বাস করা যায় না, বাইরেও বেরুনো যায় না, দম বন্ধ হয়ে আসে। এইজন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখানে রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ। স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করতে হলে এইখানে যা প্রয়োজন হয় তা প্রায় বিলাসিতার সামিল,

ইংলণ্ডে তার দরকার হয় না। কলকাতার একজন সাধারণ ইয়োরোপীয় দোকানদারের একটি বগি-গাড়ি আছে। এই গাড়ি করে সন্ধ্যার পরে বেড়াতে না বেরুলে তার দেহ-মন শীতল হয় না।

আজ জুন মাসের পয়লা তারিখ। সকালবেলা খুব গরম ছিল, এখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি নামছে। মনে হচ্ছে যেন সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মেঘের গুরু গুরু গর্জন শোনা যাচ্ছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চোখ ঝলসে যাচ্ছে আলোয়। আমি ইয়োরোপে কখনও বজ্রের এরকম কর্ণভেদী নিনাদ শুনি নি। এদেশের বাসিন্দাদের এসম্বন্ধে কোন হুঁশ আছে বলে মনে হয় না। বিদ্যুতের জন্য ভাল ভাল বাড়িতে কণ্ডাক্টর আছে। ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের পর বাতাস খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আরাম লাগে।

আমার এক বন্ধু সপরিবারে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাচ্ছেন। তাঁর জন্য যে বিরাট নৌবহর তিনি তলব করেছেন সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি :

একটি চমৎকার ষোল-দাঁড়ের পানসি, তার মধ্যে দু'টি সুন্দর কেবিন, ভেনিসিয়ার কাঁচের জানলা দিয়ে ঘেরা, ভিতরে টানাপাখা এবং ঝর্নাস্নানের জন্য উপরে ঝাঁঝরি লাগানো বাথরুম দু'টি। এই পানসিতে আমার বন্ধু, তাঁর স্ত্রী ও শিশুসন্তান যাবেন।

সঙ্গে বাবুর্চিদের ডিঙ্গি, তাতে নানারকমের খাদ্যদ্রব্য ভর্তি।

একটি বিরাট নৌকায় বিছানা, বাসনকোসন ও আসবাবপত্তর ঠাসা।

ধোপার জন্য আলাদা একটি নৌকা, তাতে ধোপার বৌ এবং সাহেবের কুকুরও যাত্রী।

একটি বৃহৎ নৌকা ভাল ভাল ঘোড়ার জন্য সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। সাহেব মধ্যে মধ্যে তীরে নেমে ঘোড়ায় চড়বেন।

এছাড়া আরও একটি বড় নৌকা সঙ্গে যাবে যদি কোন দরকারে লাগে তাই।

এ তো গেল নৌকার হিসেব, এবারে তার খরচের হিসেব দিচ্ছি। পানসির ভাড়া দৈনিক কুড়ি টাকা, অন্যান্য নৌকার ভাড়ার হারও আনুপাতিক। নদীপথে লক্ষ্ণৌ যেতে তিন-চার মাস লাগে। কেবল নৌকাভাড়া হিসেব করলেই বোঝা যায় খরচের বহর কত।

এদেশের গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত তিনটি প্রধান ঋতুর সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে গেছে। এখন বর্ষাকাল, বেশ গরম আছে, পাখা চলে। তবু মধ্যে মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

২৯ আগস্ট ১৮২৩॥ গবর্নর-জেনারেল ও লেডি আমহার্স্ট দু'জনেই কলকাতার লোকের কাছে খুব প্রিয়। লাটভবনে খানাপিনার সময় লেডি আমহার্স্টের আদর-আপ্যায়নে অতিথিরা প্রীত ও মুগ্ধ হন। নতুন লাটসাহেব নিজের ভোগবিলাসের ব্যাপারেও মিতব্যয়ী। তাঁর আমলে ভৃত্যের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং বাড়ির বাহারে বাতিও নিভে গেছে অনেক। তিনি ঠিক করেছেন ব্যারাকপুরের বাগানে সবজি চাষ করবেন এবং ভাল করে আলু ফলাবেন। ভারতীয়রা এই ধরনের হিসেবীপনায় অভ্যস্ত নয়, তাই ইয়োরোপীয় কাউকে এরকম হতে দেখলে তারা বেশ আশ্চর্যই হয়ে যায়।

অন্যান্য জায়গার মতন এদেশেও নগদ পয়সা দিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় ও বিলাসিতার সামগ্রী কিনতে হয়। অতএব পয়সার অভাব হলেই মহাজনদের কাছ থেকে ধার করতে হয় (এই মহাজনদের ফ্যানি 'richest dogs' বলেছেন)। এখন শতকরা

আট টাকা করে সুদ, আগে ছিল দশ টাকা করে। ঋণের পরিমাণ কিছুদূর বাড়লে তারা বাধ্য করে ইনসিওর করতে এবং তার হারও অত্যন্ত বেশি। কত লোকের জীবন যে এদেশে এই ঋণের বোঝা বহন করতে না পেরে নষ্ট হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। আমি ইংরেজদের কথা বলছি। ঋণের দায়ে এমনভাবে অনেকে জড়িয়ে পড়েন যে শেষে ভারতবর্ষ ছেড়ে আর স্বদেশে ফিরতে পারেন না। সুদের হার এত বেশি যে তার চাপে ঋণের বোঝা শীঘ্রই দ্বিগুণ হয়ে যায়, এবং তা পরিশোধ করতে না পারলে তিনগুণ বা চারগুণ হতেও দেরী হয় না। মনে করো না আমি রঙচঙ দিয়ে ছবি আঁকছি। এর মধ্যে রঙ চড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করি নি। যা বললাম তার প্রত্যেকটি সত্য কথা। এখানে না থাকলে তা বুঝতে পারা সম্ভব নয়। এদেশে যাঁরা নতুন আসেন তাঁদের বুঝতে বেশ সময় লাগে যে টাকা ধার করলে সুদ আর আসলের হিসেবে এক আর এক মিলে দুই হয় না, এগার হয়।

১ অক্টোবর ১৮২৩॥ আমাদের বাড়িতে টিপু সুলতানের পুত্র শাহাজাদা জামান জামউদ্দিন মহম্মদ বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের বাসার কাছে একটি বাড়িতে তিনি থাকেন, আগে কথা দিয়েছিলেন যে একদিন বেড়াতে আসবেন। পরদিন সকালেই তিনি আসেন এবং প্রায় ঘণ্টা দুই বসে গল্পগুজব করেন। গত বছরখানেক ধরে তিনি ইংরেজি শিখছেন। খাঁচায় একটি ছোট্ট পাখি দেখে তিনি বললেন, “সুন্দর হলদে পাখিটা, নাম কি পাখির?” আমি উত্তর দিলাম, “ক্যানারি পাখি।” “ক্যানারি পাখি? বেশ চমৎকার পাখি তো? এদেশে হয় না বুঝি?” এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তিনি বলতে লাগলেন, আমিও তার জবাব দিলাম। অনেকক্ষণ সময়

কেটে গেল। ভাবলাম তিনি বোধ হয় আর উঠবেন না। জানতাম না যে এদেশীয় প্রথা অনুযায়ী কারও বাড়িতে আসাটা অতিথির ইচ্ছা মতন, কিন্তু যাওয়াটা গৃহস্বামীর খুশি ও অনুমতির উপর নির্ভর করে। তিনি আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বিদায় নিতে পারছিলেন না। পরে বিদায় নিয়ে বললেন, "এখন যাই তাহলে, আবার একদিন আসব।" পরদিন তিনটি পাত্র ভরে তিনি আমাকে নানারকমের মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন। কেন পাঠালেন বুঝতে পারি নি। পরে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম, এদেশের প্রথা হল কারও বাড়িতে বেড়াতে এলে পরে তাকে মিষ্টি উপহার দিতে হয়, এবং তা প্রত্যাখ্যান করলে অতিথিকে নাকি অপমান করা হয়।

অক্টোবর ১৮২৩॥ সেদিন দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলাম একজন ধনিক বাঙালীবাবুর বাড়ি। 'দুর্গা' নামে হিন্দুদের যে দেবী আছেন তাঁরই 'অনারে' এই উৎসব হয়। বাবুর চারমহলা বাড়ি, মধ্যিখানে বিরাট উঠোন। সেই উঠোনের একপাশে উঁচু মঞ্চের উপর দেবী দুর্গার সিংহাসন পাতা। সিংহাসনের উপর দুর্গার মাটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চের দু'ধারের সিঁড়িতে ব্রাহ্মণেরা উপবিষ্ট, পূজার অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। প্রতিমার হাত দশটি, যার জন্য দুর্গা দশভুজা বলে পরিচিত। একটি ডানহাত দিয়ে তিনি এক ভীষণাকৃতি অসুরকে বর্শাবিদ্ধ করেছেন, বামহাতে একটি বিষাক্ত সাপের লেজসহ অসুরের ঝুঁটি ধরেছেন, সাপটি অসুরের বক্ষস্থল দংশন করছে। বাকি আটটি হাত ডাইনে-বামে প্রসারিত, প্রত্যেক হাতে একটি করে মারণাস্ত্র। তাঁর দক্ষিণ হাঁটুর কাছে একটি সিংহ এবং বাম হাঁটুর কাছে অসুর। সিংহ দেবীকে বহন করছে মনে হয়।

পূজামণ্ডপের পাশের একটি বড় ঘরে নানারকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইয়োরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক 'মেসার্স গাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসী মদ্যও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজীদের নাচগান হচ্ছিল, এবং ইয়োরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকরা সোফায় হেলান দিয়ে, চেয়ারে বসে সুরা-সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহু সাধারণ লোকের ভিড় হয়েছিল বাইজীদের গান শোনার জন্য। গানের হিন্দুস্থানী সুর মণ্ডপে সমাগত লোকজনদের মাতিয়ে তুলেছিল আনন্দে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চলতে থাকে। পাঁচদিন পরে ষষ্ঠীর দিন দেবী জেগে ওঠেন, এবং সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর দিনে মহাসমারোহে তাঁর পূজা হয়। নবমীর দিন বলিদান দেওয়া হয় এবং এক কোপে মুণ্ডচ্ছেদ করতে না পারলে বলি নাকি সার্থক হয় না। পরদিন দশমীতে দেবীর প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়ে উৎসব শেষ হয়ে যায়। আরও পাঁচদিন পরে পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা হয়। সেদিন রাতে নাকি হিন্দুরা ঘুমায় না। কারণ পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মী সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। বাড়ি অন্ধকার ও লোকজন নিদ্রিত দেখলে তিনি ফিরে যান। লক্ষ্মী হলেন ধনৈশ্বর্যের দেবী, গৃহে পদার্পণ করলেই গৃহীর ধনলাভ হয়। সুতরাং লক্ষ্মী যাতে ফিরে না যান তার জন্য হিন্দুরা আলোকিত ঘরে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেন।

দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে, বাড়ির সরকার মশায়রা ছুটি নিয়ে দেশঘরে চলে যান। আর ধনিক বাঙালীবাবুরা পূজার সময় যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন তার হিসেব নেই।

চুরি ও চালপড়ার কথা॥ কলকাতায় আসার পর আমাদের বাড়িতে যে কতবার চুরি হয়েছে তার ঠিক নেই। ভৃত্য ও বেয়ারাদের বদল করেও চুরি বন্ধ করা যায় না। একদিন এক আশ্চর্য চুরি হল বাড়িতে। কয়েকজন বন্ধুকে সেদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম খাবার জন্য। আমার স্বামী বৈঠকখানার টেবিলে তাঁর হাতঘড়িটা রেখে খেতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন ঘড়ি উধাও, অর্থাৎ চুরি হয়ে গেছে। চোরকে চিনতে আমাদের দেরী হল না, তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হল। মুন্‌শী এলেন, খোঁজখবর করে সাতদিন সময় দিলেন, এবং বললেন যে এর মধ্যে চোরাই ঘড়ি যদি ফেরত না পাওয়া যায় তাহলে বাড়ির সকলকে তিনি চালপড়া খাইয়ে চোর ধরবেন। সাধারণত দেখা যায় যে চালপড়ার ভয় দেখালেই কাজ হয়, চোরাই মাল যথাস্থানে ফিরে আসে। নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ-মুন্‌শী বাড়ি এলেন এবং ভৃত্যদের তাঁর সামনে ডেকে পাঠালেন। ভৃত্যেরা আগে থেকেই তাঁর আদেশ মতন উপোস করেছিল। মুন্‌শীর সামনে তারা সারবেঁধে বসল। তারপর চালপড়ার প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন পুলিশ-মুন্‌শী।

কলকাতা শহরে তখন হরেকরকমের টাকা চল্‌তি ছিল। তার মধ্যে 'আকবরবাদী' টাকার উপর এদেশের লোকের আস্থা ছিল গভীর। চালপড়ার জন্য মুন্‌শী প্রায় দশসের চাল ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর একটি ছোট নিক্তিতে একদিকে আকবরবাদী টাকা দিয়ে তিনি চাল ওজন করে ভাগে-ভাগে রাখতে লাগলেন। ওজন করা শেষ হয়ে গেলে এক-একজন করে ভৃত্যদের ডেকে হাতের মুঠোয় একভাগ করে চাল দিয়ে শপথ করতে বললেন এই বলে: "আমি চুরি করি নি, কে চুরি করেছে জানি না, চোরাই জিনিস সম্বন্ধেও খোঁজ রাখি না।" প্রায় পঁইত্রিশজন ভৃত্য ছিল। সকলকে চাল খাওয়ানো ও শপথ

করানো হয়ে গেলে মুন্‌শী তাদের ডেকে বললেন : "তোমাদের মধ্যে কেউ মিথ্যা শপথ করেছ। যে মিথ্যা বলেছ ভগবান তাদের শাস্তি দেবেন। এই চাল মুখের ভিতর দিয়ে চিবিয়ে তোমরা সামনের কলাপাতায় ফেলবে। যে মিথ্যা বলেছ, বা চুরি করেছ, বা চুরি সম্বন্ধে কিছু জান, তার মুখের চাল ভিজবে না, শুকনো থাকবে।"

প্রত্যেকে চাল চিবিয়ে কলাপাতায় ফেলল। তার মধ্যে বত্রিশজনের মুখের চাল দেখা গেল বেশ ভিজে ও লালাসিক্ত, আর বাকি তিনজনের একেবারে শুকনো খটখটে। চেবানোর ফলে চাল গুঁড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু একটুও ভেজে নি। মুন্‌শী তাদের দেখিয়ে বললেন, এরাই অপরাধী, ঘড়ি এরাই চুরি করেছে। বিনাদ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতকড়া দিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। বাস্তবিকই যে তিনজনের মুখের চাল শুকনো ছিল তারা আগেকার দাগী চোর। ঘড়ি পাই আর না পাই, কিছুদিনের জন্য চোরের হাত থেকে রেহাই পাব জেনে নিশ্চিত হলাম। চালপড়া অপরাধী ধরার একটা অভিনব পদ্ধতি বটে, কিন্তু এর মধ্যে অনুমান ছাড়াও বিজ্ঞান কিছুটা আছে। আসলে অপরাধী যে সে ভয় পাবেই এবং ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যাবেই। সে যাই হোক, আমি অন্তত এদেশের চালপড়ার পক্ষপাতী, কারণ হাতেনাতে তার ভালই ফল পেয়েছি।

২

১৮২৪-২৮ সন

জানুয়ারী ১৮২৪। কলকাতা শহরে বাস করার কতকগুলো সুবিধা আছে। কাছাকাছি গবর্নমেণ্টের নজরে থাকা যায় এবং তাতে চাকরিবাকরি পাওয়ার সুবিধা হয়। ইংলণ্ডের সংবাদও সবার আগে পাওয়া যায় কলকাতায়। অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসার সুবিধাও আছে এখানে। কিন্তু শহুরে জীবনের অসুবিধা যেগুলি তারও অভাব নেই। প্রচণ্ড বাড়িভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয়ের খরচও অত্যধিক, আর টাকা দু'হাতে ছড়ানোর প্রলোভন যে কত তার ঠিক নেই।

আমাদের এক বন্ধু, বেশ উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান, বছর আঠার আগে (১৮০৫-৬ সনে) কলকাতায় এসে হাজার পনের টাকা ধার করেছিলেন। তখন সুদের হার ছিল শতকরা বারো টাকা। জামিনের জন্য পরে তাঁকে লাইফ-ইনসিওরও করতে হয়। তার জন্য দালালি শতকরা একটাকা করে ধরে মোট সুদের হার হয় শতকরা ষোলো টাকা। আসল টাকার প্রায় পাঁচগুণ পরিশোধ করার পর তিনি আশা করেছিলেন যে মহাজন এবারে হয়তো তাঁর সুদবৃদ্ধির হার কিছু কমাবেন। কিন্তু মহাজনটি তাঁকে বলেন, "আসল টাকা ঘুমিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সুদের চোখে ঘুম নেই, দিনরাত সে জেগে বসে আছে।" কাজেই বন্ধুটি এখন দেনা মিটিয়ে ফেলার জন্য সর্বস্ব পণ করে সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছেন।

আমরা এদেশে এসে বিলাসিতা করি বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন, একটু সুখে-স্বচ্ছন্দে আরামে থাকতে হলে একটা ভাল বাড়ি, ভাল আসবাবপত্তর, ভাল গাড়িঘোড়া, বন্ধুদের জন্য ভাল সুরা, ভাল ও সংখ্যায় বেশ কয়েকজন ভৃত্য, ভাল ক্রেডিট এবং একটা ভাল চাকরি যে কত দরকার তাহলে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে অভিযোগ করতেন না।

লাটসাহেবের একটি বাগানবাড়ি আছে ব্যারাকপুরে, সেখানে ঘোড়দৌড়ের সময় কলকাতার লোকদের ভিড় হয়। এক সপ্তাহের জন্য আমরা ব্যারাকপুরে গিয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। লেডি আমহার্স্ট অনেক খরচ করে লাটভবনে বাজি পোড়ানোর উৎসব করেছিলেন। ব্যারাকপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে বর্ধমানরাজের জমিদারীর অধীন একটি জায়গায় পুরনো দুর্গ দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তা খুব খারাপ বলে আমি বগি গাড়িতে না চড়ে হাতির পিঠে চড়ে গিয়েছিলাম। এর আগে কখনও হাতির পিঠে চড়িনি। হাতিটা হাটু গেড়ে বসল, তার গায়ে মৈ লাগিয়ে পিঠের উপর উঠে বসলাম। তারপর সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন্থর গতিতে চলতে লাগল। মনে হল যেন একটা গোটা বাড়ি চারপায়ে ভর দিয়ে চলেছে।

মাঠ, খানাডোবা ও ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে হাতি তার বিরাট পদস্তম্ভ দিয়ে সব দলে পিষে চলছিল। ক্ষেতের মধ্যে সরু আল দিয়ে সব জমি ঘেরা। এই সরু আলের উপর দিয়ে মাহুত হাতিটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, যাতে ক্ষেতের ফসলের না ক্ষতি হয়। হাতিরও চলা দেখে মনে হচ্ছিল এ সম্বন্ধে সেও কম হুঁশিয়ার নয়। যেতে যেতে রাস্তার ধারে একজন ফকিরকে দেখলাম। বেশভূষা দেখলেই ফকিরকে চেনা যায়, কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না। পথের ধারে একটা মাটির গর্তের

মধ্যে তার বাসা, ছেঁড়া মাদুর ও কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা। ফকিরের অস্থিচর্মসার চেহারা দেখলে বোঝা যায় প্রায় অনাহারেই তাকে দিন কাটাতে হয়। এই গর্তটির মধ্যে পাঁচ বছর ধরে সে রয়েছে, হাজার অনুরোধ করলেও গ্রামের মধ্যে থাকতে চায় না। মাথার কাছে সারা রাত কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারলে সে আর কিছু চায় না। ফকিরটি উত্তরপ্রদেশের লোক, সেখানে তার বিষয়সম্পত্তি থেকে কোন কারণে বঞ্চিত হয়ে সে কলকাতায় আসে প্রতিকারের আশায়। কিন্তু তার কোন আশা নেই দেখে শেষে ফকিরের বেশ ধরে এভাবে জীবন কাটাতে আরম্ভ করে।

ব্যারাকপুরের লাটভবনে একটি ছোট পশুশালা আছে, তাতে ভাল ভাল কয়েকটি বাঘ, চিতা ও হায়নাও রাখা হয়েছে। আমার আয়া একদিন বায়না ধরে বসল যে আমার সঙ্গে পশুশালায় সে বেড়াতে যাবে, কারণ তার হায়না দেখার খুব ইচ্ছে। সঙ্গে করে তাকে হায়না দেখাতে নিয়ে গেলাম। হায়নার দিকে তাকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিশেষ করে হায়না সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?" প্রথমটা হেসে, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে সে বলল, "আমি ও আমার স্বামী আমাদের কোলের সন্তানটিকে নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় একটি হায়না এসে চুপিসাড়ে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। গ্রামের লোক তার পিছনে ছুটে শিশুটিকে উদ্ধার করে বটে, কিন্তু মৃত ও টুকরো-টুকরো অবস্থায়। তাই আমার হায়না দেখার এত আগ্রহ।"

ভারতবর্ষের সঙ্গে স্টীমবোটে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা এবারে কিছুটা সফল হবে বলে মনে হয়। কিছুদিন ধরে এ বিষয়ে কথাবার্তা চলছে, এবারে একটা কিছু না হয়ে আর যায় না। প্রথম যিনি স্টীমবোট চালানোর জন্য একটি কোম্পানি করবেন

তিনি বেশ মোটা মুনাফা করতে পারবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এবারে কেউ না কেউ সাহস করে এ পথে পা বাড়াবেন আশা করা যায়।

অন্যান্য শহরের মতন কলকাতাতেও ভাল বাড়ি পাওয়া শক্ত। আমাদের প্রথম বাড়িটায় গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া ঢুকত বেশি; দ্বিতীয় বাড়িটা ছিল নিচু ও স্যাঁতসেঁতে, অসুখবিসুখ বেশি হত। আমার স্বামী কলেজ ছাড়ার পর কলকাতায় চাকরি পেয়েছেন, আমরা চৌরঙ্গী রোডের একটি নতুন বাসায় চলে এসেছি।

ভাল নাচ দেখতে চেয়েছিলাম বলে মহীশূরের রাজকুমার আমাকে একটি নাচের আসরে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু নাচ আমার তেমন ভাল লাগে নি, তার চেয়ে গানগুলি বরং বেশ মধুর লেগেছিল। কলকাতার দিনগুলিও এখন আনন্দের ও স্ফূর্তির দিন। লাটভবনে বড় বড় 'পার্টি' তো লেগেই আছে, শহরের ধনী ব্যক্তিরাও ডিনার ও ফ্যান্সি-বলনাচে বিভোর হয়ে আছেন।

কলকাতায় যে গরুর দুধ পাওয়া যায় তা খেতে মোটেই ভাল নয়, সাধারণত ছাগলের দুধই আমরা খেয়ে থাকি। বাংলাদেশের ছাগলগুলো দেখতে বেঁটে ও ছোটখাট হলেও হৃষ্টপুষ্ট, দুধও ভাল দেয়। চাকরে সকালবেলা দুধ দুয়ে ফেনাসমেত পাত্রে করে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে এনে দেয়।

আমার স্বামী কলকাতার লটারিতে কয়েকটি টিকিট কিনে জিতেছেন, তেরটি পুরো টিকিট, একটি অর্ধেক, প্রত্যেক টিকিটে একশো টাকা। সব টাকাটাই তিনি তাঁর এজেণ্টদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, কেবল একটি টিকিটের টাকা উপহার দিয়েছেন আমাকে। আমার টিকিটের প্রাইজ পাঁচহাজার টাকা। পরদিন আমরা একটি ভাল আরবী ঘোড়া এবং একজোড়া পার্সী ঘোড়া কিনেছি।

১৭ জুন ১৮২৪॥ আমাদের এক তরুণ বন্ধু রাইটার্স বিল্ডিঙে থাকেন, অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। দু'দিন পরে আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ি। তের দিন পরে সুস্থ হই। আমাকে সেবা করে আমার স্বামীও অসুস্থ হয়ে পড়েন, এগারজন ভৃত্যও তাঁর সঙ্গে শয্যাশায়ী হয়। কলকাতায় এই অসুখটা মহামারীর মতন দেখা দেয়, সাহেব ও বাঙালী মিলিয়ে শ'দুই লোক রেহাই পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হল, বয়স্কদের মধ্যে কেউ এই অসুখে মারা যায় নি। অসুখটা আমারও হয়েছিল, কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টা পরে ছেড়ে যায়, আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। আমার স্বামীরও ঠিক সেই অবস্থা হয়। গুটিতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়। চিতাবাঘের গায়ের ছোপের মতন অনেকের মুখে দাগ হয়ে যায়।

অসুখটা এমন ভয়াবহরূপে দেখা দেয় যে কোর্ট কাছারি, কাস্টম হাউস, লটারি আফিস প্রভৃতি কলকাতার সব বড় বড় সরকারী বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। তিনদিনে আমাকে তিনজন ডাক্তার দেখেন, পরে তিনজনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সপ্তাহ তিনেক পরে অসুখ অনেক কমে যায় এবং লোকজন স্বাভাবিক-ভাবে কাজকর্ম শুরু করে।

ইংলণ্ড থেকে নতুন কেউ এদেশে এলে তাঁর টেবিলের জন্য যে সংখ্যক ভৃত্য দরকার হয় তা অবিশ্বাস্য। গতকাল আমরা আটজন মিলে একটি ডিনার খেয়েছিলাম, তার জন্য তেইশজন ভৃত্য প্রয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেক ভদ্রলোক একজন থেকে দু'জন পর্যন্ত ভৃত্য সঙ্গে নেন, এবং প্রত্যেক মহিলা যত জন খুশি দাসী-পরিবৃতা হয়ে আসেন। কলকাতা শহরে এই সময় সাহেব সমাজে হুঁকোয় তামাক খাওয়ার ফ্যাশান খুব চালু হয়েছিল। ভোজন শেষ হবার আগেই হুঁকোবরদাররা তামাক সেজে নল

হাতে করে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। তামাকের গন্ধটি খুব মনোরম, পাশে বসে না খেয়েও বেশ উপভোগ করা যায়। মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলের সাহেবদের হুঁকোবরদাররা কি এক রকমের তামাক সেজে দেয় জানি না, অত্যন্ত উৎকট গন্ধ, পাশে থাকলে সহ্য করা যায় না।

কলকাতায় যে অসুখের কথা বলেছিলাম এখন আর তা নেই। সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে দেখি সকলেরই কপালে মুখে কালো কালো পোড়া দাগের চিহ্ন, নিজের পর্যন্ত। কি কারণে এই অসুখের উৎপত্তি হল তা নিয়ে চিকিৎসকদের ও সাধারণ লোকের জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। অসুখের নাম কি তাও ঠিক হয় নি। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন অনাবৃষ্টির জন্য, কেউ বলেন বজ্র-বিদ্যুতের অভাবের জন্য এই ব্যাধি দেখা দিয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়েও এই ব্যাধির উপদ্রব ছিল বলে শোনা যায়, তবে কোন বয়স্ক রুগীর মৃত্যু হত না সহজে।

ক বি বা ই র নে র মৃত্যু॥ ১৮২৪ সনের অক্টোবর মাসে আমরা লর্ড বাইরনের মৃত্যুসংবাদ শুনে মর্মাহত হলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে দেখলাম, হুগলী নদীর তীরে একটি গ্রীক চ্যাপেলে বাইরনের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হচ্ছে। যাঁরা বাইরনের দুশ্চরিত্রতা নিয়ে গলাবাজি করেন তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাতে আমরা রাজী নই।

কলকাতায় শীত পড়ে গেছে, বিবাহেরও হুজুগ পড়েছে। তরুণরা (ইংরেজ) এখানে যেরকম ব্যস্ত হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে ফেলে তা অত্যন্ত হাস্যকর। পূর্বরাগ থেকে মিলন পর্যন্ত খুব বেশি হলে একমাস সময় লাগে। অনেকে আইনত সাবালক হবার আগেই, অর্থাৎ নিজেরাই শিশু থাকতে থাকতে নতুন এক শিশুর পিতা হয়ে

যায়। এদেশের আবহাওয়ায় বিবাহ করাটা জলপানের চেয়েও সহজ ব্যাপার। কেবল অবাক হয়ে ভাবি, এত সহজে যেখানে বিবাহ হয় সেখানে দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটে কি করে!

ডিসেম্বর (১৮২৪) মাস পড়েছে। ঘোড়দৌড়, থিয়েটার, ফ্যান্সিড্রেস-বল, ডিনার পার্টি, বোটানিকাল গার্ডেনে নৌকাযাত্রা ইত্যাদি বিচিত্র সব আমোদপ্রমোদ পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। শীতের আমেজে আমার আরবী ঘোড়াটারও তেজ বেড়েছে, তার পিঠে চড়ে বেশ আরামে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, মনে হয় যেন হংসবলাকার মতন উড়ছি শহরে। শহর এখন সরগরম, প্রাসাদ অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত, ভোজসভা, নাচসভা ও আতিথেয়তার বিলাসিতায় সকলে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, ক্রিসমাসের স্ফূর্তির হাওয়া বইছে।

ধনিক হিন্দুর বাড়ি নাচসভা॥ এপ্রিল মাস, ১৮২৬ সন। এদেশের জেনানামহল বা অন্তঃপুর সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। প্রায় চার বছর হল ভারতবর্ষে এসেছি, কিন্তু নীচজাতের দাসী ও নাচিয়ে বাইজী ছাড়া সাধারণ ভদ্র পরিবারের কোন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করা সম্ভব হয় নি। বাইজীর কথা বলতে একটি নাচ-সভার কথা মনে হচ্ছে। তার বিবরণ দিচ্ছি।

কিছুদিন আগে কলকাতা শহরে এক ধনিক হিন্দুর বাড়ি নাচসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রথম জাগলারদের খেলা দেখে বেশ আনন্দ পেলাম। তলোয়ারের খেলা তারা যা দেখালো খুব চমৎকার। খেলা শেষ হবার পর পরিবারের কর্তা-মশায় বললেন, অন্দরমহলে গিয়ে আমি তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক কি না। অবশ্যই ইচ্ছুক, এই সুযোগটাই এতদিন খুঁজছিলাম। সম্মতি জানাতে ভদ্রলোক

আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সামনে বিরাট এক পর্দা ঝুলছে। পর্দা পার হয়ে আরও ভিতরে গেলাম, বেশ ঘন অন্ধকার, কোন্‌দিকে কি বা কে আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতর থেকে দু'জন মহিলা (পরিচারিকা মনে হয়) এসে আমার হাত ধরলেন, এবং বিশাল সিঁড়ি পার হয়ে একটি সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল ঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন। সেই ঘরে গৃহস্বামীর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়ারা এসে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দু'জন মহিলা রীতিমত সুন্দরী দেখতে। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝলাম কেন অন্দরমহলে এই মহিলাদের স্বামীরা ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ। তাঁদের পরনে অতিসূক্ষ্ম বানারসী শাড়ি, সোনার জরির পাড় বসানো, দুই পেঁচ দিয়ে গায়ে জড়ানো, প্রান্তটি বা আঁচল পিঠে ফেলা। এই বস্ত্রের তলায় অন্য কোন অন্তর্বাস নেই। কাজেই গায়ে দুই পেঁচ জড়ানো থাকলেও তা এত সূক্ষ্ম যে অঙ্গের আভা পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয় তার ভিতর দিয়ে। মনে হয় যেন একটা রেশমী ওড়না গায়ের ওপর ফেলা রয়েছে। গলায় ও হাতে সোনা-হীরের অলঙ্কার। গায়ের রঙ্ অনেকের হাল্‌কা মেহগনির মতন, কারও কারও বেশ কালো। আলোকিত ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা বাইরের একটি চিক-টাঙানো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এই চিকগুলি বাঁশের সরু কাঠি থেকে তৈরি একরকমের পর্দা, চমৎকার দেখতে। বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে বেশ দেখা যায়। নিচের হলঘরের অতিথিদের উপর থেকে মহিলারা দেখতে পাচ্ছিলেন, নাচ দেখতেও তাঁদের কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। সর্ববিষয়ে তাঁদের কৌতূহল বেশ সজাগ, সভার প্রায় প্রত্যেকটি লোককে তাঁরা চেনেন দেখলাম। আমার স্বামীটিকে উপর থেকে

দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা অনুরোধ করলেন এবং আমার সন্তানাদিরও খুঁটিয়ে খোঁজ নিলেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের জেনানামহল দেখার শখ অনেকদিন পরে মিটল বটে, কিন্তু দেখে তেমন খুশি হতে পারলাম না।

আমার স্বামী এলাহাবাদে নতুন একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে বদলি হবেন ঠিক হলো। নদীপথে এলাহাবাদ ৮০০ মাইল এবং স্থলপথে ৫০০ মাইল বলে আমরা স্থির করলাম নৌকার করে ভারী মালপত্তর পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা গাড়িঘোড়া করে রওনা হব। ২২ নবেম্বর ১৮২৭, কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলাম। বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, শেরঘাটি, সসরাম, নহবতপুর, মোগলসরাই হয়ে বারাণসী পৌঁছলাম ২৫ ডিসেম্বর। অধিকাংশ পথই আমাদের আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছি, মধ্যে মধ্যে বগিতেও চলতে হয়েছে। ঘোড়া নিয়ে নদী পার হতে হয়েছে অনেক, আমরা নৌকায় পার হয়েছি, ঘোড়া সাঁতার দিয়েছে এমনও হয়েছে।

বারাণসীতে আমাদের এক সিবিলিয়ান বন্ধুর বাড়ি অতিথি হলাম। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে এলাহাবাদ পৌঁছতে হবে বলে আমার স্বামী বারাণসীতে আমাকে থাকতে বললেন এবং কলকাতার গাড়ি ও ঘোড়া বিদায় করে দিয়ে নতুন গাড়িঘোড়া নিয়ে বিশ্রামান্তে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। বারাণসী হল ভারতের হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থনগর, এর পথঘাট, ইটকাঠ, দেবদেউল, ঘাটমাঠ, এমন কি নাচিয়ে-বাজিয়ে পর্যন্ত সব কিছু অতি পবিত্র। এ হেন প্রাচীন পবিত্র শহর দেখার লোভ আমিও সম্বরণ করতে পারলাম না। আগে কলকাতা শহরে থেকেছি, তাতে বারাণসীর মতন শহর সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা হয় না। কলকাতায় নানা-জাতির লোকের বাস, প্রত্যেক জাতি ইচ্ছা করলে তাদের নিজস্ব

সামাজিকতার মধ্যে কালযাপন করতে পারে। বারাণসীতে তা সম্ভব নয়। ধর্ম, পুণ্য, ভক্তি, পরকাল-চিন্তা, পূজাপার্বণ ইত্যাদি নিয়েই বারাণসীর সামাজিক পরিবেশ রচিত হয়। সেদিন হিন্দুদের একটি মন্দিরে পূজা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের যন্ত্রটি দেহের মধ্যে ঈশ্বর বোধ হয় একটু বিশেষ কারিগরি করে তৈরি করেছেন।

ভোরে উঠে প্রাত্যহিক কাজকর্ম আরম্ভ করার আগে প্রত্যেকটি লোক দেবদেবীর পূজার্চনা করতে যায়। তাদের হাতে একটি ছোট পিতলের পাত্রে তেল থাকে, একটিতে থাকে ভাত, আর একটিতে গঙ্গাজল ও ফুল। মন্দিরে এসে দেবতার মাথায় তারা সেগুলি ঢেলে দেয়, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা করে, এবং যাবার সময় সামনে ঝোলানো একটি ছোট ঘণ্টা তিনবার বাজিয়ে চলে যায়। পুরুষ ও মেয়ে সকলেই তাই করেন। এইটাই নাকি এখানকার প্রথা।

মন্দিরের ভিতরে বিচিত্র সব মূর্তি আছে, তার মধ্যে কালো ও সাদা পাথরের তৈরি দুটি ষাঁড় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের বাইরে দুটি জ্যান্ত ষাঁড় প্রায় সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, শোনা যায় তারাও নাকি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি এবং দেবতার মতনই আরাধ্য। ফল-ফুল, ভোগ-নৈবেদ্য ভক্তরা তাদেরও দিয়ে থাকেন। পুণ্যবান হিন্দু যাঁরা প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শনে ইচ্ছুক তাঁরা একটি কচি নিখুঁত ও নধর ষাঁড় নিয়ে এসে দেবতাকে উৎসর্গ করার জন্য ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ সেই ষাঁড়ের গায়ে একটি ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেন, যত্রতত্র স্বাধীনভাবে সে চরে বেড়ায়। তখন তাঁকে বলা হয় 'ধর্মের ষাঁড়' (Brahmani bull)। এই ধর্মের ষাঁড়ের স্বাধীনতার অধিকার অবাধ, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও বেশি। কোন মানুষ অন্যায় করলে বা পথেঘাটে উপদ্রব করলে

তাকে শাস্তি দেওয়া যায়, কিন্তু ধর্মের ষাঁড়কে তা কদাচ দেওয়া যায় না। তাকে আঘাত করলে, হিন্দুরা মনে করেন, পাপ হয়। ধর্মের ষাঁড়েরা তাই মনের আনন্দে বারাণসীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, দোকানে বাজারে যা পায় তাই খায়, লোকেও ভক্তি করে খেতে দেয় এবং রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে ফঁস ফঁস করে নিরীহ পথিকদের সন্ত্রস্ত করে। তঞ্জামে করে বারাণসী শহরে ঘুরে বেড়ালাম। পথঘাট খুব সংকীর্ণ, তঞ্জামের উপর থেকে দু'পাশের বাড়ির ছাদ হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। এছাড়া গলির তো অন্ত নেই, যেমন সরু তেমনি আঁকাবাঁকা, একবার ঢুকলে কোথায় বেরুব বা আদৌ বেরুতে পারব কিনা বলা যায় না। এরকমের গলির মধ্যে মুখোমুখি যদি ধর্মের ষাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে অবস্থাটা কি হতে পারে যে-কেউ কল্পনা করতে পারেন। আমার তঞ্জামের সামনে চারজন সশস্ত্র বরকন্দাজ রাস্তার লোকজন, পশু ইত্যাদি সরাতে সরাতে যাচ্ছিল। আমি কতকগুলি পূজার পিতলের ঘটি সংগ্রহ করলাম। ইচ্ছা হল বাড়িতে ফিরে শিশুটিকে বিগ্রহ সাজিয়ে তার কোঁকড়ানো চুলভরা মাথায় ঘটি করে তেল ফুল ও গঙ্গাজল ঢেলে হিন্দুদের মতন দেবপূজার মহড়া দেব।

এলাহাবাদ গিয়ে নতুন করে ঘরসংসার পেতে বসলাম। এখানে এসে এদেশের বিচিত্র স্টীম-বাথ বা বাষ্পস্নানের অভিজ্ঞতা হল। পর পর তিনটি ঘর, প্রথম ঘরের উষ্ণতা মাঝামাঝি, দ্বিতীয় ঘরের তার চেয়ে বেশি গরম, তৃতীয় ঘরে যেখানে স্টীম তৈরি হয় সেখানে প্রায় ১০০ ডিগ্রী। তৃতীয় ঘরটিতে কিছুক্ষণ বসার পর গা দিয়ে যখন বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতে থাকে তখন পরিচারিকারা এসে বেসন (চানা বা ছোলার গুঁড়ো) দিয়ে গা ডলতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার উপর গরম জল ঢেলে পরিষ্কার করে স্নান

করার পর শরীর এত তাজা হয় এবং গায়ের চামড়া এত পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় যে মনে হয় যেন সাপের খোলস ছাড়ার মতন অবস্থা হয়েছে। স্টীম-বাথের এরকম অভিনব পদ্ধতি কল্পনা করা যায় না।

বাষ্পচালিত স্টীমার কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম এলাহাবাদ এসে পৌঁছল ছাব্বিশ দিনে এই বছরের (১৮২৮ সন) পয়লা অক্টোবর তারিখে। যমুনা নদীর তীরে হাজার হাজার লোকের ভিড় হল স্টীমার দেখার জন্য। তাদের কাছে এটা একটা ভয়ানক তাজ্জব ব্যাপার।

সতীদাহের বিবরণ। ৭ নভেম্বর ১৮২৮॥ আমাদের বাড়ির খুব কাছে একজন ধনিক বেনিয়া বাস করত। তার ব্যবসা ছিল ধান-চাল-গমের। জাতিতে হিন্দু। একদিন শুনলাম সে মারা গেছে। সেদিন নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ। সকালে উঠে দেখি বাজারে খুব ভিড় হয়েছে, লোকজনের হল্লা হচ্ছে। ঢাকঢোল, ড্রাম, টমটম, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি মহানন্দে বাজানো হচ্ছে। হঠাৎ এত ধূমধাম করে বাজনা বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশের কারণ কি জানবার কৌতূহল হল। খোঁজ করে খবর পেলাম, মৃত বেনের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার সংকল্প করেছে। সতী হবে, সতী হবে একটা সোরগোল পড়ে গেছে। তারই জন্য এত আনন্দ।

স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে সহমরণে কোন লাভ নেই। যে মৃত তার জন্য প্রাণ দিয়ে কোন পুণ্য সঞ্চয় করা যায় না। কিন্তু হাকিমের কোন যুক্তিতেই কাজ হল না, রমণীর সংকল্প অটল রইল। অবশেষে হাকিম তাকে টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও কিছু হল না। এসব কথার উত্তরে হিন্দু রমণীটি বললে, "হুজুর, আপনি যদি আমাকে আমার মৃত স্বামীর সঙ্গে সতী হতে বাধা দেন তাহলে

আমি এই আদালতেই আপনার সামনে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।" এই কথা বলে সে দু'হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে লাগল। শাস্ত্রকাররা না কি বলেন যে সতীর প্রার্থনা ও কামনা কখনও ব্যর্থ হয় না, দেবতারা পর্যন্ত তা শুনে বিচলিত হন। অতএব সেই রমণীর মুখ দিয়ে যখন সতী হবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে তখন তার কোন রকম নড়চড় করার সাধ্য নেই কারও, হাকিম তো দূরের কথা, দেবতারও নেই।

শাস্ত্রে আছে, পতির মৃত্যুর পর থেকে চিতায় সতী হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবা স্ত্রী জলস্পর্শ করতে পারবে না, করলে সে সতী হতে পারবে না। বেশীক্ষণ উপবাস করে থাকলে যদি রমণীটি ক্ষুধার তাড়নায় কিছু খেয়ে ফেলে এবং তার জন্য সতী হতে না পারে এই আশায় হাকিম সেই বেনের মৃতদেহ ৪৮ ঘণ্টা, অর্থাৎ পুরো দু'-দিন আটকে রাখলেন। বিধবার কাছে প্রহরী বসিয়ে রাখা হল কিছু খায় কিনা দেখার জন্য, কিন্তু কিছুই সে খেল না। কাজেই সহমরণ নিবারণের সমস্ত উপায় একে একে ব্যর্থ হবার পর হাকিম সাহেবও হতাশ হলেন। পরদিন সতীদাহ দেখার জন্য গঙ্গার ঘাটে লোকের ভীড় হল খুব, প্রায় পাঁচহাজার লোক জমা হয়েছিল মনে হয়। আমার স্বামীও হাকিমের সঙ্গে সতীদাহ দেখার জন্য গঙ্গা-তীরে গেলেন। তীরের উপর চিতা সাজানো হল এবং তার উপর সেই বাসি মৃতদেহও চাপিয়ে দেওয়া হল। হাকিম চারিদিকে পাহারা দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে কোন লোক জ্বলন্ত চিতার দিকে না আসতে পারে।

গঙ্গাস্নান করে বেনের বিধবা পত্নী একটি কাঠিতে আগুন ধরিয়ে নিল, স্বামীর চিতার চারপাশে ঘুরে বেড়াল তাই নিয়ে, এবং শেষে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার উপর হাসিমুখে উঠে বসল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল চিতায়, সে তার স্বামীর মাথাটি

কোলের উপর তুলে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল আগুনের মধ্যে। মুখে কয়েকবার উচ্চারণ করল, "রাম রাম সত্য, রাম রাম সত্য।"

বাতাস লেগে আগুন যখন শিখা বিস্তার করে ভয়াবহ রূপ ধারণ করল তখন সতী রমণী হাত-পা ছুঁড়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে আরম্ভ করল, চেষ্টা করল চিতার উপর থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পাশে যে একজন হিন্দু পুলিশ দাঁড়িয়েছিল তার ওপর অত্যাচার না করা হয় দেখার জন্য, শেষ পর্যন্ত সে-ই তাকে লাঠি তুলে মারতে উদ্যত হল। ভয়ে শিউরে উঠে সতী আবার এগিয়ে গেল চিতার দিকে। তাই দেখে হাকিম হিন্দু পুলিশটিকে গ্রেফ্‌তার করে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন। সতী চিতার দিকে একটু এগিয়েই লাফ দিয়ে দৌড়ে পালাল, এবং ছুটতে ছুটতে গিয়ে কাছে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমবেত জনতা এবং মৃত বেনিয়ার আত্মীয়স্বজন ও ভাইরা একডাকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ধরে আন হতভাগীকে, মেরে ফেল, কেটে ফেল, বাঁশের বাড়ি দে মাথায়, হাত-পা বেঁধে চিতায় ফেলে দে।" এই কথা বলে হৈ-হৈ করে দৌড়ে যখন তারা পলাতক সতীকে ধরতে গেল তখন উপস্থিত দু'চারজন ভদ্রলোক, হাকিম ও পুলিশ তাদের তাড়া করে বিদায় করে দিলেন।

সতী রমণী এবারে শান্ত হয়ে খানিকটা জল পান করল এবং তার লাল কাপড়ের আগুনও নিবিয়ে ফেলা হল। পরক্ষণেই সে বলল, চিতায় তাকে উঠতেই হবে, সতী হতেই হবে, তা ছাড়া গতি নেই।

হাকিম ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত দিয়ে (তাতে অবশ্য সেই রমণী লোকের কাছে অপবিত্র হয়ে গেল) বললেন, "শাস্ত্রমতে আর তোমার সতী হওয়া চলবে না মা! আমি জানি, একবার চিতায় উঠে ছেড়ে চলে এলে আর তাতে ওঠা যায় না। কাজেই আর তোমাকে সতী হতে আইনত আমি দিতে পারি না। জানি আজ থেকে তোমাকে হিন্দুসমাজে একঘরে হয়ে বিনা

দোষে কলঙ্কিত জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু তার জন্য তোমাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না। কোম্পানির গবর্নমেণ্ট তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবেন, তোমার খোরাকপোশাকের অভাব হবে না।”

এই কথা বলে হাকিম স্ত্রীলোকটিকে পালকি করে, সঙ্গে একজন পাহারাদার দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। জনতা পাল্‌কির পথ ছেড়ে দূরে সরে গেল অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে। অপবিত্র, অ-সতী রমণীর মুখদর্শন করাও পাপ। হিন্দুরা যে যার বাড়ি গিয়ে পরম বিজ্ঞের মতন এই কথা আলোচনা করতে লাগল। মুসলমানরা বলল, ভালই হয়েছে, জেনানার জান বেঁচেছে, তবে সাহেবসুবো হাকিম-হুজুরের জন্য এমন সুন্দর একটা তামাসা দেখা গেল না এই যা আফশোস।

বাস্তবিকই হাকিম ও কয়েকজন ইংরেজ ভদ্রলোক যদি সেখানে উপস্থিত না থাকতেন তাহলে হিন্দুরা স্ত্রীলোকটিকে মেরে কেটে যেভাবে হোক তার মৃত স্বামীর সঙ্গে ঐ চিতায় দাহ করত। তারপর বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে যে স্বেচ্ছায় সে সতী হয়েছে, তার মতন পুণ্যবতী রমণী আর কেউ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকটি চিতায় উঠে বসার সময় শাস্ত্রসম্মত বিধান অনুযায়ী কয়েকবার বলেছিল, “এর আগে আমি ছ’বার জন্মগ্রহণ করেছি এবং ছ’বার আমার মৃত পতির সঙ্গে সহমরণে সতী হয়েছি। যদি সপ্তমবারও সতী না হই তাহলে আমার মতন হতভাগী আর কে আছে!” পাশের একজন লোক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “কি লাভ হবে তোমার সহমরণে সতী হয়ে?” স্ত্রীলোকটি উত্তর দিয়েছিল, “আমার স্বামীর পরিবারে বিবাহিতা স্ত্রীলোকরা সকলেই সতী হয়েছে, আমি যদি না হতে পারি তাহলে পরিবারের কলঙ্ক হবে।” স্ত্রীলোকটির বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর।

শোনা গেল তার কিছু সম্পত্তি আছে, এবং তার আত্মীয়স্বজন সেইজন্যই সহমরণের জন্য অত উদ্‌গ্রীব। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীটিকেও পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে সম্পত্তি নিষ্কণ্টক হয়ে যায়।

যদি অন্যান্য সহমরণ এই রকম যত্ন করে তদারক করা হত তাহলে আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে এত সতীদাহ কখনও ঘটত না। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় তা হয় না। ক্ষিপ্ত জনতা ও কুচক্রী আত্মীয়দের তাড়নায় অসহায় অনাথ রমণীরা শেষ পর্যন্ত সহমরণ বরণ করে সতী হতে বাধ্য হয়। যে স্ত্রীলোকটির কথা আমরা বলছি চিতার আগুনে তার হাত-পা সামান্য দগ্ধ হয়েছিল মাত্র। যদি সে সতী হত তা হলে হিন্দুরা নদীর তীরে তার একটি ছোট্ট সমাধি-মন্দির তৈরি করে দিত। তার নাম সতী-মন্দির। গঙ্গা-স্নানের সময় যাতায়াতের পথে হিন্দু নারীরা সেই মন্দিরে ভক্তিভরে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করত, "জন্মে জন্মান্তরে যেন তোমার মতো পুণ্যবতী সতী হতে পারি।" আমরা যখন কলকাতা শহরে ছিলাম তখনও অনেক সতীদাহ হয়েছে, তবে অধিকাংশই গঙ্গার অপর তীরে বলে আমরা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাই নি। এখানে সেই সুযোগ পাওয়া গেল, কারণ এটা কলকাতা শহর নয়। এখানে লোকজন নিশান উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সতীদাহের জন্য যাচ্ছিলেন, আমারই বাড়ির পাশ দিয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখলাম। মধ্যিখানে বেনের স্ত্রী লালরঙের একটি কাপড় পরে হেঁটে চলেছে। আমার ভৃত্যরা সকলে দৌড়ে এল আমার অনুমতি নেবার জন্য, শোভাযাত্রার সঙ্গে তারাও সতীদাহের তামাসা দেখতে যাবে। ব্যাপারটা সাধারণ লোকের কাছে সত্যিই একটা তামাসা বা খেলার মতন। অনুমতি দিতে তারা সকলে চলে গেল, কেবল যে টানাপাখা টানছিল তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হল না। সে বোধ হয় তার জন্য আমাকে অভিসম্পাত

দিয়েছিল। আমার সাহেব বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি নাকি বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দেখে মনে হয় নি তার যে আগুনে পুড়ে মরতে সে ভয় পাবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে সে প্রাণে বেঁচেছে তাতে আমরা সকলে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা হল, বেচারীকে এখন সমাজ-পরিত্যক্ত হয়ে একঘরে অবস্থায় বাস করতে হবে। তার হাতের ছোঁয়া তো কেউ খাবেই না, মুখ পর্যন্ত দর্শন করবে না। তবু এরকম সতীদাহ থেকে মুক্তির দৃষ্টান্ত কিছু লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে পারলে সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ হবে বলে মনে হয়। তবু রক্ষা যে স্ত্রীলোকটির কোন সন্তানাদি ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি ভাল বাড়ি এবং নগদ আট-ন'শ টাকা। সহ-মরণের উদ্দেশ্য সফল হলে তার দেবররা এই সম্পত্তিটুকু নিশ্চিন্তে ভোগদখল করতে পারত।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক
ভিক্তর জ্যাকমোঁর চিঠি
১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দ

১

জ্যাকমোঁর চিঠি ॥ ১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে জ্যাকমোঁ ভারতবর্ষে পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছান, কলকাতায় আসেন মাসখানেক পরে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। ১৮৩০ সনের ২৬ আগস্ট চীন-ভারত সীমান্তের শিবির থেকে তিনি তাঁর পিতাকে যে চিঠি লেখেন, তার মধ্যে প্রসঙ্গত কলকাতা শহরে প্রথম উপস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দেন। তা দেওয়ার কারণ হল, কলকাতা থেকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিখানি পিতার হাতে পৌঁছয় নি, বোধ হয় সমুদ্রপথে খোয়া গিয়েছিল। কাজেই দীর্ঘদিন পরে হলেও পিতার চিঠিতে তিনি কলকাতার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে চিঠি থেকে কেবল কলকাতার প্রসঙ্গটুকু উল্লেখ করা হল :

"সুদূর ভারত-চীনের সীমান্ত থেকে আবার আমাকে কলকাতা শহরে ফিরে যেতে হচ্ছে। কলকাতার বিবরণ দিয়ে যে-চিঠি আগে লিখেছিলাম তা তোমার হাতে পৌঁছয় নি জেনে দুঃখিত হলাম। ৫ মে ১৮২৯ তারিখে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ঘাটে আমাদের তরী ভিড়ল। তরীটি অবশ্য 'হিজ মোষ্ট ক্রিশ্চান ম্যাজেষ্টির' একটি 'লগ' (log)। তরী থেকে যথারীতি কামানের অভিনন্দন-ধ্বনি করা হল। পরদিন প্রাতঃকালে মহানগরে পদার্পণের ব্যবস্থা করলাম। পণ্ডিচেরী থেকে যে পর্তুগীজ ভৃত্যটিকে সঙ্গে

এনেছিলাম, তাকে বললাম একটি পাল্কি ঠিক করে আনতে। পাল্কি আসার পর আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত করে তরী থেকে বিদায় নিলাম। পাল্কির ছোট্ট খোপ্‌টির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে বেয়ারাদের বললাম, 'পির্সন সাহেবকা ঘর্‌মে'। বাজারী হিন্দুস্থানী ভাষা বটে, কিন্তু এইটুকু রপ্ত করতে পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতা পর্যন্ত সারাপথ আমাকে তা আওড়াতে হয়েছে।

"হন্ হন্ করে পাল্কি চলল বেয়ারাদের কাঁধে ভর দিয়ে। দেখতে দেখতে পীয়ারসন (তদানীন্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল) সাহেবের বৃহৎ প্রাসাদতুল্য 'কুঠির' কাছে পৌঁছলাম। বেশি দূরে নয়, নদীর খুব কাছেই সাহেব থাকতেন। পাল্কি থেমে নেমে দেখি, সামনে দু'দিকে সারবন্দী হয়ে ভৃত্যশ্রেণী দণ্ডায়মান, বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ির দুই পাশে। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে, ভৃত্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিরাট একটি হলঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। হলঘরটি সাহেবের বৈঠকখানা। তার মধ্যে তিনজন মহিলা সেজেগুজে প্রসাধন করে বসে আছেন, আর একজন পক্ককেশ ভদ্রলোক রয়েছেন হাল্‌কা রঙের সুতীর পোশাক পরে। বিচিত্র রকমের ঝল্‌মলে সব হাতপাখা দিয়ে ভৃত্যরা তাঁদের হাওয়া করছে। তাঁদের কাছে দূত আমার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমি অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করলাম। কালো পোশাকে ঢাকা আমার লম্বা চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁরা বজ্রাহতের মতন নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁদের বোধ হয় মনে হল, ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। তার উপর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানকার এইসব তাজ্জব দৃশ্য দেখে আমার বাক্‌শক্তিও রহিত হয়ে গেল। মাতৃভাষা আমার ফরাসী, চর্চিত ভাষা ইংরেজী। কাজেই ইংরেজীর ভিত্ পাকা নয়, হঠাৎ 'শক্' পেয়ে তা একেবারে গুলিয়ে গেল। কৃষ্ণবেশ ভূতটিকে দেখে যখন তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন, তখন

ভূতের মুখ দিয়েও কিছুক্ষণ কোন কথা বেরুল না। উত্তেজক কোন পদার্থ পান করলে যদি আমার বাক্‌তরী পাল তুলে বয়ে যেত, তাহলে অর্থের বিনিময়ে না হয় তাও এক গ্লাস পান করে নিতাম। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই যখন বাক্‌নিঃসরণ হল না তখন গৃহস্বামীদের সবিনয়ে বললাম, 'আগে একটু-আধটু ইংরেজীতে কথা বলেছি স্যার, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যেন সব ভুলে গেছি। এই মহাসংকট থেকে আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন।' শুভ্রকেশ ভদ্রলোকটি তাই করলেন, মহিলা তিনজনও উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন তরুণীর দেখলাম উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। আশ্চর্য ব্যাপার। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাক্‌শক্তির স্ফুরণ হল। নদীর স্রোতে ছোট মাছের মতন ইংরেজী ভাষায় সাঁতার দিতে লাগলাম। অনর্গল ধারায় ইংরেজীর প্রবাহ আরম্ভ হল।

"ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন মিস্টার পীয়ারসন, মিসেস পীয়ারসন, তাঁদের কন্যা ও তাঁর সঙ্গিনী বা গবর্নেস। আমার পরিচয়পত্রগুলি যথারীতি তাঁদের দেখালাম। দেখেশুনে তাঁরা আমাকে একজন মাননীয় অতিথি হিসেবেই গ্রহণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আর কোন পত্র আমার কাছে আছে কিনা। একটি বড় প্যাকেট-ভরা পকেট দেখিয়ে আমি বললাম, এগুলি সবই পরিচয়পত্র। তারপর সেগুলি খুলে একে-একে নাম পড়তে লাগলাম। প্রথমে মিস্টার, ডক্টর, মার্চেণ্ট, ক্যাপ্‌টেন প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে জজ, প্রধান জজ ও কাউন্সিলের সদস্যদের নাম করে শেষে লেডি বেণ্টিঙ্ক, ও পাঁচবার গবর্নর-জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নাম উচ্চারণ করলাম। শ্রোতাদের উপর নামের ঐন্দ্র-জালিক ক্রিয়া লক্ষ্য করে এই চালাকিটুকু আমাকে করতে হল। নাম যত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আমার মুখ দিয়ে ধ্বনিত হতে

থাকল, ততই আমার মাননীয় শ্রোতারা চক্ষু বিস্ফারিত করে আমার দিকে এগুতে থাকলেন। আমার ভৌতিক মূর্তি মানুষের রূপ ধারণ তো করলই, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁদের চোখের সামনে বিরাট গণ্যমান্য পুরুষের আকারে পর্যবসিত হল।

"বেলা এগারটা বাজতে পীয়ারসন সাহেব আমাকে বললেন, 'আমার সুপ্রিমকোর্টে যাবার সময় হয়েছে, আর আমি দেরী করতে পারছি না। আপনি যাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে আমার মেয়ে রইল, সে আপনাকে যতদূর সম্ভব এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।' এই কথা বলে তিনি আমার করমর্দন করে চলে গেলেন। মিস্ পীয়ারসন বললেন যে সর্বপ্রথমে আমার লাট-প্রাসাদে যাওয়া উচিত। আমাকে না জানিয়েই তিনি লেডি বেন্টিঙ্কের কাছে একখানি চিঠিও পাঠিয়ে দিলেন। ভব্যতা অনুযায়ী চিঠির উত্তর সোজা আমার কাছেই এল, 'এ-ডি' দিয়ে গেলেন মিনিট পনেরর মধ্যে এবং বলে গেলেন যে লেডি বেন্টিঙ্ক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার জন্য একটি ভাল কোচগাড়িও মোতায়েন ছিল, তার সামনে ও পিছনে পদাতিকের দল তৈরি হয়ে ছিল দৌড়বার জন্য। গাড়িতে চড়ে লাটপ্রাসাদে পৌঁছলাম, 'এ-ডি' আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে সোজা লেডি উইলিয়ামের নিজের ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হল তাঁর বয়স বছর পঞ্চাশ হবে, একদা যে খুবই সুন্দরী ছিলেন তাও বোঝা যায়, তবে এখন আর যৌবনের কোন জলুস নেই। লর্ড আশ্‌লে আমাকে তাঁর পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে নানাবিষয়ে কথাবার্তা হল। তারপর তাঁর চিকিৎসক ও একজন অতিথি এলেন তাঁকে জলযোগের ঘরে আহ্বান করে নিয়ে যাবার জন্য। চিকিৎসক ভদ্রলোকটিকে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর স্বামীর কাছে

পাঠালেন, নবাগত অতিথির বার্তা জানিয়ে। কয়েক মিনিট পরে আমি জলযোগের ঘরে প্রবেশ করে তাঁর দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় ঠিক সামনের দিক থেকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সচিববৃন্দ ও কাউন্সিলের ছু'জন সদস্য। সেদিন কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। লেডি উইলিয়াম সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতন আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। গবর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের ডানদিকে আমি বসলাম, খাবার দেওয়ার সময়টুকুর মধ্যে তিনি আমার পাঁচখানি পরিচয়পত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর টেবিলের চারদিকে সকলে উঠে দাঁড়ালেন এবং উইলিয়াম তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। লেডি উইলিয়ামকে আবার তাঁর কক্ষে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম এবং তাঁর কাছে রাত্রি আটটায় ডিনার খেতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

"পীয়ারসনরা এদিকে আমার এত দেরী দেখে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের গৃহে ফিরে দেখি, বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘর ছু'খানি আমার থাকার জন্য তাঁরা ঠিকঠাক করে রেখেছেন। লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্কের আদর আপ্যায়নের গল্প বলার জন্য যখন আমি ঘরে গিয়ে বসলাম, তখন একদল ভৃত্য পাখা হাতে করে হাওয়া দিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য মক্ষিকার মতন ঘিরে ধরল। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে নিস্তার পেলাম। বিকেল পাঁচটার সময় পীয়ারসন সাহেব কোর্ট থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করলেন এবং তাঁর পেশা ও সাংসারিক জীবনের কাহিনীও অনেক বললেন। আমিও আমার কথা বললাম, এবং শেষে সেদিন সন্ধ্যায় লেডি উইলিয়ামের ডিনারের নিমন্ত্রণের কথাও সসংকোচে জানিয়ে দিলাম। আমার মতন একজন গণ্যমান্য অতিথি পেয়ে তিনি বেশ খুশিই হয়েছেন মনে হল। ছ'টা বাজতে

গাড়িতে করে স্ত্রীকন্যাসহ আমাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরুলেন। সূর্যাস্তের পর গাড়ি করে একচক্র ঘুরে আসা কলকাতার ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক কর্ম। ডিনারের সময় হলে তাঁরা বেড়িয়ে ফেরেন। ফিরে এসে পোশাক পরিচ্ছদ পাল্টে গাড়ি করে আবার লাট প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলাম।

"লেডি উইলিয়ামের ড্রয়িংরুমে নিমন্ত্রিতদের সমাবেশ হয়েছিল। আমিই অবশ্য প্রধান অতিথির সম্মান পেলাম, এবং লেডি উইলিয়ামের পাশের আসনটিতে খেতে বসলাম। চারিদিকে যা আয়োজন দেখলাম তা সবই রাজকীয় ও এশিয়াটিক, কেবল ডিনারটি ফরাসী স্টাইলের। ফ্রান্সের মতন এখানেও দেখলাম, পরিমিত মাত্রায় সুস্বাদু সুরাপানের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং সোনালি বর্ডার দেওয়া লাল পাগ্‌ড়ি মাথায়, সাদা পোশাক-পরা লম্বা দাড়িওয়ালা ভৃত্যরা সেই পানীয় পরিবেশন করছে। লর্ড উইলিয়াম আমাকে পান করতে অনুরোধ করলেন, আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে লেডির সঙ্গে পান করার অনুমতি চেয়ে তা গ্রহণ করলাম। লেডি উইলিয়াম নানাবিধ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। ডিনারের দ্বিতীয় দফা খাদ্য পরিবেশনের আগে, আগ্রহ জাগানোর জন্য, একজন ইটালীয়ান পরিচালিত চমৎকার জার্মান অর্কেস্ট্রাবাদন আরম্ভ হল, মোজার্ট ও রসিনির সিম্‌ফনি দিয়ে। দূর থেকে সেই সিম্‌ফনির মধুর ঐকতান, চারিদিকের ঘরের মধ্যবর্তী বড় বড় স্তম্ভের পাশ দিয়ে বিচ্ছুরিত মৃদু আলোর আভাস, ডিনার-টেবিলের উপরের আলোর ঝল্‌মলানি, তার উপর বিচিত্র রঙের ফলফুলের সমারোহ, ফুলের সৌরভের সঙ্গে মিশ্রিত শ্যাম্পেনের সুগন্ধ—এসব মিলে পরিবেশটিকে যে কি অপরূপ করে তুলেছিল তা বর্ণনা করা যায় না। একটা নেশার আমেজ অনুভব করতে লাগলাম। সত্যি যে আমার কোন নেশা হয়েছিল তা নয়। লেডি উইলিয়ামের

সঙ্গে একদিকে যেমন খেতে-খেতে ফরাসী ভাষায় শিল্প-সাহিত্য, চিত্রকলা ও সংগীত বিষয়ে আলোচনা করেছি, অন্যদিকে তেমনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় ফরাসী রাজনীতি নিয়েও আলাপ করেছি। লেডি উইলিয়ামের ড্রয়িং রুমে ফিরে গিয়ে কফি পান করেছি পাঁচ-ছ কাপ। কথায় কথায় তাঁদের তরুণ চিকিৎসক ভদ্রলোকটিকে শারীরবিদ্যার নূতন তথ্যাদি সম্বন্ধে বেশ মাতিয়ে তুলেছি। এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে আমি যে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী তা জানাবার কোন সুযোগ পাই নি। এই অবকাশে, অন্তত বিদায় নেবার আগে, সেটা জানানো দরকার বলে মনে হল।

"পরদিন পীয়ারসনদের ঘোড়া দু'টিকে সারাদিন ঘুরিয়ে বেশ হায়রান করে ফেললাম। সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হল দেখা করার জন্য। সেদিনে সব শেষ হল না, পরের দিনও লাগল। গবর্নর-জেনারেলের ভোজসভায় যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কাছেও একবার করে হাজ্‌রে দিতে হল। দিন পনের পর লর্ড উইলিয়াম বললেন, তাঁর সঙ্গে বারাকপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকতে। যাবার সময় লেডি উইলিয়াম অনুরোধ করলেন, তাঁর সঙ্গে হাতির পিঠে চড়ে যেতে। অনুরোধ রক্ষা করতে হল। হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া মানে চলন্ত পাহাড়ের মাথায় চড়ে যাওয়া। আমি ও লেডি বেন্টিঙ্ক দু'জনে সেই চলন্ত পাহাড়ের মাথায় বসে গল্পে মশ্‌গুল হয়ে গেলাম। বারাকপুরে লাটপ্রাসাদের পাশে সুন্দর একটি বাংলোতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সারাদিন আমি সেখানেই থাকতাম, এবং আমার নিজের কাজকর্ম করতাম। মধ্যে মধ্যে বেলা দু'টোর সময় মধ্যাহ্নভোজনের পর লেডি উইলিয়ামের ড্রয়িংরুমে বসে বৃষ্টি, ব্যাঙ-ব্যাঙাচি ও আবহাওয়া সম্বন্ধে গল্প করতাম। সারা বিকেলটা নিঃশব্দে কেটে যেত।

সন্ধ্যার পর ডিনার খেয়ে কিছুক্ষণ সংগীত শোনা হত। একটি বড় সোফায় একপাশে আমি এবং আর একপাশে লর্ড বেন্টিঙ্ক বসে নানাবিষয়ে আলোচনা করতাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে কিছুদিন আমি কাটিয়েছি; ওঁর ছিল ভারতবর্ষ। রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত কথাবার্তা বলে আমি আমার বাংলোতে ফিরে যেতাম। এইভাবে কলকাতা শহরে আমার প্রথম কয়েকটা দিন কেটেছে।"

এই চিঠিখানির মধ্যে ভিক্তর জ্যাকমোঁ তাঁর কলকাতায় আসার প্রথম কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে লিখিত অন্যান্য চিঠিতে এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিষয়গুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদানমূল্য আছে বলে তার কিছু এখানে সংকলন করে দেওয়া হল।

এক বন্ধুর কাছে (Victor De Tracy) ১৮২৯, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে তিনি লিখছেন :

"এখানকার হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, লোকে এখানে 'বাঁচার মত বাঁচতে' বা জীবনটাকে উপভোগ করতে আসে না। এখানকার সর্বস্তরের সমাজের এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এখানে লোকে আসে কিছু একটা লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তারপর তাই নিয়ে জীবনটাকে অন্যস্থানে উপভোগ করতে চায়। কলকাতা শহরে কোন লোকের অবসর বলে কিছু নেই, সকলে সব সময় কর্মব্যস্ত। এই কর্মব্যস্ততার সর্বোচ্চ চূড়ায় রয়েছেন এখানকার গবর্নর-জেনারেল, তারপর ধাপে ধাপে রয়েছেন চীফ জাস্টিস, অ্যাডভোকেট-জেনারেল প্রভৃতি। একমাত্র এই শ্রেণীর উচ্চস্তরে সমাসীন

'ব্যক্তিরাই কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু লেখাপড়া করার অবসর পান। বাকি সকলে, বিশেষ করে যাঁদের বিদ্যাচর্চার কৌতূহল বা প্রতিভা বলে কিছু নেই, তাঁরা নির্বিকার আলস্যে কালাতিপাত করেন। এক কথায় তাঁদের সমাজের আবর্জনা বলা যায় (জ্যাকমোঁ কলকাতার সাধারণ ইয়োরোপীয় সমাজের কথা বলছেন—বি)। অথচ কলকাতায় ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের তুলনায় নানারকমের সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে সাময়িকপত্র যথেষ্ট আছে বলা চলে। কিন্তু সেদিকে কারও বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

"একজনমাত্র ব্যক্তি এই এশিয়াতে এসে ইয়োরোপের মানসম্ভ্রম রক্ষা করে চলেন দেখেছি, তিনি উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। তিনি আজ মোগল বাদশাহের সিংহাসনে বসেও যে সহজ মানুষের মতন সাধারণ পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে সেপাই-সামন্ত না নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করেন, এবং গ্রামাঞ্চলেও ছাতি বগলে করে পথ চলেন, তার জন্য এখানকার গোঁড়া ইংরেজরা বলাবলি করেন যে কোম্পানীর ভারত সাম্রাজ্য আর রক্ষা করা সম্ভব হবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। জীবনে অনেক বিপর্যয়, রাষ্ট্রবিপ্লব ও রক্তপাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি তাঁর মনুষ্যত্ব-বোধটিকে জাগ্রত রাখতে পেরেছেন। কূটনীতির পঙ্কিল আবর্তের মধ্য দিয়েও তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য তাঁর মনের সারল্য এতটুকু নিষ্প্রভ হয় নি। প্রায় এক সপ্তাহ তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়েছে এবং সেই কয়েকদিনের মধুর স্মৃতি আমি ভুলতে পারব না কখনও। লেডি উইলিয়ামও খুবই অমায়িক ও মিষ্ট-ভাষী মহিলা। তাঁর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় নানাবিষয়ে আলাপ করতে পেরে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা যায় না।

"এই হল এখানকার ইয়োরোপীয় উচ্চসমাজের পরিচয়। যাই হোক, আমি অবশ্য ইংরেজদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উদার ব্যবহার পেয়েছি। এবারে আমার নিজের কাজের খবর বলি। কলকাতায় এসে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ ভাল করে আরম্ভ করতে পারি নি। কত বিষয় যে পড়বার, অনুসন্ধান করবার ও জানবার আছে তার ঠিক নেই। যার কাছ থেকে যা সাহায্য পাবার তা পেয়েছি ও পাচ্ছি। আমার বিরাট বসবার ঘরটির দেয়ালগুলি ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে ঢাকা। শহর থেকে গ্রাম এবং গ্রাম থেকে শহরে প্রায়ই আমাকে যাতায়াত করতে হয়। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়ে যতরকম বই প্রকাশিত হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে তা পড়া প্রায় শেষ করে ফেলেছি। অর্থাৎ নোট করে পড়েছি। এখন আমার বিশেষ গবেষণার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাজ করতে অসুবিধা হবে না।

"সমস্ত কাজকর্ম ও পড়াশুনার মধ্যেও নিয়মিত প্রতিদিন কাশীর একজন পণ্ডিতের কাছে হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছি। এর আগে উইলিয়াম জোন্সের ফার্সী ব্যাকরণ আমার পড়া হয়ে গেছে। তাতে হিন্দুস্থানী শেখার সুবিধা হয়েছে আমার। ফার্সীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মনে হয় ভাষাটা ফার্সী ও সংস্কৃতের একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ। এই ভাষা রপ্ত করতে বেশ সময় লাগছে এবং তাতে আমার গবেষণা-কাজের কিছুটা ক্ষতিও হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। এদেশের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এভাষা জানা দরকার, তা না হলে সব সময় দোভাষী নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কলকাতার 'বোটানিকাল গার্ডেন' একটি বিশাল মনোরম উদ্যান, গঙ্গাতীরে সুন্দর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির বিচিত্র গাছপালার এরকম বৃহৎ ল্যাবোরেটরী

বোধহয় আর কোথাও নেই। সারা ভারতবর্ষ, সুদূর হিমালয় প্রদেশ, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানারকমের গাছপালা সংগ্রহ করে এনে এখানে লাগানো হয়েছে। একজন ড্যানিশ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এই বাগানের ডিরেক্টর। বিশ্বের প্রথম উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী মনে করে এদেশের লোক তাঁকে খুব সম্মান করেন। তিনি বেশ মোটা বেতনও পান। প্রায় দু'বছরের ছুটি নিয়ে সম্প্রতি তিনি দেশে গেছেন, বাগানের দায়িত্ব এখন একজন কাউন্সিলের সদস্যের উপর রয়েছে। তিনি আমাকে বাগানে থেকে গাছপালা বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের সর্ববিধ সুযোগ দিয়েছেন। মাস দেড়েকের মধ্যে ভারতবর্ষের সকল রকমের গাছপালা সম্বন্ধে একটা চলনসই জ্ঞান-লাভ করতে পেরেছি এই বাগানে থেকে। তার উপর বাগানের ডিরেক্টরের বাংলোর সঙ্গে চমৎকার একটি গাছপালা বিষয়ে বইপত্রের লাইব্রেরী থাকাতে আমার কাজকর্মের ও গবেষণারও খুব সুবিধা হয়েছে।"